ভারতীয় সংগীত

ইতিহাস ও পদ্ধতি

সুকুমার রায়

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা | ১৯৭৫

উৎসর্গ

আমার প্রথম সংগীত-গুরু

ওস্তাদ হেকিম মুহম্মদ হোসেন

স্মরণে

পূর্বকথা

বিভিন্ন স্তরের ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থ রচিত। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস সমুদ্র বিশেষ। এই সমুদ্র মন্থন যাঁরা করেছেন তাঁদের মতামতের ওপর নির্ভর করে আদি ও মধ্য যুগের এই ইতিহাস দাঁড়িয়ে। তথ্যগুলোকে কিংবদন্তী, মতভেদ ও মতামতের জট থেকে কতকটা মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছি এবং বিশিষ্ট সংগীতশাস্ত্রী, সুরকার ও কলাবন্তদের সম্বন্ধে সাংগীতিক ব্যাখ্যাই শুধু সন্নিবেশ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে কিছু শব্দাদির ঐতিহাসিক ও পদ্ধতিমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি, প্রাচীন ধারা থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের কাব্য-সংগীত পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হয়েছে। প্রতি যুগের সাংগীতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্যও স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে আরম্ভ করে আধুনিক সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা আমার "বাংলা সংগীতের রূপ" ও "মিউজিক অব ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ দুটোতে আছে।

বইটি যাঁকে উৎসর্গ করেছি তাঁর কাছে ১৯৩২ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী সংগ্রহ করেছিলেম। তিনি ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে চৌধুরী বাজারে থাকতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ রাজপুতানা (রাজস্থান নিবাসী) ছিলেন। শিখেছিলেন বিশেষ ভাবে হসমু মিঞার কাছে (পূর্বাঞ্চলে শেষ টপ্পা-ঘরাণেদার)। তিনি পরে অন্যান্য গুরুর কাছে (কোলকাতায় মোরাদ আলী খাঁর কাছে) শেখেন। বিশেষ শিক্ষা লাভ করেছিলেন রামপুরের তসদ্দুক হোসেন খাঁর কাছে, যিনি মেদিনীপুরে দেহ রক্ষা করেন। তসদ্দুক হোসেনের বহু শিষ্য ও ভক্ত মৈমনসিংহ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে ছিলেন। মুহম্মদ হোসেন সমসাময়িক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সংগে মিলেও বহু সংগ্রহ করেছিলেন। সুকণ্ঠ ছিলেন তিনি এবং গানের রূপ অবিকৃত রাখতে চেষ্টা করতেন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে কিছুকাল তিনি সংগীত থেকে বিরত ছিলেন। পরে কয়েকজন গুণমুগ্ধ রসগ্রাহী বন্ধু ও শিষ্যের উদ্যোগে যখন আবার ঢাকায় সংগীত-ক্ষেত্রে ফিরে আসেন তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ। তাঁর বন্ধু, ভক্ত শিষ্য

যাঁদের সঙ্গে তাঁকে সংযুক্ত দেখেছি তাঁরা হলেন - পাবনা কলেজের অধ্যক্ষ বনোয়ারীলাল বসু (শিষ্য), রাখাল রায় (শিষ্য), ডঃ নির্মল সেন, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ সমরেশ রায়চৌধুরী, বিরাজমোহন দাস (শিষ্য), যতীন মণ্ডল (বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী), রাধাগোবিন্দ ঘোষ (শিষ্য, ঠুমরী-গায়ক), প্রোঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ওস্তাদ ওয়ালিউল্লাহ খান, প্রাণবল্লভ দাস প্রভৃতি।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এই সম্পর্কে যাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সকলকে, বিশেষ করে বেঙ্গল মিউজিক কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগের অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। দ্রুত ছাপার জন্যে নানা স্থানে কতকগুলো ত্রুটি থেকে গিয়েছে। ভবিষ্যতে গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করবার আশা রাখি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্যে গ্রন্থপঞ্জী কয়েকটি ভাগে দেওয়া হয়েছে—বিভিন্ন যুগের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই কয়েকটি ভাগ। ব্যক্তিগত ভাবে রচনার সময়ে এসব গ্রন্থের অতিরিক্ত বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদিও ব্যবহার করেছি, কিন্তু সব উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

এই গ্রন্থটি সংগীতপ্রিয় পাঠকদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে, মনে করি।

২৫এ ডাঃ জগবন্ধু লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

সুকুমার রায়

॥ সূচীপত্র ॥

আদি যুগ

মধ্য যুগ

বর্তমান যুগ : উনবিংশ শতক

গ্রন্থপঞ্জী

আদি যুগ

রায় বাহাদুর কে এন. দীক্ষিত : Prehistoric Civilization of Indus Valley

ঠাকুর জয়দেব সিং : Samavedic Music : Sl no 2 সংগ্রহ গ্রন্থ।

নারদী শিক্ষা (কাশী সংস্করণ) ; নারদ : সংগীত মকরন্দ (বরোদা সংস্করণ)

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী : (১) ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)

Historical Development of Indian Music : 2nd Edition, Calcutta.

মতঙ্গ : বৃহদ্দেশী ও পার্শ্বদেব : সংগীতসময়সার (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ)

মনোমোহন ঘোষ : The Natyasastra ascribed to Bharat Muni, Vols I and II

আর. সি মজুমদার অ্যাণ্ড এ ডি পুসলকার : History and Culture of Indian People, Vols I, II and III.

শার্ঙ্গদেব : সংগীত-রত্নাকর : Adyar Edition, Madras ; বঙ্গানুবাদ : ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী প্রকাশিত) ; সংগীত সমীক্ষা : আলোচনা, রাজ্যেশ্বর মিত্র।

মধ্য যুগ

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (Prof O C. Ganguli)—Ragas and Raginis.

অহোবল পণ্ডিত : সংগীত পারিজাত (হাথরাস সংস্করণ)

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব : সংগীতরাগকল্পদ্রুম।

কীর্তন : খগেন্দ্রনাথ মিত্র : পদাবলী কীর্তন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ। সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণাদেবী—কীর্তন পদাবলী। ডঃ এস. কে. দে—Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ ; পদাবলী পরিচয় ; পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস ; বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া। নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম)—সংগীতসারসংগ্রহ (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত)।

ঠাকুর জয়দেব সিং : The Evolution of Khayal : Sl no 6, সংগ্রহ গ্রন্থ।

জি. এন. বালসুব্রহ্মণ্যম : Karnatak Music, Sl no 2, সংগ্রহ গ্রন্থ।
ক্যাপ্টেন এন. এ. উইলার্ড : A Treatise on the Music of Hindusthan.
পি. শাম্বমূর্তি : Carnatic Music, Vols I—IV ;
Carnatic Music—A Survey, Sl no. 1, সংগ্রহ গ্রন্থ।
প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী : রাগ ও রূপ, ৩য় সংস্করণ, প্রথম ভাগ। পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস—প্রথম ভাগ (গীতগোবিন্দ বিষয়ক)।
বামনরাও দেশপাণ্ডে : Maharashtra's Contribution to Music.
বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী : হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান।
ডাঃ বিমল রায় : ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ (জিজ্ঞাসা)।
ভাতখণ্ডে, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ : (1) A Comparative Study of the leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th and 18th centuries (Reprint, Sl no 7, সংগ্রহ গ্রন্থ)। (2) A Short Historical Survey of the Music of Upper India (1934)।
রাজ্যেশ্বর মিত্র : মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা (আইন-ই-আকবরী, রাগদর্পণ, তুহ্‌ফাতুল হিন্দ—অনুবাদ)। Indian Music in the Muslim Rule in India Sl no 2, সংগ্রহ গ্রন্থ।
লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ : ভাতখণ্ডে সংগীতশাস্ত্র [হিন্দী] ১ম ও ২য় খণ্ড।
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ; ভারতীয় শক্তি সাধনা।
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর : Universal History of Music।
ডঃ সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের কথা। চর্যাগীতি পদাবলী।
সুকুমার রায় : Music of Eastern India.

বর্তমান যুগ

অমিয়নাথ সান্যাল : স্মৃতির অতলে ; Raga and Ragini.
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় : গীতসূত্রসার।
দিলীপকুমার রায় : সাংগীতিকী।
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় : বিষ্ণুপুর ঘরাণা ; রামমোহন রায় ও সেকালের সংগীত-প্রসঙ্গ (সুরচ্ছন্দায় ধারাবাহিক প্রকাশিত)।
নিরঞ্জন চক্রবর্তী : ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য।

প্রেমলতা শর্মা : The Origin of Thumri ; Sl no. 1, সংগ্রহ গ্রন্থ।

রাজ্যেশ্বর মিত্র : বাংলার গীতকার। Music : The History of Bengal 1757-1805—Edited by Dr. N. K. Sinha.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীত। সংগীত চিন্তা। জীবনস্মৃতি। ছেলেবেলা।

রবীন্দ্রসংগীত : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সংগম ; রবীন্দ্র স্মৃতি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী, ১ম ও ২য়। শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্র সংগীত॥ তাছাড়া রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে বহু গ্রন্থই পঠনীয় ; কয়েকটি উল্লিখিত হয়েছে Music of Eastern India গ্রন্থে, p 186, Bibliography A and B প্রসঙ্গে।

ডঃ এস. কে দে : History of Bengali Literature in the 19th Century.

লোকসংগীত : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য ; সুকুমার রায় : বাংলা সংগীতের রূপ ; Music of Eastern India-তে উল্লিখিত আরো গ্রন্থ।

অন্যান্য : Alain Danielou : Northern Indian Music (Parts I and II)। জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত : ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও সাধক। বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী : সংগীতকোষ। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : রাগ রূপায়ণ। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত দর্শিকা ১ম ২য়। লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ : গীতবাদ্যম্। এস্ কৃষ্ণস্বামী : Musical Instruments of India। প্রভাত কুমার গোস্বামী : বাংলা নাটকে গান। নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগীত পরিচিতি, পূর্ব ও উত্তর খণ্ড।

সংগ্রহ গ্রন্থ

1. Aspects of Indian Music : Publications Division 2. Basis of Indian Culture ; Edited by Amiya Kumar Mazumdar and Swami Prajnananda. 3. বাংলার লোকসংগীত, ১ম-৫ম খণ্ড, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত। 4, ভারতকোষ ১ম—৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। 5. সুরচ্ছন্দা পত্রিকা : সম্পাদক নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় ; বিভিন্ন সংখ্যা 6. Commemoration Volume in honour of Dr. S. N. Ratanjankar (Bombay, 1961) 7. Journal of the Indian Musical Society, Baroda.

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক ক্রম

প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করে ইতিহাস রচনা করতে হলে নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্র, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ, নানান প্রাচীন গ্রন্থ, প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন এবং বিক্ষিপ্ত লোক-প্রচলিত কিংবদন্তী—যা অনেকক্ষেত্রেই অলৌকিক কাহিনীতে রূপান্তরিত—এই সমস্তর ওপর। কিন্তু প্রাচীন সাংগীতিক ঘটনা ও জীবনের সংগে যোগসূত্রের যথেষ্ট অভাব আছে। সংগীতসাধক ও শাস্ত্রীদের নাম এবং কাজ নিয়েও আছে বহু সংশয় - একই নামে আছেন বিভিন্ন ব্যক্তি। এই সব কারণে অনেকক্ষেত্রেই সংগীতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নির্ণয় অনুমানের ওপর নির্ভরশীল। সংগীতশাস্ত্রীদের গ্রন্থগুলো অবশ্য দিগ্‌দর্শক, যদিও এগুলোর সময় ও বিষয় নিয়েও মতান্তর আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বিষয়ও অনেক। বহু প্রাচীন সাংগীতিক রূপ অপ্রচলিত বা লুপ্ত হয়েছে, বহু নতুন রূপের উদয় হয়েছে। একটি গ্রন্থকে কাল নির্ণয়ে আনুমানিক ভাবে আগে কিংবা পরে স্থাপনের দরুণ ঐতিহাসিক ধারা বর্ণনাতে তারতম্য হয়। এ সব নিয়েই তো ইতিহাস রচনা। কিন্তু, বিপুল শাস্ত্রাদির সারমর্ম নিয়ে সমাজ জীবনের সংগে যোগ করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ এখনো বাকি। বিভিন্ন যুগের যে কয়েকটি সংগীতের উপাদান আলোচনা ও তুলনা করে ইতিহাস রচনা করা যায় তা হচ্ছে:—(১) স্বর, (২) সুর, (৩) প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য, (৪) লয় ও তাল, (৫) প্রয়োগ ও অলঙ্কার, (৬) অবলম্বন—কথা ও বাদ্য যন্ত্র, (৭) কলা ও রস তত্ত্ব, (৮) শ্রেণী বিভাগ, (৯) সংগীত রচয়িতা ও শিল্পী, (১০) সংগীত তত্ত্ব ও শাস্ত্রী, (১১) সংগীত শ্রোতা ও সমাজ, (১২) সংগীতের উৎস, ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের যে কোন একটি উপাদানকে কেন্দ্র করেও ইতিহাসের ক্রমবিন্যাস চলতে পারে। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণের জন্যে অনেকটাই সংগীত-শাস্ত্রীদের গ্রন্থ ও তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার ওপর নির্ভর করা দরকার।

মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। রাগ ব্যক্তির মনে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। অনেকটাই অন্তর্মুখী। ধ্যানের কথাও শাস্ত্রে আছে। আমাদের এক-স্বরের সংগীতে বা 'মেলডি'তে সূক্ষ্মতা ও বহু কারিগরী, তথা ব্যক্তির কৃতিত্ব প্রয়োগের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। পাশ্চাত্য রীতিতে 'পলিফনি' (বা একই গানের সমান্তরাল দ্বৈত স্বরের সাজানো সুর) এবং 'হারমনি' (বা বহু স্তরে বহু স্বরের সমন্বয়ে সাজানো সুর) প্রয়োগ ভারতীয় সংগীতে অজ্ঞাত। কাজেই ভারতীয় সংগীত একক সুরের বিকাশ, পরিবর্তন ও বিবর্তনের ওপর নির্ভর করে।

ইতিহাস যুগে যুগে শিল্পকলায় নব নব রূপের উন্মেষের সন্ধান দেয়। কোনো শিল্পকলা পুরাতনকে আঁকড়ে থাকে না। কেবল মৌল বিষয়গুলিই বজায় থাকে। বৈদিক যুগের গানের রীতিকে লৌকিক দৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিল গান্ধর্ব গানের রীতি, তারপর এসেছিল দেশী সংগীতের রীতি, পরে রাগসংগীত, পারসী প্রভাব, ভক্তিমূলক সংগীতের বা ধর্মীয় সংগীতের ধারা, কর্ণাটক সংগীতের নতুন গঠনরীতি, লোকপ্রচলিত বর্তমান গানের রূপ ইত্যাদি। স্তরের পর স্তর এমনি ভাবে যুগে যুগে সঞ্চিত হয়েছে ধারাগুলো। এই বহু সাংগীতিক রূপের মধ্য দিয়ে মৌল বিষয়ের পরিবর্তনের কার্য-কারণ-সূত্র অনুসন্ধান করা চলে। সেই সূত্রেই এখানে ইতিহাস বিশ্লেষণের আগে সংগীতের ঐতিহাসিক ক্রম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। এটা শুধু বিভিন্ন ধারার সংগীতের মূল ইতিহাস অনুসন্ধানের সহায়ক ক্রমবিন্যাস।

বর্তমান ভারতীয় সংগীতের দুটো পর্যায়—হিন্দুস্থানী (উত্তর ভারতীয়) এবং কর্ণাটক (দক্ষিণ ভারতীয়)। এই দুটো স্বতন্ত্র রীতির মধ্যে কোন আদিম গোষ্ঠীগত লক্ষণ খোঁজবার উপায় নেই। কারণ দুই রীতি মূলে একই অতীতকে অবলম্বন করেছে। মৌল বিষয় এবং লক্ষ্যের কোন পার্থক্য না থাকলেও প্রভেদ অনেক। এই দুই পর্যায়ে বহু ধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতে হনুমন্ত মত ও দক্ষিণ ভারতে মেল পদ্ধতি এই দুটো অবলম্বন করে দুই পর্যায়ের ভাগ হয়েছে মধ্য যুগে। সমগ্র ভাবে দুই সংগীত একই সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ। এজন্যে সংগীতের ইতিহাসে এই দুই পর্যায় একই ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির অন্তর্গত।

সংগীতের ঐতিহাসিক ক্রম ঃ আদি ও মধ্যযুগ

াল/ইতিহাস	বিষয় * ব্যক্তি * গ্রন্থ	সংগীত বিষয়ক
ানুমানিক ষ্টপূর্ব ০ —২০০০ (?)	মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা	প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন বাদ্যযন্ত্র ॥ নৃত্য
খৃঃ পূঃ ০০—৬০০।৫০০	**বৈদিক যুগ** **ঋগ্বেদ** মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। দশটি মণ্ডল, কয়েকটি যুগের বচনা।	গানেব প্রথম স্তর ঃ পূর্বার্চিক, আরণ্যক, সংহিতা, উত্তরার্চিক—একস্বরে আর্চিক, দ্বিস্বরে গাথিক—স্তুতি ও আবৃত্তি মূলক গান।
	সামগান স্বরযুক্ত ঋকমন্ত্র বা সামের সমষ্টি। চতুর্বেদ অবলম্বনে নানা শ্রেণীর গান	৩ স্বরের গান। পরে ৫ স্বরে ও ৭ স্বরেও প্রচলিত। অবরোহী ক্রমে স্বর ব্যবহার। লৌকিক সমাজে প্রচারিত—বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত। গায়ক শ্রেণী ঃ সামগ, সামগাচার্য। সামগান ক্রমোন্নতির পথে এগিয়েছিল।
পূ ৬ষ্ঠ শতক	প্রতিশাখ্য, পুষ্পসূত্র, শিক্ষা	
পূ ৬০০।৫০০ ষ্টাব্দ ১০০ ৪ ৫৬৬ —বা—— ৪ ৪৮৫ = বুদ্ধদেব	**গান্ধর্ব গানের ধারা** **প্রথম পর্যায়** ব্রহ্মা ভরত ঃ নাট্য বেদ সদাশিব ভরত ঃ নাট্য গ্রন্থ স্বাতী ঃ তালবাদ্য বিশারদ বিশ্বাবসু তুম্বুরু ঃ পৌরাণিক	লোক-প্রচলিত সংগীত ব্রহ্মামত (সংগীত পদ্ধতি) শিবমত „ আদি গায়কের ক্রম ঃ ব্রহ্মা > সরস্বতী > নারদ > ভরত অথবা ভরত > নারদ > রম্ভা > হাহা > হুহু > তুম্বুরু

কাল/ইতিহাস	বিষয় * ব্যক্তি * গ্রন্থ	সংগীত বিষয়ক
খৃঃ পূঃ ৩য় শতক	রামায়ণ, পাণিনি	জাতিবাগ। বীণার ব্যবহার
খৃঃ পূঃ ২য় শতক	মহাভারত ॥ হরিবংশ ॥	গ্রামবাগ। নৃত্য, বাদ্য যন্ত্রাদি
খৃঃ পূঃ ২৭২-২৩২ অশোক	জাতক (বৌদ্ধ প্রভাব)	নৃত্যেব বিকাশ।
খৃষ্টাব্দ ১০০-৫০০	**গান্ধর্ব গানের ধারা ঃ**	**পরিণত পর্যায় বা রেনেস**
১০০ (প্রথম শতক)	নাবদ ঃ শিক্ষা	সামগানের বৈশিষ্ট্য এবং
১২৫—১৫০		গান্ধর্ব গানেব রূপ। (গ্রামবা
কণিষ্ক ॥ অশ্বঘোষ		
২০০ (২য় শতক)	মুনি ভরত ঃ নাট্যশাস্ত্র	স্বর, শ্রুতি, মূর্ছনা, অলঙ্কার, তান, জাতিবাগ, ধ্রুবাগীতি, ভাষা, রসতত্ত্ব।
৩য় শতক - ৫ম শতক	ভবতেব সমসাময়িক শিষ্য ও পববর্তী শাস্ত্রী—যাঁবা গান্ধর্ব গানেব চিন্তায় যুক্ত ছিলেন ঃ কোহল, দত্তিল, শাণ্ডিল্য,	বর্ণিত বিষয় ঃ নাদ, স্বর, শ্রুতি, মূর্ছনা, অ- ঙ্কার, তান, বাগত্বধর্ম, স্বরমণ্ড বাদ্যেব উপাদান, তালবাদ্য,
৩২০—৩৫০ ১ম চন্দ্রগুপ্ত	শাদূর্ল, নন্দিকেশ্বব, কশ্যপ, দুর্গাশক্তি, যাষ্টিক	নৃত্য, নৃত্ত।
৩৩০—৩৭৫ সমুদ্রগুপ্ত	পুবাণাদি নানা সাহিত্যেব বচনা কাল (বিশেষতঃ বায়ু-পুবাণ)।	সুব ঃ জাতিরাগ > গ্রামরাগ > ভাষাবাগ > বাগ > বিভাষা >
৩৭৫—৪১৫ ২য় চন্দ্রগুপ্ত কালিদাস	ব্রাহ্মণ্য ভাবধাবাব বিকাশ। নাট্যধারা ও নাট্যসংগীতের পবিণত স্তর।	অন্তরভাষা ইত্যাদি।

কাল/ইতিহাস	বিষয় * ব্যক্তি * গ্রন্থ	সঙ্গীত বিষয়ক
খৃষ্টীয় ৫০০	মতঙ্গ : বৃহদ্দেশী	নাদ-শ্রুতি-মূর্ছনা-তান-রাগলক্ষণ (বাদিত্ব, সংবাদিত্ব) রাগের রঞ্জকত্ব এবং দেশীরাগ ও প্রবন্ধ।
খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক	বৈদেশিক আক্রমণ ॥ উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি। অঞ্জনেয় (?)	
৮০—৬৩৮ শশাঙ্ক ৬০৬—৬৪৮ হর্ষবর্ধন হিউ-এন্-সাং বাণভট্ট	হনুমন্ত বা হনুমান মত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও পুরাণাদির প্রভাব। বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয় প্রধান দেবতা। মহাযান বৌদ্ধ প্রভাব। তান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার।	রাগ সঙ্গীতের আদি পর্যায়
খৃষ্টীয় ৭ম শতক —১১শ দশক	পার্শ্বদেব : সংগীতসময়সার	ভাষা, বিভাষা ও দেশী রাগের ব্যবহার ॥ প্রবন্ধ গান।
	নারদ : সংগীত মকরন্দ	রাগের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ।
খৃষ্টীয় ৭ম শতক	দামোদর গুপ্ত : কুট্টনিমতম্ কুডুমিয়ামালাই শিলালিপি : গ্রামরাগ	গান : নানা প্রবন্ধের মধ্যে ভক্তিমূলক গান, মঙ্গলগান প্রভৃতির প্রচলন
৮০—৯৫০ পাল বংশ	**আঞ্চলিক ভাষায় রাগ প্রয়োগ**	
৯৫০—১২৫০	বৌদ্ধগান ও দোহা : চর্যাগীতি, বজ্রগীতি	ধ্রুব, সমধ্রুব প্রবন্ধগান, সতাল ধাতুবন্ধ। ১৬টি রাগের উল্লেখ।
০ম শতক	অভিনব গুপ্ত : অভিনব ভারতী-ভরতভাষ্য	
	নান্যদেব : সরস্বতী হৃদয়ালঙ্কার-ভরতভাষ্য	

কাল/ইতিহাস	বিষয় * ব্যক্তি * গ্রন্থ	সঙ্গীত বিষয়ক
১১শ শতক	সোমেশ্বর দ্বিতীয়ঃ অভিলাষার্থ চিন্তামণি। সোমেশ্বর তৃতীয়: সংগীতরত্নাবলী	
খৃ ১১৭৯-১২০০ লক্ষ্মণসেন ১২ শতক	জয়দেব ঃ গীতগোবিন্দ বাংলায় ও উড়িষ্যায় ব্যাপক প্রচার। রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যে নানান সাংগীতিক নাট্য নৃত্যরূপ।	১২টি রাগের উল্লেখ, শৃঙ্গার রসের অভিনব অভিব্যক্তি। নিবদ্ধ করণ প্রবন্ধ। স্থানে স্থ মন্দিরে নাট্য ও নৃত্যে রূপান্তরিত।

সময় ও ইতিহাস	সাংগীতিক বিষয়	ধর্মীয় ধারা
১২০০—১৫০০	(১) উত্তর ভারতে রাগসংগীতে পারসিক প্রভাব (২) প্রাচীন সংগীত ধারা এবং নতুন রাগসংগীত (৩) ধ্রুপদের প্রথম প্রকাশ	বৌদ্ধ ‖ বৈষ্ণব ‖ শৈব শাক্ত ‖ মুসলমানী ‖ স্ব সহজিয়া ‖ তান্ত্রিক
১২০৬—১২৯০ দাস বংশ	**শার্ঙ্গদেব**—১২০৮ –১২৪৮ (?)ঃ সংগীতরত্নাকর ঃ ৭টি অধ্যায় ; বিশেষ লক্ষণ ঃ প্রবন্ধ গান সালগ-সূড়, দেশী-রাগ।	কোণারকে সূর্য মন্দির উৎকীর্ণ বাদ্য যন্ত্র ও স খলিত মূর্তি
১২৯০—১৩১৬ আলাউদ্দীন খিলজী	**আমীর খুসরৌ** ঃ ১২৫৪—১৩২০ তারানা, খ্যাল (নামকরণ) (?) কওয়াল, মোকাম, নতুন রাগ ও তাল। * গোপাল নায়ক * বৈজু বাওরা	সূফী মতের প্রভাব

সময় ও ইতিহাস	সাংগীতিক বিষয়	ধর্মীয় ধারা
১৩২০—১৪১৩	হরিপালদেব—১৩০৯—১৩১২ (?) :	
তুঘলক বংশ	সংগীতসুধাকব	
১৩৯৪	১৩৯০ সিংহ ভূপাল : সংগীতসার—	
(ফিরোজশা তুঘ-	বত্নাকর টীকা	১৩৫০—১৪৫০
লকের জৌনপুর-	১৪শ—১৫শ শতক	বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস (১ম)
রাজ্য প্রতিষ্ঠা)	মাধব বিদ্যারণ্য : সংগীতসার	
১৪১০—১৪৫১	১৪৩৩—১৪৬৫	১৪৪০—১৫৩৮ কবীর
সৈয়দবংশ	রাণা কুম্ভা—বসিক-প্রিয়া (গীত-	১৪৪৯ ১৫৬- শঙ্করদেব
	গোবিন্দ টীকা), সংগীত মীমাংসা	বরগীত
	১৪৪১—১৫৬৪	১৪৫০ (?)
	পুবন্দর দাস (কর্ণাটক)	স্বরূপ দামোদর
	কর্ণাটকী মূল প্রবন্ধ—বাগ ও সুর,	১৭৬১—১৫০৮ নানক
	পল্লবী, অনুপল্লবী, চরণম্ বচয়িতা	
	"কৃতি" শব্দের ব্যবহাব।	
বাহলুল লোদী	১৪২৮-১৫০০	১৪৭০—১৫২৫/২৬
	জৌনপুবেব সুলতান হুসেন শর্কী খাঁ।	রায় রামানন্দ
	চুটকলা গান, খেয়াল, টপ্পা (?)	১৪৭৮/৮৩ (?)
	১৪৮৫—১৫১১	সুরদাস
	রাজা মানসিং তোমর ও মৃগনয়নী :	১৪৮৬—১৫৩৩
	মানকুতূহল। গায়ক : নায়ক বকশু,	শ্রীচৈতন্য
	মজ্ঝু, ভন্নু, মামুদ, বৈজু, গোপাল,	১৪৭৫/৭৬—৫৪০
		নরহরি সবকাব
	কর্ণ, পাণ্ডেয়	১৪৯৮ ১৫০৪
১৪৯০—১৫ ৮	১৫শ শতকের শেষ ভাগ (১৪৪৬-১৪৬৫)	১৫৪৮ বা ১৫৬৩-৭৩
বাংলার	কল্লিনাথ : কলানিধি (রত্নাকর টীকা)	মীরা
		১৫০৮—১৬০৬
হুসেনশাহ	১৪৮০—১৫৭৫ স্বামী হরিদাস	কণকদাস (কর্ণাটক)
১৫২৬—১৫৩৪	১৫৫০ (?)	১৫৩০—১৬০০
বাবর	রামমাত্য : স্বরমেল কলানিধি	সন্ত সুবদাস

সময় ও ইতিহাস	সাংগীতিক বিষয়	ধর্মীয় ধারা
১৫৩০।৩৯ —১৫৫৪।৫৫ হুমায়ুন	১৫৯০ পুণ্ডরিক বিট্‌ঠল সদরাগ চন্দ্রোদয়, রাগমঞ্জরী, রাগমালা	১৫৩২—১৬২৩ তুলসীদাস ১৫৩৪—ঠাকুর নরোত্তম ১৫৮২ খেতুড়ী উৎসব (পদাবলী কীর্তনের রীতি) ১৫৪৪—১৬০০ দাদু (দয়াল)
১৫৫৬—১৬০৫ আকবর [আবুল ফজল (৩৬ জন সেরা গায়কের নাম উল্লেখ)]	স্বামী হরিদাস, তানসেন, রামদাস, বিলাস খাঁ, মিশ্রী সিং, বাজবাহাদুর, সুরদাস (ইত্যাদি) ১৫৬০ জগন্নাথ কবিরায় ১৫৭৯—১৬২৬ ইব্রাহিম আদিল শাহ্-নওরস-ই-আদিল	
১৬০৫—১৬২৭ জাহাঙ্গীর	১৬০৯ সোমনাথ—রাগবিবোধ ১৬১৪ গোবিন্দ দীক্ষিত—সংগীত-সুধা ১৬২০।৩০ বেঙ্কটমখী - চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা	
১৬২৭—১৬৫৮ শাহজাহান	১৬২৫।৩০ দামোদর মিশ্র—সংগীত দর্পণ ১৬৫০ (?) -৭৫ লোচন পণ্ডিত—রাগতরঙ্গিণী অহোবিল—সংগীত পারিজাত	১৬২৩—১৬৭২ ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ণাটক)
১৬৫৮—১৭০৭ আউরঙ্গজেব	১৬৪০ (?) হৃদয়নারায়ণ দেব : হৃদয়-কৌতুক, হৃদয়-প্রকাশ ফকিরুল্লাহ্ : সংগীত-দর্পণ (মানকুতূহলের উদ্ধৃতি সহ)	১৬৭০—১৭২০ উপেন্দ্র ভঞ্জ (উড়িষ্যা) (জনান ও ছান্দ সংগীত)

সময় ও ইতিহাস	সাংগীতিক বিষয়	ধর্মীয় ধারা
	১৬ ৪ (?) ভাব ভট্টঃ অনূপ সংগীত বিলাস অনূপ সংগীত রত্নাকর	
	১৭০০ শ্রীনিবাস ঃ রাগতত্ত্ব বিবোধ	
১৭০৭—১৭১২ শাহ্ আলম		নারায়ণ দেব (জন্ম ১৭শ শতক) সংগীত নারায়ণ অলঙ্কার চন্দ্রিকা (১৭২৫—৩৭)
১৭১৩ —১৭২০ সৈয়দ ফারুকশিয়ার ১৭১৯—১৭৪৮ মহম্মদ শা	গুলাব খাঁ (ধ্রুপদী) নিয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) অদারঙ্গ (ফিরোজ খাঁ) মহারঙ্গ (ভূপত খাঁ · মনরঙ্গ (শিষ্য)	নারায়ণ মিশ্র সংগীত সরণি নরহরি চক্রবর্তী (জন্ম ১৮শ শতকের প্রথমে) ঃ ভক্তিরত্নাকর গীত চন্দ্রোদয় ।
	কর্ণাটক সংগীতের উজ্জ্বলতম শতবর্ষ ১৭৫০—১৮৫০ ১৭৬৭ —১৮৪৭ ত্যাগরাজা ১৭৬৩—১৮২৭ শ্যামাশাস্ত্রী ১৭৮৩ তুলোজী রাও ঃ সংগীত স্বরামৃত ১৭৭৫ ১৮৩৫ মুথুস্বামী দীক্ষিতার ১৮১০— ··· স্বাতী তিরুণাল	(১৭১৮।২৩ ১৭৭৫) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কালী কীর্তন (১৭৮৯ —১৮৪৮) কবিসূর্য বলদেব রথ কিশোর চন্দ্রানন চম্পু (ওড়িশী সংগীত)

গ্রন্থ ও শাস্ত্রীদের এবং রচয়িতা শিল্পীদের সময় নিয়ে নানা মতান্তর হলেও ক্রমবর্ণনার অনুসারে সংক্ষেপে সংগীতের ধারাগুলোর সময় মোটামুটি স্বীকৃত। এগুলো নিম্নলিখিতরূপেও বর্ণনা করা যায় :—

আনুমানিক কাল	সাংগীতিক ধারা
খৃষ্টপূর্ব	
১. ৫০০০—৩০০০ (?)	মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা : প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন
২ ৩০০০—১৫০০ (?)	বৈদিক ধারার প্রথম স্তর—ঋগ্বেদ
১৫০০— ৫০০	সামগান
৩ ৫০০— ১০০ খৃষ্টাব্দ	গান্ধর্বগানের ধারা—প্রথম পর্যায়
৪ ১০০— ৫০০	গান্ধর্বগানের পরিণত পর্যায়
৫ ৫০০— ৯০০	রাগ সংগীতের আদি-স্তর
৯০ —১২০০	আঞ্চলিক ভাষায় গান। রাগ প্রয়োগ (দেশী)
১২ ০—১৫০০	রাগ সংগীতে পারসীক প্রভাব
	প্রাচীন ও নতুন রাগসংগীত
	ধ্রুপদের প্রথম স্তর
	হনুমন্ত মত
১৫০·—১৬০০	রাগশ্রেণী-বিভাগে মেল
	ধ্রুপদের পরিণত স্তর
১৬০০—১.২০	মেল, ঠাট ; রাগের শ্রেণী বিভাগ
৬. ৯০০—.৪০০	ধর্মীয় সংগীতের প্রথম স্তর
১৪০০—১৮০০	সন্ত সংগীত, কীর্তন, ভজন, শাক্ত-সংগীত ও অন্যান্য
৭ ১২০০—১৭০০	খেয়ালের প্রাচীন স্তর
১ ০০—১৮০০	খেয়ালের বিকাশ ॥ টপ্পার বিকাশ
১৮০০—	ধারাবাহিকতায় খেয়াল—বর্তমান পর্যন্ত। ঠুমরীর বিকাশ
৮. ১৪০০—	বাদ্য সংগীত :
	বীণার রূপান্তর ও অন্যান্য তত যন্ত্র
	অবনদ্ধ বাদ্যের বিকাশ
	সুষীর—সাহনাই এর প্রচার
৯. .৭৫০—১৮৫০	কর্ণাটক সংগীতের স্বর্ণ যুগ

ঊনবিংশ শতকের পূর্ব থেকে বর্তমান লোকপ্রচলিত সংগীতের ধারার সুরু। অঞ্চল অনুসারে এর তারতম্য হতে পারে। বিভাগগুলি মোটামুটি :—১ ধর্মীয় সংগীত, ২ কাব্য সংগীত. ৩ নাট্য সংগীত, ৪ বর্তমান শ্রেণী – আধুনিক, রাগপ্রধান, ব্যবসায়িক (চিত্র গীতি) ইত্যাদি। প্রচলিত পর্যায়ে আরো বিভাগ আছে। এ ছাড়া **লোকসংগীত** বহু বিচিত্র ভাগে বিভক্ত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লোকসংগীত স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচ্য।

সংগীতের স্বতন্ত্র স্তর

সংগীত ইতিহাসের একটি স্তর লোকসংগীত এবং আদিম সংগীত নিয়ে গঠিত। সমাজ, গোষ্ঠী, জাতি ও তাদের ধর্মবিশ্বাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ও অবসর বিনোদনের উপায় ইত্যাদি বহু বিষয় অবলম্বন করে অত্যন্ত সহজ, সরল সংগীত সেখানে বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশের ধারা মুখে মুখে বহু যুগের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে। আজকের যুগের প্রত্যক্ষ উদাহরণ সংগ্রহ করে এই সংগীতের ইতিহাস নির্ধারণ করা হয়।

মানব গোষ্ঠীর লোক-সংগীতের এই ইতিহাস নানা ভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নানা থিওরি—কি ভাবে সংগীত আদিম মানুষের মধ্যে সুরু ও বিকাশ লাভ করেছিল। এইসব তত্ত্ব অনুসারে :—১। সংগীতের প্রথম স্ফুরণের মূলে আছে যৌন আবেদন। যেমন—পাখী বিশেষ মিলনের ঋতুতে গেয়ে ওঠে (ডারউইন); ২। অনুকরণই সংগীত স্ফুরণের কারণ (প্রাচীন শিকারী মানুষ প্রাণীজগতের অনুকরণ করেই সুরের সন্ধান পেয়েছে); ৩। সংগীতের উৎপত্তি হয়েছে শরীরে ছন্দের আদিমতম আবেদন থেকে (কার্ল বুশার); ৪। চিৎকার করে ওঠা বা বলা থেকে সংগীতের সূত্রপাত (রুশো, হার্ডার, হাবার্ট স্পেন্সার); ৫। স্বতঃপ্রবৃত্ত আবেদনে সহসা শব্দস্ফুরণের মতোই সংগীত-স্ফুরণের ইতিহাস নিতান্ত দৈহিক কারণের কথা বলে; ৬। আবেগের সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনাব হঠাৎ প্রকাশ থেকে সংগীত উৎপন্ন (ডাঃ বার্নি); ৭। শিশু পরিচর্যার ফসলরূপে ঘুমপাড়ানী গানের মতোই সংগীতের প্রথম অভিব্যক্তি হয়েছিল; ৮। শব্দ বা কথা সুর-উৎপত্তির কারণ; ৯। অনেক দূর থেকে চিৎকার করে ডাকাডাকিতে সুরের উদ্ভব; ১০। জনৈক তাত্ত্বিক তো প্রাচীন কথা-বিহীন শাব্দিক-ভাষা (Sound-

language)-কে সুর-উৎপত্তির কারণ বলেন। নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব গবেষণার মধ্য দিয়ে সংগীত উৎপত্তির এসব বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন এখানে নেই। কারণ, সংগীত (সুর) উদ্ভবের কারণের সংগে জড়িত কণ্ঠ, মন, শরীর, জীবন, পরিবেশ এ সকলই।

আদিম সংগীত ও লোকসংগীত বিকাশের লক্ষণগুলোতে এমন কতকগুলো সামঞ্জস্য আছে যে এ সবের তুলনামূলক বিচারও চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উনবিংশ শতকে ইয়োরোপে Compatative Musicology নামে সংগীত-শাস্ত্রের প্রচলন হয়। বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে পাশ্চাত্যে এই ধারাটি নৃতত্ত্বের সংগে সংমিশ্রিত হয়ে Ethnomusicology রূপে প্রচারিত। এই সংগীতের ইতিহাস রচনা মানবের জাতিগত ও গোষ্ঠীগত সংগীত অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে জনসমাজের ইতিহাস, ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস জনিত নানা লক্ষণ, ভাষাগত প্রকৃতি, প্রভৃতি প্রসংগ আলোচিত হয়।

উল্লেখ করা দরকার যে আদিম এবং গোষ্ঠীগত সংগীত-প্রকৃতির সংগে সংস্কৃতিমূলক, পরিশীলিত সংগীত-পদ্ধতির মিল থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সংগীতকে কোন বিশিষ্ট আদিম গোষ্ঠীগত ও জাতিগত সংগীত-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

অথচ অনেক ইয়োরোপীয় বা পাশ্চাত্য Ethnomusicologist পাশ্চাত্য সংগীত ছাড়া আর সকল প্রকারের সংগীতকেই এই একই অনুসন্ধানের বিষয় মনে করেন। ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ গোষ্ঠীই যেমন এক দেহে মিশে গেছে, তেমনি বিভিন ধরণের সংগীতও একটি বিশিষ্ট সংগীত-দেহে লীন হয়েছে। কয়েক হাজার বছর ধরে সংগীতের ধারাগুলো লুপ্ত হয়েছে বা নানাভাবে (আর্য সংগীত, গান্ধর্ব সংগীত, দেশী ও লোকপ্রচলিত সংগীত) রাগ সংগীত ও নানা প্রচলিত সংগীত-রূপ লাভ করেছে। লোক-সংগীতও এই সব রূপে প্রভাবিত। কিছু কিছু আদিম সংগীত প্রাচীন লক্ষণ নিয়ে আনাচে কানাচে বজায় আছে। সবটা মিলিয়ে দেখে রাখা যেতে পারে, ভারতে কত মানুষের ধারা আদিমকালে এসেছিল। তা হলেই বোঝা যাবে আদিম সংগীত আর আদিম রূপে বজায় নেই।

ভারতের মানবগোষ্ঠীর শাখাগুলো এইরূপ ঃ

(১) **নেগ্রিটো জাতি**—আফ্রিকা থেকে আগত আন্দামান-নিকোবর,

কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরের পার্বত্য অঞ্চল, বিহারের রাজমহল ও আসামের কোন কোন স্থানে বসবাসকারী কালো, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা খর্বশির মানুষ।

(২) **আদিম অস্ট্রোলয়েড বা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জাতি**—পশ্চিম থেকে আগত ইন্দোনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়ায় বাস, কৃষ্ণকায় প্রশস্ত ললাট, মোটা নাকের লোক ভারতীয় নানান আদিবাসী শ্রেণীতে পরিণত ও জনতায় সংমিশ্রিত।

(৩) **মঙ্গোলীয় জাতি**—মধ্য এশিয়া ও হিমালয়ের অপর দিক থেকে এসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। এদের একাংশকে ভোট-ব্রহ্মও বলা হয়, অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী ব্রহ্মদেশ অঞ্চল থেকে প্রবেশ করেছে।

(৪) **ভূমধ্যসাগরীয় জাতি**—কর্ণাটক, তামিল, মালয়ালাম অঞ্চলে প্রথম উপশাখার বাস, দ্বিতীয় শাখার পাঞ্জাবের উত্তর গাঙ্গেয় অঞ্চলে বাস, তৃতীয় উপশাখার বাস সিন্ধু, পাঞ্জাব পূর্বাঞ্চল, রাজপুতানা এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে। এরা কৃষ্ণকায়, প্রশস্ত ললাট, খর্ব নাসিকা, মধ্যমাকৃতি। অস্ট্রিক ভাষার সংমিশ্রণ হয়েছে এদের ভাষায়। সম্ভবত দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষ।

(৫) **আলপাইন জাতি**—খবশির, মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত, গুজরাট থেকে বিহারের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বাস। আলপাইন জাতির দিনারিক শাখার বসবাস বাংলা, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, তামিল ও কাথিয়াবাড়ে। আলপাইন জাতির তৃতীয় শাখা আর্মেনীয়—এরা পার্শী জাতি।

(৬) **বৈদিক আর্যজাতি বা নর্ডিক**—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসী। মহারাষ্ট্র, মধ্য ও উত্তর প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে আর্যরক্ত বিদ্যমান। এই সকল জাতির সংমিশ্রণ ও অবস্থান হয়েছে এইরূপে: নর্ডিক বৈদিকগণ আলপাইনে সংমিশ্রিত, ভূমধ্যসাগরীয় বা দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ ভারতে, আদিম অস্ট্রোলয়েড এবং নেগ্রিটো জাতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—অরণ্যে ও পর্বতাঞ্চলে এবং বিভিন্ন এলাকায় 'আদিবাসী', মঙ্গোল—তিব্বতীয় ব্রহ্ম—ভারতের পূর্বাঞ্চলে—পাহাড়ের সানুদেশে এবং অন্যান্য জাতির সংগে সংমিশ্রিত।

এই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি অন্যান্য সকলকেই প্রভাবিত করেছিল। দীর্ঘ দুই হাজার বছরে বৈদিক সংগীতের ক্রমবিকাশের কালে অন্যান্য গোষ্ঠীর সংগীতও আত্মসাৎ করবার সময়ে বা সংগে

গান্ধর্ব সংগীতের উৎপত্তি ও প্রসার। দেখতে পাওয়া যায় দুয়ের মধ্যে নানা ভাবে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাও হয়েছে। বিশিষ্ট গোষ্ঠীগত কোন সংগীত বজায় থাকেনি। আদিমরূপে চিহ্নাঙ্কিত করবার উপায় নেই। পরবর্তীকালের সংগীতও নানাভাবে মিশ্রণের মধ্য দিয়ে মুখে মুখে (Oral tradition'এ) আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। বহু বিভাগ, বহু শ্রেণী, বহু রীতি, বহু রূপ নিয়ে এই সাংগীতিক ধারা।

ভাষা

অনেকের মতে ভাষা অবলম্বন করেই সংগীত দাঁড়ায়। বিশেষ করে আদিম সংগীত ও ভাষার সম্পর্ক বিশেষ ভাবেই আলোচিত। সংগীত ভাষায় নির্ভরশীল, এর একটি বিশেষ উদাহরণ বৈদিক গান। বৈদিক যুগে একস্বর, দ্বিস্বর ও ত্রিস্বর ভাষাব বাহন হিসেবেই উপস্থিত। ভাষার উচ্চারণেব আভিজাত্য রাখবার জন্যে বহু দৃঢ়বদ্ধ আইন-কানুন রচিত। সুর ভাষারই অনুগত। অবশ্য এটা একটা চূড়ান্ত উদাহরণ। সামগানের পরের যুগে সংস্কৃত শ্লোক গানেও ভাষার প্রাধান্য। রামায়ণ-মহাভারতের কথা মনে করা যেতে পারে। গান্ধর্বগানের যুগে নাট্যশাস্ত্রে ভরত ধ্রুবাগানের আলোচনায় অর্ধসংস্কৃত, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি ভাষায় গানের কথা উল্লেখ করেছেন। নাট্যের গানে মাগধী নিম্নশ্রেণীর ভাষা, নিম্নশ্রেণীর লোকের গীত।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতি সহজ ভাবেই দেশে বিদেশে পালি ভাষায় প্রসারিত হয়, পালি ভাষায় শ্লোকগান এবং সেই সংগে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ হয়। কয়েকশত বৎসর অতিক্রম করে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজাদের আমল ভারতীয় সংস্কৃতিব স্বর্ণযুগ। এ সময়েও সংস্কৃত, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী ও অন্যান্য কথ্য ভাষায় বা প্রাকৃতে গানের প্রচলন হয়। সংস্কৃত নাটকের গানগুলোও প্রচলিত হয়েছিল ধরে নেওয়া যায়। আনুমানিক সপ্তম খৃষ্টাব্দ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষাগুলো অপভ্রংশ থেকে স্বতন্ত্ররূপে পরিণত হতে থাকে। চর্যাগীতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থাৎ এখানেই বর্তমান ভাষাগুলোর উৎপত্তি হতে থাকে। লৌকিক ভাষাতে

গান রচনা চলে। সংগীতগ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হলেও সংগীতের বাহন চলিত ভাষা ও ছন্দ। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে লৌকিক ভাষা-গুলোতে প্রচুর গান রচিত হয়েছিল। উত্তর ভারতে ব্রজভাষা সংমিশ্রিত বিশিষ্ট ভাষা-রীতি ব্যবহৃত হয় রাগ-সংগীতের বহু গানে। এই রচনাগুলোতে ভাষার সাহিত্যিক সৌন্দর্য না থাকলেও সংগীত-স্রষ্টার রচনা হিসেবে এবং সুরের বাহন হিসেবে গানগুলো আজও প্রচলিত। সংগীতজ্ঞের কাছে এর মুল্য সমধিক। কর্ণাটক সংগীতে অন্যান্য রচনার মধ্যে তেলুগু ভাষার রচনা সংগীতে বিশেষ স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে লোক-সংগীতে ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার উচ্চারণ-বিধি এবং ভাষার নানা অমার্জিত প্রকাশও লোকসংগীতের রূপ ও ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করে।

আজকাল ভারতীয় ভাষাগুলোতে অনেক স্থলে সংগীত অপ্রধান, কাব্যিক ভাষাই প্রধান। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতও স্মরণীয়—ভাষা ও সংগীতের সম-সংযোগই বাঞ্ছনীয়। মধ্যযুগের পদের ভাষা-মাধুর্য ও ভাবসম্পদের জন্য জয়দেবের পদ গান নিয়ে দেশময় মাতামাতি হয়েছিল। ধর্মীয় গানে ভাষা-সম্পদই প্রাধান্য লাভ করেছে। মাধুর্য ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিশিষ্ট গানে ভাষা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উর্দু গজল এর প্রমাণ। পুরোনো ধ্রুপদ খেয়ালের ভাষারূপ আজও অবিচ্ছেদ্য। মোটামুটি একদিকে বর্তমান গানে ভাষার প্রাধান্য যেমন স্বীকৃত, আবার বিশিষ্ট সংগীতে ভাষার অপ্রাধান্যও দেখা যায়।

বাদ্যযন্ত্র

সংগীতের আর একটি বাহন বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্রের প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়। সে সব যন্ত্র: ১, গলায় দোলান তাল যন্ত্র, ২, একতন্ত্রী যন্ত্র বীণা এবং হার্পের অনুরূপ, ৩ বাঁশী (সপ্ত-ছিদ্রওয়ালা। প্রমাণ করে সপ্ত স্বরের সচেতনতা)। সাধারণত এই যুগকে বৈদিক-পূর্ব বলা হয়। কিন্তু সপ্ত-ছিদ্র বাঁশী দেখে কেহ কেহ এগুলোকে বৈদিকোত্তর নিদর্শন বলেন।

প্রথম পর্যায়ে বৈদিক যুগে হোম ও পূজা ইত্যাদির সঙ্গে যে ছন্দোবদ্ধ গান হত তাতে বাজত তন্ত্রীযুক্ত বীণা এবং প্রধানত দুন্দুভি ইত্যাদি। যন্ত্রগুলোর নাম মোটামুটি: দুন্দুভি, গর্গর, পিঙ্গবাদ্য, আঘাটি, ঘাটলিকা

(ঘার্তলিকা), কাণ্ডবীণা, নাড়ী, বনস্পতি, শততন্ত্রী বীণা বা বাণ (বাণ অর্থে কণ্ঠও হয়), বেণু (বেণু অর্থে বাক ; ঋকযুগে বাঁশীর ব্যবহার ছিল না), তুণব, আদম্বর (উদুম্বরী), ধনুর্যন্ত্র (বেহালায় রূপান্তরিত ?), মর্দল, ঘোষকা, ভেরী, পটহ ইত্যাদি। সামগগণ কাত্যায়ণী বীণা ও গোধাবীণা (গোসাপের চামড়ায় তৈরি) ব্যবহার করতেন। এরপর ভূমি-দুন্দুভি এবং অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে পিচ্ছোলা বা পিচ্ছোরা, অলাবু, ঐশিকি, অপঘাতলিকা, কাশ্যপী বা কচ্ছপী বীণার উল্লেখ করা যায়। রামায়ণে বেণু, বীণা (পিচ্ছোরা, উদুম্বরী কাশ্যপী, বিপঞ্চী) ইত্যাদির এবং মহাভারতে দেবদুন্দুভি, শঙ্খ, সপ্ত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, পণব, তুরী, ভেরী, পুষ্কর, ঘণ্টা, গজঘণ্টা, বল্লকী, পিঞ্জির, নূপুর, পটহ, খারিজ, ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে হরিবংশে এবং জাতকে অনুরূপ যন্ত্রের কথা উল্লেখিত। নারদী শিক্ষায় দারবী বীণা এবং গাত্র বীণার প্রসঙ্গ আছে। নাট্যশাস্ত্রেব ২৮ পরিচ্ছেদে 'লক্ষণান্বিতম্ আতোদ্য' (বা পূত সংগীতযন্ত্র) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভবত বাদ্যযন্ত্রকে চার ভাগে ভাগ করেছেন: **তত** (তার যন্ত্র), **অবনদ্ধ** (আবৃত বা ঢোল, মৃদঙ্গ ইত্যাদি), **ঘন** (ধাতব বা গভীর শব্দদ্যোতক শক্তবস্ত, করতাল জাতীয়) **সুষীর** (ছিদ্রওয়ালা যা হাওয়ায় বাজে, বাঁশী ইত্যাদি)। তাছাড়া ভরত সমবেত যন্ত্রসংগীতকে কুতপ (অরকেস্ট্রা) বলেছেন। কুতপে সাধারণত ব্যবহৃত হত—গায়ন (গায়ক) বিপঞ্চী (দশতন্ত্রীযুক্ত বীণা), অন্য ধরণের বীণা (চিত্রা বীণাও হতে পারে), বাঁশী, পণব (ছোট আচ্ছাদিত যন্ত্র), দদুর (বড় রকমের ঘণ্টা)। প্রসঙ্গক্রমে স্বাতীর সৃষ্ট পুষ্করবাদ্য অবনদ্ধ এবং সেই সঙ্গে দদুর, মুরজ, আলিঙ্গ্য, উধ্বক এবং আঙ্কিক আনদ্ধ-যন্ত্রাদির সম্বন্ধেও বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে আছে। ভরতের বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগটিতে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে তা আজও স্বীকৃত। বাদ্যযন্ত্রগুলো নাট্যমঞ্চের কোথায় স্থান নেবে, ধ্বনিতত্ত্বের ধারণা নিয়ে মুনি ভরত সে নির্দেশও দিয়েছেন।

অশোকেব যুগ থেকে আরম্ভ করে গুপ্তযুগে এবং পরবর্তীকালের বহু বিখ্যাত কীর্তিসৌধে বহু যন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁচী, অজন্তা, ইলোরা, অমরাবতী, বরবুদুর, যাভা, বালি, নাগার্জুনকোণ্ডা, কোণারক, খাজুরাহো, বেলুড়-হালিবিড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নারদের সংগীত-মকরন্দতে ১৯ রকমের বীণার এবং সংগীত-রত্নাকরে ১১ রকমের বীণার উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব

নিজে নিঃশঙ্ক বীণার স্রষ্টা। তাছাড়া ভরতের মতো চলবীণা ও ধ্রুববীণায় সুর বেঁধে শ্রুতি বিচার করেছেন।

ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে সংগীত যন্ত্রগুলো নানাভাবে ব্যবহৃত ও রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলমান যুগে বিশেষ বিশেষ নতুন সংযোজন হয়। অন্যদিকে ঐতিহাসিক গবেষণায় জানা যায় যে সে-যুগে ভারতের বাইরেও ভারতীয় যন্ত্রের বহুল প্রচার হয়েছিল। বর্তমানের অনেক প্রচলিত যন্ত্রই প্রাচীন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যথা, সেতার। আমীর খুসরৌ সেতার উদ্ভাবন করে-ছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে, কিন্তু কোন প্রমাণ-গ্রন্থে উল্লেখ নেই। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বহু বীণার মধ্যে অনুরূপ বীণা—ভরত-বর্ণিত চিত্রা বীণা। চিত্রা বীণা পরবর্তীকালে সেতারের রূপ নিয়েছিল, বলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। আবুল ফজল কিন্নরী বীণা, স্বরবীণা, অমৃতি বীণা, রবাব, সারেঙ্গী, শানাই প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পুষ্কর বাদ্যের বিভাগে মুরজ পাখওয়াজের ব্যবহারের সাক্ষ্য দেয়। তবলা বাঁয়া আমীর খুসরৌর উদ্ভাবন কিনা তাও নির্দেশ করা চলে না। কারণ পূর্ব থেকেই দুই হাতে বাজাবার প্রচুর অবনদ্ধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেগুলো পরে আরবী, ফারসী নামে চলেছে। রবাব, শাহনাই ইত্যাদি তো পারস্যদেশ থেকেই এসেছে।

বর্তমান যুগে বাদ্য সংগীতের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রভাব অতি প্রচণ্ড। বহু বাদ্যযন্ত্র পশ্চিম থেকে আমদানী হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এদেশের সংগীতের প্রকৃতি বিবেচনায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সংগীত-যন্ত্র স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোকসংগীতের বাদ্যযন্ত্রকে নৃতাত্ত্বিকেরা লোকসংগীতের দিক থেকে স্বতন্ত্র রূপে মূল্যায়ন করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক্‌-বৈদিক

আদিম মানবকে শিকারী, পশুপালক ও কৃষিজীবি এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে ছিল ফল-অন্বেষী, পরে হয় শিকারী, তারপরে পশুপালক ও কৃষিজীবি। এই সূত্রে মানুষের মধ্যে সংগীতের সূচনা সম্বন্ধেও নানা ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে। আরো বিকাশের আগে, অর্থাৎ সুর ও তাল সম্বন্ধে চেতনা লাভের পূর্বে, পুরুষরা স্বাভাবিক ভাবেই ছন্দোবদ্ধ গতিতে এবং মেয়েরা একক সুরে (মেলডি) সংগীতের মতো ভাব প্রকাশ সুরু করে। সে প্রকাশ কি করে আদিম সংগীত, লোকসংগীত এবং পরে সংস্কৃতিমূলক সংগীতে পরিণত হয় সে স্বতন্ত্র বিষয়। আদিম মানুষের মধ্যে সংগীতেব প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রায় সমভাবেই সকল দেশের আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আদিম মানুষ সামাজিক ভাবে অনুষ্ঠানাদিতে (জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-উৎসব-শিকার-যুদ্ধ-ভৌতিক ব্যাপার-সম্মোহন) সমবেত হয়ে নাচ ও গান করত। ধীরে ধীরে চাষ, পূজা ও নানা আদিম সংস্কারবদ্ধ কাজের সংগে নৃত্যগীত জড়িত হতে থাকে। সেই স্তর থেকে ভারতীয় সংগীতের যে স্তরের ইতিহাস এখানে বর্ণিত তার দূরত্ব অনেক। বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র। দুয়ের সংযোগ স্থাপন গবেষণার কাজ।

যে সময় থেকে এবং জীবনের যে ঐতিহ্য থেকে ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় তাকে অনেকেই ঋক্‌ বেদের সভ্যতা থেকে পূর্ববর্তী সভ্যতা-শিল্প-সংস্কৃতির ফসল মনে করেন। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, ঝুকর, চন্নুদড়ো ইত্যাদি সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতত্ত্বীয় দেশ বা সহরগুলোতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার বহু ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে সংগীতের কয়েকটি সামগ্রী প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে মূল্যবান। অনেকের মতে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ৩০০০ বৎসরের মধ্যে। প্রকৃত ইতিহাস এখনো জানা নেই বলে মতভেদও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সংগীতের দিক থেকে এর মূল্য সমধিক। ওখানে পাওয়া গিয়েছে হাড়ের বিকৃত বাঁশী, বীণা,

চামড়ার বাদ্য, ব্রোঞ্জের একটি নৃত্যশীলা নারী ও দুটি নর্তকের ভগ্নমূর্তি। তাছাড়া আরো বাঁশী, বিকৃত বীণার অবয়ব, ব্রোঞ্জের আরো তিনটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি, করতাল জাতীয় যন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। হাড়ের বাঁশী যেমন আদিমতম যন্ত্রের উদাহরণ, বীণা, মৃদঙ্গ জাতীয় যন্ত্র, তন্ত্রীযুক্ত বাদ্য তেমন উন্নততর সংস্কৃতির নিদর্শন। নৃত্য তৎকালীন সমাজের সংগে আদিম জাতির সংস্পর্শ ঘোষণাকারী। ভগ্ন পুরুষ-মূর্তি, যাকে আদিম 'নটরাজ'-অভিব্যক্তি বলে ধরা হয়েছে, এই সকলই একসংগে সংগীত-সচেতন জীবন ও সমাজের কথা ঘোষণা করে। মোটামুটি নির্দিষ্টভাবে কিছু না জানা গেলেও উদাহরণগুলি প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির সাংগীতিক দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া যায়।

বৈদিক ধারা

বেদের সময় নিয়ে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা, খৃষ্টপূর্ব ১২০০-১০০ (মোক্ষমূলর), ২৫০০—১০০০ (উইণ্টারনিটস্), ৫০০০—৩০০০ (সার জন মার্শাল), ব্রাহ্মণ—২৫০০ (বালগঙ্গাধর তিলক) ইত্যাদি। বহু অংশ পরবর্তী কালের (আরণ্যক, উপনিষৎ, প্রতিশাখ্য, শিক্ষা ইত্যাদি)। সাংগীতিক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিচারে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উল্লেখিত সময়—খৃষ্টপুর্ব ৩০০০ থেকে ৬০০ এখানে দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর মতটি আদিম, প্রাগৈতিহাসিক এবং বিভিন্ন দেশের সাংগীতিক ইতিহাসের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ নিয়ে চারটি বেদের প্রতিটির চার ভাগ। ভাগগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত। পাঠ, গান ইত্যাদির জন্যে নিয়মশাস্ত্র 'প্রতিশাখ্য' ও 'শিক্ষা' পরবর্তী রচনা। সম্প্রদায় ভেদে বেদগুলির বহু শাখা। ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদের পরবর্তী অথর্ববেদ। মন্ত্র-সমুচ্চয়ের নাম সংহিতা। ব্রাহ্মণগুলি যাগযজ্ঞ ইত্যাদির কর্মকাণ্ড ও যজ্ঞকাণ্ড। উপনিষৎ বা বেদাঙ্গে—জ্ঞানকাণ্ড। আরণ্যকে—জ্ঞান ও কর্ম দুটোরই প্রয়োগ। সংগীতের দিক থেকে প্রধান 'সংহিতা' বা মন্ত্র, যেগুলো আবৃত্তি বা বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে গান করা হত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের আহুতি ইত্যাদিতে। প্রথমে ঋগ্বেদ, দশটি মণ্ডলে রচিত, বিভিন্ন ধারায় চারটি ভাগে কয়েক যুগের অভিব্যক্তি। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্ব থেকে প্রস্তুতি এবং ঋগ্বেদের প্রকাশ ২৫০০ খৃঃ পূঃ থেকে

ধরে নিয়ে প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০ নাগাৎ সামবেদের পূর্ণ প্রকাশ ও ধীরে ধীরে ক্রম-পরিবর্তনের দিকে যাওয়া—ধরা যায়। এই অর্থে সাম মানে **সামগান।** তাছাড়া সামবেদেরও শাখা-প্রশাখা তো আছেই। সামগানই বৈদিক সংগীত ; গান ও গীত শব্দই ব্যবহৃত, সংগীত শব্দটির প্রচলন খৃষ্টাব্দ ৭০০-র পূর্বে হয় নি। বৈদিক গানের সংগে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রথম থেকেই হয় (বাদ্যযন্ত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে সামগান সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

গান : ব্যাপকভাবে আর্চিক ও গাথিক এই দুই নিয়ে ঋগ্বেদের গান। শুধু ঋক্‌মন্ত্র—আর্চিক (ছন্দস্‌ ও উত্তরা। ছন্দআর্চিক—পূর্বার্চিক)। গানের ভাগ—পূর্বার্চিক, আরণ্যক, সংহিতা, উত্তরার্চিক। উত্তরার্চিক যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে গান করা হত। আর্চিকের অনেকগুলি বিভাগ বিভিন্ন রীতিতে গীত। তিনটি ঋক্‌সম্পন্ন গানকে বলা হয় ত্রিঋচ্‌। সামই মূল বৈদিক গান। কয়েকটি ঋক্‌ নিয়ে এক একটি সাম গান। কমপক্ষে ৬টি ঋকের সমবায়ে একটি গান উৎপন্ন। সামবেদের অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, অনুব্রাহ্মণ ইত্যাদি। দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণে সাম গানের উল্লেখ। মন্ত্রব্রাহ্মণ বা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ছন্দকারীদের জন্যে।

গানের অঙ্গ : প্রোস্তা, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন। প্রতিটি অঙ্গে স্বতন্ত্র গান স্বতন্ত্র ভাবে গীত। গানের ছন্দোচ্চারণই গানের অঙ্গের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ আছে ঋকের বৃহতী ছন্দে, জগতী ছন্দে, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দে উৎপন্ন বিভিন্ন সামগানের ছন্দ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সত্যিকার ছন্দমূলক সামগান। এখানে সাম মানে ছন্দের সাম্য। সামগানের মন্ত্রের উচ্চারণ শাখা অনুযায়ী বিভিন্ন হত। শাখাগুলি রাণায়ণ, উলুণ্ডী, কারাটি, মশক, বার্ষগব্য, কুথুম বা কৌথুম, শালিহোত্র, আহ্বারক, প্রভৃতি ১৩টি। এর মধ্যে রাণায়ণী, কৌথুমীয় ও জৈমিনীয়—এই তিনটি শাখাই বর্তমান। বিভিন্ন শাখায় স্বর প্রয়োগের সংগে পাঠপ্রয়োগের তারতম্য দেখা যায়।

স্বর ও সুর : গানে আর্চিকে এক স্বর, গাথিকে দুই স্বর, সামগানে তিন স্বর, বিকাশের সংগে স্বরান্তরে চার, ঔড়বে পাঁচ, ষাড়বে ছয়, সম্পূর্ণতে সাত স্বর ব্যবহৃত। পাঁচ ও সাত স্বর পরবর্তী বিকাশ। ঋক প্রতিশাখ্যে আছে, সামগানে প্রথমাদি সাত স্বর লীলায়িত। কৌথুমী শাখার সামগানে সাত স্বর ব্যবহৃত। স্বর বীণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট : ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার। যথাক্রমে এগুলো লৌকিক রীতির স্বরে ক্রুষ্টকে প্রথম এবং

অবরোহী ক্রমে অন্য স্বরগুলি যথাক্রমে মা, গা, রে, সা, ধা, নি ধরা হয়। অতিস্বার্য স্বরের বক্রগতি ধা নি পা লক্ষণীয়, যদিও এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শিক্ষা ও প্রতিশাখ্যের উল্লেখে দেখা যায় সামগানের বেলায় তিন সপ্তক ও স্বর-নিয়ামক স্কেলের উদ্ভব হয়েছিল। গীতের তিনটি স্বরস্থান—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। যদিও অবরোহীক্রমে স্বর যোজনা করে সুরের উৎপত্তি। গানগুলো তিন স্থানে গাওয়া হত। প্রতিশাখ্যকার শৌনক গানের তিন স্থানের উল্লেখ করেছেন—মন্দ্র, মধ্যম, উত্তম বা তার।

গায়ন শৈলী: চার রকমের পদ্ধতির গান প্রচলিত ছিলঃ গ্রামগেয় বা প্রকৃতি গান, আরণ্যক-গান, উহগান, উহ্যগান বা রহস্য গান। প্রত্যেকটি শ্রেণীতে বহু সংখ্যক গানের উল্লেখ। বিভিন্ন গানের ঋক মন্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামগেয় গানই যাগযজ্ঞ ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ্যে বিশেষ ভাবে প্রচারিত।

গানের অঙ্গ: (প্রোস্থা, উদ্গীথ ইত্যাদি) স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া হত। গায়কদলও স্বতন্ত্র। বিশেষ বিশেষ স্থলে 'গাথা-গান' হত। পরে গাথা-গানে বিভিন্ন স্বর প্রয়োগের রীতি প্রচলিত হয়। গান করার আগে হুম্ উচ্চারণ বা হিংকার, উদ্গীথের আগে ওম্ উচ্চারণ অথবা প্রণবের প্রচলন ছিল। কোন কোন ব্রাহ্মণে হিংকার, ওম্‌কার নিয়ে গানের সাতটি ভাগ।

আরো ভাগ বর্ণনা: বিকাশ, বিশ্লেষণ, বিকর্ষণ, অভ্যাস, বিরাম ও স্তোভ। গানের সময় বিরতিতে স্তোভের ব্যবহার—আউ, হোবা, হাউহাউ ইত্যাদি। তিনটি বর্তমান শাখার দুটিতে, অর্থাৎ রাণায়ণী ও কৌথুমীতে, উচ্চারণ পদ্ধতির পার্থক্য লক্ষিত হয়।

গায়ক: সামগানের আচার্যদের বলা হয় সামগ। সামগগণ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রস্তোতী পুরোহিতেরা গাইতেন প্রোস্থা, উদ্গাত্রীরা উদ্গীথ (উদ্গান), প্রতিহারীরা—প্রতিহার, উদ্গাত্রীরা—উপদ্রব এবং অন্যান্য পুরোহিতেরা নিধন ভক্তিগান করতেন। সাধারণত সামগেয় দুই ভাগ —উদ্গাত্রী ও প্রস্তোতী। ঋত্বিক উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞে আহুতি দিতেন —তিনিই উদ্গাতা। প্রধান ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। বহু প্রচারিত সামগানের জন্যে তিনজন সামগায়ীর দরকার হত—উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা। সোমযাগে তো ষোলজন ঋত্বিক থাকতেন, এর মধ্যে চারজনের ছিল পাঠের রীতি। যে কোন যজ্ঞে স্তোত্রগান করতেন অধ্বর্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহোত্রী, উদ্গাত্রী ও ব্রহ্মা।

গান্ধর্ব গান—প্রথম পর্যায়

এর পরেই আমরা আর একটি যুগে এসে পৌঁছে যাই, এ যুগ আনুমানিক ৬০০ বা ৫০০ খৃষ্টপূর্ব সময়ের বলে ধরে নেওয়া যায়। এই যুগে সামগান যেমন বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে চলেছিল, অন্যদিকে লোকপ্রচলিত গানও প্রচলিত ছিল। গন্ধর্ব শব্দটি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। গান্ধর্বগীতি বা তৎকালীন লোক-প্রচলিত গান যে রূপ লাভ (লোকসংগীত নয়) করেছিল, তাই নিয়েই সে যুগের সংগীতের বিচিত্র বিবর্তন। এক দিকে সামগান চলেছে, অন্যদিকে সে সময়ে নাট্যসংগীত বা গন্ধর্বদের গান বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়ে যুগ অতিক্রম করে আসছিল। গন্ধর্বরা কে?—কোথায় ছিলেন?—এ সব নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। সংগীত-শাস্ত্রীদের গ্রন্থে গান্ধর্ব গানের নানান তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই সাংগীতিক স্তরের সময় সম্বন্ধে মতান্তর হতে পারে, কিন্তু ভরতের নাট্যশাস্ত্র কেন্দ্র করে গান্ধর্বগীতিব স্পষ্ট পরিচয়ের সুরু। ভরত থেকে আরম্ভ করে গুপ্ত যুগের রাজত্ব পর্যন্ত নাট্য ও সংগীতের চরম অভিব্যক্তি। সে অনুসারে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগ প্রসাবিত।

সংগীতশাস্ত্রীদের মতে গান সৃষ্টির ইতিহাসটা গোড়া থেকে স্বতন্ত্র রকমের। অনাহত ও আহত নাদ থেকে ওঁকার এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে স্বর ও গানের সৃষ্টি। সংগীত শব্দটির উল্লেখ অনেক পরবর্তী। গান শেখার পরম্পরা এইরূপ: ব্রহ্মা>মহাদেব>সরস্বতী>নারদ>ভরত। অন্য স্তরে ভরত> নারদ>রম্ভা>হাহা>হুহু>তুম্বুরু ইত্যাদি। মূলে দ্রুহিনব্রহ্মা ও সদাশিব এই লোকপ্রচলিত (গান্ধর্ব) বা মার্গসংগীতের বাহক। এই সূত্রেই পরে পাওয়া যায় আরোহী ক্রমে সপ্তস্বরের ব্যবহার, স্বাতীর পুষ্করবাদ্য সৃষ্টি এবং অন্যান্য বাদ্যের ব্যবহার, নাট্যক্ষেত্রে নানান বাদ্যের প্রয়োগ ইত্যাদি। ব্রহ্মা, নারদ, ভরত যেমন অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি, তেমনি তুম্বুরুও অতি-প্রাকৃত ব্যক্তিতে পরিণত। বিশেষ করে ব্রহ্মা ও ভরত, ভরতের অনুগামীরা ও ভরত—ইত্যাদিও সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই যুগের সংগীতের অনুসন্ধানে ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমি লক্ষ্য করা যাক। ৫০০ খৃষ্টপূর্বের পরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে উত্তর ভারতে। অশোক (২০০ খৃঃ পূঃ এবং পরে)

এবং কণিষ্ক (১ম খৃঃ শতকের পর) ভারতবর্ষে ও বাইরে যে প্রবল বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন তাতে সামগান স্থানচ্যুত হয়েছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময়ের মধ্যে পাণিনি, রামায়ণ, মহাভারত, খিলহরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রামায়ণে সাম ও লৌকিক উভয় সংগীত রীতিই ব্যবহৃত, গান্ধর্বগান প্রশংসিত। মূর্ছনা, জাতিরাগ, গ্রামরাগ, বৃত্তি, আশীর্গান, গাথাগান ইত্যাদি প্রচলিত। নানা অলংকারের উল্লেখ, বেণু-বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। মজার ব্যাপার, অনার্য দশানন শংকরের স্তুতি করেন সামগান গেয়ে। এরপর মহাভারতে গান্ধর্ব গানের স্পষ্ট প্রয়োগ। গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাদের নৃত্যগীত, গাথা গান, স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মূর্ছনা এবং যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ, বেণু, মৃদঙ্গ ও নয়টি তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বিপঞ্চী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। মঙ্গলগীতি, আশীর্গান প্রভৃতি বৈতালিকেরা গান করত। মহাভারতে রথন্তর সাম ও বৃহৎসামের ব্যবহার আছে। এরপর মহাভারতের পরিশিষ্ট গ্রন্থ খিলহরিবংশের কথা উল্লেখ করা যায়। তত্ত্বের দিক থেকে হরিবংশকে এই সময়ের রচনা বলে ধরে নিলেও পুরাণ শ্রেণীভুক্ত এই গ্রন্থে আছে অনেকটা পরিমার্জিত সংগীত ও নৃত্যের তথ্য। অর্থাৎ, বহু বৈচিত্র্যমূলক সংগীত, বিশেষতঃ নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পরবর্তী সময়ের কথা বলে। এ গ্রন্থেও গান্ধর্বগান ও সামগানের সংমিশ্রণ আছে। তবে মার্গ-সংগীতই বিশেষ লক্ষণীয়। নৃত্যের প্রাধান্য এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। হল্লীশ নৃত্য, আসারিত নৃত্য, সপ্ত তার যুক্ত ঝল্লীশ বাদ্য, ছালিক্য গান, গ্রামরাগের প্রাধান্য, তিন গ্রামের প্রচলন, তুম্বী বীণা, বল্লকী মৃদঙ্গ, তূর্য, ভেরী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে সরস্বতী সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গান্ধর্ব গানের এই সামগ্রিক রূপ ঘোষণা করে যে সামগান গোড়ায় গান্ধর্ব রীতিকে প্রচুর প্রভাবিত করেছিল, সংমিশ্রণ হয়েছিল যথেষ্ট।

গান্ধর্ব গানের উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে এই গান খৃষ্টীয় শতকের প্রথমেই নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে থাকে। অর্থাৎ খৃঃ পূঃ পাঁচশত বৎসরে ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংগীতের অবস্থা এইরূপ: তখন লোক-প্রচলিত পান্ধর্ব গান সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত। সামগান লোকসমাজে প্রচারিত ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সামগান লোক-প্রচলিত গানের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে পালি ভাষায়

স্তোত্র-রীতি প্রচলিত, তাছাড়া চলিত প্রাকৃত ভাষাগুলোতে হয়ত লোক-সংগীতও ছিল কিন্তু কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই, যদিও দেখা যায় নাটকের গানে নানান প্রাকৃতের ব্যবহার নির্ধারিত ছিল। আরোহীক্রমে সপ্তস্বরের ব্যবহার, মূর্ছনা-তান-অলঙ্কার প্রয়োগসহ জাতিরাগ-গ্রামরাগের ব্যবহার, বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার ইত্যাদি খবর গান্ধর্ব গানের প্রথম যুগ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে নারদকে নির্দিষ্ট করা হয়, বিশেষ করে এ গ্রন্থে সাম-গানের সংগে গান্ধর্ব গানের যোগমূলক তত্ত্ব এবং লৌকিক সপ্তস্বর বর্ণনার প্রাথমিক ভঙ্গি। তাছাড়া শ্রুতির যে বিশ্লেষণ পরবর্তী ভরতে পাওয়া যাচ্ছে নারদের শিক্ষায় তার প্রস্তুতি মাত্র। দ্বিতীয় শতকে ভরত ও তাঁর নাট্যশাস্ত্র এবং ভরতের সমসাময়িক কাল থেকে ভরতশিষ্য কোহল ও তাঁর সমসাময়িক দত্তিল, শার্দূল (ব্যাল), যাষ্টিক, বিশ্বাখিল, নন্দীকেশ্বর (ভরতের সমসাময়িকও হতে পারেন), শাণ্ডিল্য (ভরতের পূর্বের ?), দুর্গাশক্তি, মতঙ্গ প্রভৃতি সংগীত শাস্ত্রীদের কথা বিবেচ্য।

গান্ধর্ব গান—পরিণত পর্যায়

স্বীকার করতেই হবে যে যখন নাট্যশাস্ত্রের মত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তখন থেকেই নাট্য ও সংগীতের রেনেসাঁর স্বরু। তখনই ভাল ভাল নাটক রচিত হয়েছে, কারণ তত্ত্ব কখনো প্রত্যক্ষ উদাহরণ অবলম্বন না করে গঠিত হতে পারে না। ধরে নেওয়া যায়, যখন নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়েছিল তখন ভরতের সমসাময়িক নাটকও প্রচলিত ছিল। অশ্বঘোষের নাটক এবং ভাসের নাটককে এই সময়ে নির্ধারিত করা হয়। এই সময়ের সূত্র ধরে আমরা চলে আসি গুপ্তযুগের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধর্ব গানের চরম স্ফুরণ ও অভিব্যক্তি। ঐতিহাসিক দিক থেকে গুপ্তযুগই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণ যুগ। অনেকের মতে রামায়ণ, মহাভারত পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল, বিশেষ করে পুরাণাদি এই সময়ে রচিত হয়েছিল। একথা কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না যে গান্ধর্ব সংগীতের পরিণততম সময়ে কালিদাস তাঁর কাব্য ও নাটক লিখেছেন। গুপ্তযুগের রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিবেশেই সংগীত প্রসার লাভ করে। এ সময়কার মূর্তি পূজা প্রচলন, ভক্তিতত্ত্বের প্রসার, ধর্মগুলোর সমন্বয়পন্থী আদর্শ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রগুপ্ত নিজে বীণা-

বাদক। এই সব তথ্য সংগীতের একটি যুগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংগীতের রেনেসাঁর পরিবেশ অব্যাহত রাখে। মোটামুটি, গান্ধর্বগানের প্রথম পর্ব খৃঃ পূঃ পাঁচশত বৎসর এবং পরিণতির যুগ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাঁচশত বৎসর। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে অসংখ্য সংগীত-শাস্ত্রী তাঁদের সংগীততত্ত্ব রচনা করেন। এসব গ্রন্থদৃষ্টেই উন্নতির সমীক্ষা করা যায়। তাঁদের রচনা প্রায় একই দিকে উদ্দিষ্ট। কাজেই এই সকল সংগীত-গ্রন্থের কালনির্ধারণে সময়ের হেরফের, বা মতভেদ এই যুগেং সংগীত চিন্তায় কোন বাধাব সৃষ্টি করে না। এবারে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বন কবে সংগীতের ইতিহাসের স্তরগুলি লক্ষ্য কবা যেতে পারে।

প্রথমে **নারদের 'শিক্ষা'**—প্রথম শতকের গ্রন্থ। অনেকের সন্দেহ—পরবর্তী হতে পাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একাধিক নারদের উল্লেখ শাস্ত্রে আছে। সংগীত-মকরন্দের নারদের সঙ্গে তুলনা করে গোড়ায় সংশয়েব উদ্রেক হয়েছিল, তা অনেকটা কেটে গেছে। নাবদী শিক্ষা গ্রন্থের তভিনবত্ব বিষয়বস্তুতে নিবদ্ধ। একদিকে বৈদিক গানের আঙ্গিক বিশ্লেষণ অন্যদিকে গান্ধর্ব গানেব রূপ নিরাকরণ, একদিকে বৈদিক অবরোহী স্বরের প্রকৃতি বর্ণনা অন্য দিকে লৌকিক আরোহী সপ্তস্বরেব বৈশিষ্ট্য, সামগানের স্বরের সঙ্গে লৌকিক স্বরের ধ্বনিগত ঐক্য, ষড়জাদি স্বরের জন্মকাহিনী ইত্যাদি বর্ণনা, স্বরগুলোকে শরীরেব বিভিন্ন অঙ্গে স্থাপন, সাতটি গ্রাম—একুশটি মূর্ছনা অলংকার, তান ইত্যাদিব মিলিত নামকরণঃ 'স্বরমণ্ডল'—এই সকলই এই গ্রন্থের মৌলিক প্রকৃতি ঘোষণা করে। ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের অস্তিত্ব ও গান্ধার গ্রামের বিলুপ্তি একটি বিশিষ্ট খবর। গ্রামরাগ ৭টিঃ ষড়জ গ্রাম, ষাড়ব, পঞ্চম, কৈশিক, কৈশিক মধ্যম, মধ্যমগ্রাম, সাধারিত। বিষয়বস্তু বর্ণনাব অবলম্বনে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নারদী শিক্ষা ভরতের পূর্বযুগের রচনা বলাই সঙ্গত।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র নাটকের দিক থেকে আঙ্গিক সম্বন্ধে যেমন একটি প্রধান এবং প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ তেমনি প্রধানতম প্রাচীন সংগীত শাস্ত্র। নাট্য-সংগীত সম্বন্ধে যেমন পূর্ণ আলোচনা আছে, তেমনি নৃত্য-গীত-বাদিত্রের এবং ঐকতান সংগীতের উপাদান ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে বিচিত্র বিশ্লেষণ আছে। নাট্যশাস্ত্রের বহু টীকাকারের মধ্যে অভিনব গুপ্তের 'অভিনব ভারতী' সম্পূর্ণরূপে প্রধান টীকা হিসেবে বর্তমান আছে। ৬০০০ শ্লোক নিয়ে ৩৬টি (মতান্তরে ৩৭টি) পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সংগীত বিষয়ে রচনা ২৮ থেকে ৩৮ পরিচ্ছেদ।

ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি প্রস্তুতিতে এই সংগীতালোচনা অতুলনীয়। বিষয়-বস্তু সংক্ষেপে : স্বর, ২২টি শ্রুতি বিশ্লেষণ, ২১টি মূর্ছনা, ৭টি প্রধান এবং ১১টি বিকৃত জাতিরাগ, ৬৪টি ধ্রুবা প্রবন্ধের প্রকৃতি, গানের অলংকার, ধাতু, বর্ণ ও তান, গান্ধর্বগানের তাৎপর্য, রসের মূল উৎস (বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনা সহ) শৃঙ্গারাদি আটটি রসের বিশ্লেষণ এবং বাদ্যযন্ত্রের অভিনব ও যুক্তিসংযত শ্রেণীবিভাগ, গানের ভাষা (সম্মানিত ব্যক্তির ও দেবতার ভাষা সংস্কৃত ও অর্ধ-সংস্কৃত, সাধারণের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত, নিম্নশ্রেণীর ভাষা মাগধী।) মোটামুটি ভরতের যুগ জাতিরাগের যুগ। এ সম্পর্কে গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ইত্যাদি প্রকরণ বিশ্লেষণ করেছেন ভরত। গ্রাম বলতে উল্লেখ করেছেন ষড়্‌জ ও মধ্যম—এই দুই গ্রামের অস্তিত্ব (তাই, ৭টি করে ১৪টি মূর্ছনা) এবং দেব-লোকের গান্ধার গ্রাম লুপ্ত। অন্য দিকে গ্রামরাগ সম্বন্ধে ভরত কোন কথাই উল্লেখ করেন নি।

ভরতবর্ণিত ১৮টি জাতি রাগ : ১ ষাড়্‌জী, ২ আর্ষভী, ৩ গান্ধারী, ৪ মধ্যমা, ৫ পঞ্চমী, ৬ ধৈবতী, ৭ নৈষাদী, ৮ ষড়্‌জ্‌ কৈশিকী, ৯ ষড়্‌জোদীচ্যবতী, ১০ ষড়্‌জমধ্যমা, ১১ গান্ধারোদীচ্যবা, ১২ রক্তগান্ধারী, ১৩ কৈশিকী, ১৪ মধ্যমোদীচ্যবা, ১৫ কর্মারবী, ১৬ গান্ধারপঞ্চমী, ১৭ আন্ধ্রী, ১৮ নন্দয়ন্তী। জাতিগুলি ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামে শ্রেণীবদ্ধ। জাতিরাগ শ্রুতি, গ্রহ, স্বর প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন। জাতিরাগ রস-প্রতীতির কারণ এবং সকল রাগের সৃষ্টির কারণ জাতি।

পরবর্তী বিশ্লেষণে একথা স্বীকৃত যে জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ এবং গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ এবং সেই সঙ্গে বিভাষা ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছে। গান্ধর্বযুগে এই জাতিরাগের ও গ্রামরাগের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হয়ে যখন ভাষারাগ ইত্যাদি প্রচার হচ্ছে তখনই বর্তমান রাগসংগীতের সূচনা হয়েছে দেশী রাগের মারফতে। ভরত-সমসাময়িক এবং পরবর্তী সংগীত-শাস্ত্রীদের রচনা লক্ষ্য করলে একথা স্পষ্টই বোঝা যাবে।

দেশী এবং মার্গ—এই শব্দগুলো আজকাল অত্যন্ত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সংগীত-শাস্ত্রে এই শব্দ দুটো নির্দিষ্ট আঙ্গিকে প্রয়োগ করা হয়। মার্গ বলতে বোঝাত গান্ধর্ব গান, অর্থাৎ যে গানের উপাদান—স্বর (শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, সাধারণ, জাতি, বর্ণ, অলংকার, ধাতু ইত্যাদি), তাল (মাত্রা,

বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, গানের অবয়ব ইত্যাদি), এবং পদ (ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, বৃত্ত, অখ্যাত, উপসর্গ ইত্যাদি)। এইভাবে রচিত গান বিচিত্র বাদ্যাদি সহকারে গাওয়া হত। এই উপাদানগুলো ছিল বেদের যুগের লোক-প্রচলিত দ গীতের। বিশেষ করে গন্ধর্বরা এ গান ভালবাসতেন, দেবতাদেরও আনন্দদায়ক ছিল। ব্রহ্মাভরত বেদ থেকে নানা ভাবে সংগ্রহ করে নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমবায়ে এ গানের গ্রন্থ "নাট্যবেদ" রচনা করেন। এর পরের সংগ্রহ ও আলোচনা করেন আর একটি গ্রন্থে রচয়িতা সদাশিব ভরত। সবশেষে মুনি ভরত সেগুলো থেকে সঞ্চয় করে ও সমন্বয় করে দাঁড় করান নাট্য-সংগীতের অভিনব ললিতকলা শাস্ত্র। এই সব গান্ধর্ব সংগীতই 'মার্গ-সংগীত' অর্থাৎ 'অন্বেষিত' বা 'দৃষ্ট' সংগীত। মার্গের পরবর্তী অবস্থায় 'দেশী' সংগীতের কথা আসে। ভরতের অনুগামী শাস্ত্রীগণ (কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, মতঙ্গ প্রভৃতি) সবচেয়ে বড়ো কাজ করেন এই যে সেকালে যে সব সংগীতের রূপ বা সুর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল সেগুলোকে বাছাই করে 'দেশী' বলে অভিহিত করেন। 'দেশী' অর্থে লোকসংগীত নয়, লোক-প্রচলিত কলাশ্রয়ী আঞ্চলিক সংগীত, মার্গ থেকে স্বতন্ত্র। এই দেশী সংগীতই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রাগসংগীতে পরিণত হয়েছে। একথাও বলা সংগত যে গান্ধর্ব-পূর্ব যুগে মার্গ সংগীতের সংগে যেমন সামগান নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বলা হয়ে থাকে তেমন ভরতোত্তর যুগে মার্গ বা গান্ধর্ব সংগীতের সংগে দেশী বা লোক-প্রচলিত সর্বপ্রকার সংগীতের নিগূঢ় সংযোগের কথাও সুবিদিত।

ভরতোত্তর গান্ধর্ব গান

ভরতের শিষ্যস্থানীয় **কোহল** "সংগীতমেরু" রচয়িতা, সে যুগের অত্যন্ত প্রভাবশালী সংগীতশাস্ত্রী। কোহলের আলোচনায় নাট্যধারা ও অভিনয়ের আঙ্গিক প্রধান স্থান পেলেও সাংগীতিক বিষয়ে তিনি বলেছেন গ্রামরাগ ও ভাষারাগের কথা এবং ভরতের অনুসরণে শ্রুতি, মূর্ছনা ও নিজস্ব চিন্তায় অলঙ্কার আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্র রচনার শেষাংশে তাঁর হাত ছিল এমন কথাও শোনা যায়। বৃহদ্দেশীতে কোহলের আলোচিত তাল ও জাতির কথা আছে। নারদ (মকরন্দকার), পার্শ্বদেব, অভিনবগুপ্ত কোহলের তালপ্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। "তাল লক্ষণ" ও "কোহলরহস্য" নামে আরো

দুটো গ্রন্থের কথাও উল্লেখিত হয়। **দত্তিল** ভরতের সমসাময়িক, "দত্তিলম্ গ্রন্থের রচয়িতা। সাংগীতিক বিষয়ে নারদের মতো স্বরমণ্ডলের বিশ্লেষণ ও গানের উপাদান, ২২টি শ্রুতি, মূর্ছনা, স্থান, গ্রাম, শুষ্ক, নির্গীত বাদ্য সাধারণ জাতি, বর্ণ, রস ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। তিনি কাকলী নিষাদ, অন্তরগান্ধারের কথা, ৮৪টি তান, ১০টি রাগত্ব ধর্ম, অর্থাৎ গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ষাড়ব, ঔড়ব, অল্পত্ব, ন্যাস, অপন্যাস ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। তালের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করেছে। তালের উপাদান ও ৭টি তাল বিশ্লেষণ করেছেন। দত্তিলের পর **শার্দুলের** কথা আসে। শার্দুল বা ব্যাল কোহলের গ্রন্থে প্রশ্নকর্তা এবং কোহল উত্তরদাতা। শার্দুল দেশজ রাগে বর্ণনা করেছেন কয়েকটি অভিজাত ভাষারাগ : দেবলবধনী, পৌরালী, ত্রাবণী, তানলতিকা, দেহ্যা, শার্দুলী, ভিন্নবলিতকা, রবিচন্দ্রা, ভিন্নপৌরালী, দ্রাবিড়ী, পিঞ্জরী পাবতী, টক্ক ইত্যাদি। মনে হয় শাস্ত্রীরা ক্রিয়াসিদ্ধ লোক ছিলেন, তাঁদের স্বকৃত রাগও প্রচারিত হয়েছে। **যাষ্টিক** বলছেন গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ ভাষারাগ থেকে বিভাষা, বিভাষা থেকে অন্তরভাষা রাগের উৎপত্তি। শুদ্ধা ভিন্না, বেসরা, গৌড়া, সাধারিতা এই কয়েকটি গ্রামরাগ গীতি। যাষ্টিক ভাষাগীতি বিভাষা গীতি ও অন্তর-ভাষিকা গীতির কথা বলেছেন ও এই সঙ্গে দেশীরাগের উল্লেখ করেছেন, যাকে মতঙ্গ বিশেষ করে বিশ্লেষণ করেছেন **নন্দিকেশ্বর** এই সমসাময়িকদের মধ্যে একজন যিনি **অভিনয়-দর্পণে** মন্দ্র, মধ্য তার এই তিন স্থান, ১২টি সুরের মূর্ছনা এবং জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ভাষারাগ এবং দেশীরাগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই সময়কালের মধ্যে আরো সংগীতশাস্ত্রীর কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু একথা বলা দরকার যে গান্ধর্ব সংগীতে পরিণত স্তরে নানান সুর-পদ্ধতি, জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ভাষারাগের বিভিন্ন প্রকার এবং সব শেষে দেশী রাগ—বিস্তৃত হতে থাকে। এই গোষ্ঠীর শেষ এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রী মতঙ্গ "বৃহদ্দেশী" রচয়িতা। বৃহদ্দেশীতে পূর্বের শাস্ত্রীদের গ্রন্থ থেকে মূল্যবান উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যদিও কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' এমন একটি গ্রন্থ যাতে আমরা গান্ধর্ব সঙ্গীতের পরিণত অবস্থায় পৌঁছে যাই। পূর্বের শাস্ত্রীদের তত্ত্বের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে যুক্ত। গ্রন্থে অনেকের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রীদের আলোচিত জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ভাষারাগ নানাভাবে ব্যবহারের কথা বলবার

ার ইনি বহু দেশীরাগ প্রয়োগের সন্ধান দিয়েছেন। অর্থাৎ সঙ্গীতে বহু সংস্কৃতির ধারা এসে মিশেছে। পূর্বের সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের রচনা থেকে উপাদান গ্রহণ করে স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। ২২টি শ্রুতি ছাড়া তিন গ্রামের ৬টি শ্রুতি ভরতেরই অনুরূপ। তাছাড়া নাদ, স্বর, স্বরনির্ণয়, মূর্ছনা, তান, বর্ণ, অলঙ্কার, জাতি, ভাষালক্ষণ রাগলক্ষণ বর্ণনা আকর্ষণীয়। অর্থাৎ আলোচনার মৌলিকতা আছে রাগের বাদীত্ব ও সংবাদীত্বের ব্যাখ্যায়, স্বর-অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখে, মূর্ছনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়, চার রকমের বর্ণের পরিচয়ে (স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী, অবরোহী), গীতি বিভাগে (মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা পৃথুলা)। ভরতের অনুসরণে আঠারটি জাতিরাগের লক্ষণ এবং রাগশব্দের ব্যাখ্যাতে রাগ অর্থে "রঞ্জকো জনচিত্তানাং"—এমনভাবে উল্লেখ পূর্বে পাওয়া যায় না। গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষারাগ থেকে বিভাষিতা, বিভাষিতা থেকে অন্তরভাষা রাগ বিশ্লেষণ সমাধা করে মতঙ্গ ৭৩টি দেশী রাগের বর্ণনা করেছেন। অভিজাত দেশী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই ৭৩টি, যথা টংক থেকে ১৬টি কিংবা ১০টি, মালবকৈশিকের ৮টি ইত্যাদি। এছাড়া দেশজ রাগের আঞ্চলিক প্রকৃতির কথাও উল্লেখিত। দেশী প্রবন্ধগুলো এইরূপ : কান্দাখ্য, কর্ষিতা, কৈবাল, ঢেঙ্কী ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন তাল, পদ, দেবতা, রীতি, বৃত্তি, কুল, রস, বর্ণ প্রভৃতি এবং গণৈলা, মাত্রৈলা, বর্ণৈলা ইত্যাদি দেশী এলা প্রবন্ধের কথা বলেছেন মতঙ্গ। সবশেষে একথাই বলা দরকার যে মতঙ্গকে নিয়েই যদি গান্ধর্ব সংগীতের যুগের পরিসমাপ্তি চিন্তা করা যায় তাহলে তাঁকে নিয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে একথাও বলা চলে। কারণ রাগের রঞ্জকত্বগুণের এমন ব্যাখ্যা আর পূর্বে পাওয়া যায় নি। তাছাড়া সংগীত যে জনচিত্তকে লক্ষ্য করে পরিবর্তনের পথে পা বাড়িয়েছে শুধু সমাজের প্রয়োজনে, সংগীতের এই নতুন গতির কথা জানিয়ে দেয়। অভিজাত দেশীই মূলে বর্তমান রাগ রীতির উৎস। মতঙ্গের পর থেকেই তাই রাগসংগীতের যুগের গোড়াপত্তন অনুমান করা যায়।

পরিবর্তনের পথে গান্ধর্ব গান

যদিও মতঙ্গকে সাধারণতঃ ৫০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দের লেখক বলে ধরে নেওয়া হয়, ভাষাগীতির সময় সূত্রে কেউ আবার মতঙ্গকে বাণভট্টের পরবর্তী বলেও উল্লেখ করেন। বৃহদ্দেশী মতঙ্গের রচনা কিনা এই সন্দেহও

দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসের দিক থেকে গুপ্তযুগের পরবর্তীকাল শান্ত পরিবেশের সময় নয়। তাছাড়া নানা ভাবেই পরিবর্তনের যুগ, ভারতের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে নানা রাজত্বের উত্থান-পতন চলতে থাকে। ৫০০ থেকে ৬০০ শতক বাইরের আক্রমণে উত্তর ভারত বিপর্যস্ত হতে থাকে; মগধ অঞ্চল এই সময়ে সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলে কিছু পূব থেকেই মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা ইত্যাদি গীতির প্রচলন হতে থাকে। এই গীতিরূপের সংগে গ্রামরাগ সংমিশ্রিত। এখানে বলা দরকার যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কুড়ুমিয়ামালাই শিলালিপিতে ৭টি গ্রামরাগের নাম এবং স্বরলিপি উৎকীর্ণ হয়েছে। গ্রামরাগের নামগুলো নারদী শিক্ষায় পাওয়া যায়। শৈব রাজা মহেন্দ্রবর্মন শুধু এখানে নয় তিরুমৈয়ম গিরিমন্দিরেও সাতটি রাগের নাম উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন জানা যায়। মহেন্দ্রবর্মনের এ-কাজ নিজ রাগ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল, সঙ্কীর্ণ-জাতি নামে নাকি রাগ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে বলা দরকার যে জাতি রাগের পরে গ্রাম সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং এইরূপ শিলালিপি অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে যে গান্ধর্ব গানের প্রথম পর্যায়ে ভরত-পূর্ব যুগে গ্রামরাগের যে উল্লেখ আছে সেগুলো ভরতোত্তর যুগের প্রক্ষেপ হতে পারে। ফলে অত্যল্পকাল পরে ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা রাগের সৃষ্টি। দেশী রাগের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা যায়। একথাও সত্য যে শুধু মগধ অঞ্চলেই নয়, সংগীতের ব্যাপ্তি দাক্ষিণাত্যেও হতে থাকে। প্রাচীন গীতির আঙ্গিকের দৃঢ়-বন্ধন বজায় থাকার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সে জন্যেও দেশী সংমিশ্রিত রাগ এবং গানের প্রচলন হয়। এই সব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ফসল রাগসংগীত —যার পরিণত রূপ কয়েক শতক পরে স্পষ্ট হয়।

খৃষ্টাব্দ ৬০৬ থেকে ৬৪৮ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল। গুপ্ত বংশের পর থেকে সংগীত সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ ও তথ্যকে এই সময়কালের মধ্যে স্থাপন করা যায় না। উত্তর ভারতায় সমাজ জীবন প্রবল পরিবর্তনের মুখে। পূর্বেই আমরা দেখেছি গান্ধর্ব যুগে নাটকের প্রয়োজনে সংগীত প্রাধান্য লাভ করে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সংগীততাত্ত্বিকেরা বিচ্ছিন্ন ভাবেও সংগীত গ্রন্থ রচনা করছেন যাতে সংগীত তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করছে। হর্ষবর্ধনের সময়ে হিউ-এন-সাঙ দেখেছেন শিব-বুদ্ধ-বিষ্ণু দেবতাদের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে, সেই সঙ্গে সংগীতের ব্যবহারও হয়েছে পথে পথে। অর্থাৎ দেবতাদের

পূজা সংগীত সহযোগে বেশ প্রচলিত। গ্রামীণ সমাজে সকল ধর্মাবলম্বীরাই বিরাজ করছেন, মহাযান ধর্মমতের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়েছে। তারই ফলে কিছুকাল পরে হয়ত শাক্ত মতের অনুসারী কিছু কিছু মঙ্গলগান ছড়িয়ে গিয়েছে। পূর্বাঞ্চলে কার্তিকের এবং শিবের মন্দিরে দেবদাসী প্রথাও বর্তমান ছিল। পূবের কোন কোন অঞ্চলে গম্ভীরার প্রচার হয়েছিল। অন্য দিকে পুরাণের প্রভাবে প্রবলভাবে বৈষ্ণব ভাবধারাও চতুর্দিকে বিস্তৃত। এই বিভিন্ন পর্যায়ে সংগীত সহজ ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে, পরবর্তী ধারা থেকে একথা সহজেই অনুমিত হয়।

নারদকৃত সংগীত-মকরন্দ এবং **জৈন পার্শ্বদেব** লিখিত **সংগীত সময়-সারকে** কোন নির্দিষ্ট সময়ে স্থান না দিয়ে মোটামুটি খৃষ্টাব্দ ৭০০ থেকে ১১০০'র মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। নারদের—সংগীত-মকরন্দে সংগীত শব্দটির প্রথম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর আগে বিশেষ ব্যবহৃত শব্দ ছিল গীতি। মকরন্দকার অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে লুপ্ত গান্ধার গ্রামের বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন, যা পূর্ববর্তী গান্ধর্ব যুগের শাস্ত্রীরা কেউ করেন নি। মকরন্দকার রাগের স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকত্ব বর্ণনা করেছেন। নারদের মতে কয়েকজন পূর্ববর্তী প্রধান আচার্য: মতঙ্গ, কশ্যপ, শার্দুল, নারদ, তুম্বুরু।

পার্শ্বদেব জৈন পণ্ডিত। কেহ কেহ পার্শ্বদেবকে ত্রয়োদশ শতকেও নির্ধারিত করেন। গ্রন্থে তিনি নানা প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন—সেগুলো দশম শতকের পূর্ববর্তী হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের সংগীত-রত্নাকরের সঙ্গে মেলে না। মতঙ্গের মতই পার্শ্বদেবও জনচিত্তরঞ্জনকারী দেশী রাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে দেশীর প্রকারভেদ দেখিয়েছেন। মঙ্গল গান, উৎসাহমূলক গান, হাস্য রসের গান, চর্যা বা অধ্যাত্মগান, ভক্তিমূলক রম্য গান ইত্যাদি দেশী গানের প্রকার সমসাময়িক সংগীত-প্রকৃতি ধরিয়ে দেয়।

আঞ্চলিক ভাষার গান — রাগপ্রয়োগ — প্রবন্ধ

এবারে বিচ্ছিন্নভাবে আঞ্চলিক গান বা ধর্মীয় গানের প্রবন্ধ-প্রকৃতি এবং রাগের ব্যবহার সম্বন্ধে ৯০০ থেকে ১২০০ শতকের উদাহরণ দিই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নানা ধর্মীয় ভাবের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে। বৌদ্ধ মহাযান মত জনসমাজকে প্রভাবিত করেছিল। সেই সূত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্মীয়

প্রয়োজনে সংগীত ব্যবহৃত হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত **চর্যাগীতি** সে-যুগের লৌকিক ভাষায় রচিত গানের উদাহরণ। যে ভাষায় গানগুলি রচিত হয়েছে তাকে পূর্বাঞ্চলের বর্তমান মৈথিলী, বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার আদিপুরুষ রূপে গণ্য করা হয়। গানগুলিতে তত্ত্বের প্রয়োজনে ভাষাকে দ্ব্যর্থক বা রূপকের মত প্রয়োগ করা হয়েছে বলে সন্ধ্যা ভাষারূপে টীকাকাররা উল্লেখ করেন। ভাষা ও অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচনার সময় নির্ধারণ করেছেন ৯৫০ থেকে ১২০০ শতক পর্যন্ত। প্রাকৃত ভাষার পরিসমাপ্তি হয়ে তখন অপভ্রংশের যুগ। লৌকিক ভাষা তখন অপভ্রংশ স্তরে। কাজেই সংগীত লৌকিক ভাষাকে অবলম্বন করেছে। চর্যাগীতি বজ্রগীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন রকমের। চর্যার দ্বিতীয় পদরূপ ধ্রুবপদ এবং শেষ অথবা তৃতীয় পদে ভনিতা থাকত। এই ধ্রুবপদ অর্থে গানের অংশ, ধ্রুবপদ প্রবন্ধ নয়। বজ্রগীতিগুলি গুহ্য যৌগিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে গাইবার গান;

চর্যাগীতি গাথা গানেরই প্রতিশব্দ। এই গানগুলোর মূলে ছিল বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান এবং উৎসব আচরণের উদ্দেশ্য। কাজেই চর্যাগীতিগুলি উৎসবে ও অবসর বিনোদনে গাওয়া হত। চর্যা কথাটির সাধারণ অর্থ —আচরণ। নিষ্ঠাব্রতী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণের জন্যে রচিত এই গান রাগে ও তালে বিশেষ ভঙ্গিতে গাওয়ার রীতি ছিল। তা ছাড়া, আধ্যাত্মিক সাধনচর্যার জন্যে রচিত হয়েছিল বজ্রগীতি, যেগুলো ছিল গুহ্য যোগ-তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদিতে গাইবার তত্ত্বমূলক গান। গানের মাথায় প্রায় ১৬টি রাগের নাম পাওয়া যায়। কয়েকটি রাগের নাম বিকৃত: পঠমঞ্জরী, গবড়া, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, বঙ্গালা, রামক্রী, বরাড়ী, শীবরী (সাবেরী), মল্লারী, কহ্নুগুঞ্জরী, বলাড্ডি এবং মালশী। শার্ঙ্গদেবের মতানুসারে সতাল, ধাতুবদ্ধ, রাগযুক্ত এই গান পদ্ধড়ী ছন্দে গাওয়া হত। বেঙ্কটমখী তারাবলী প্রবন্ধ রাহড়ী ছন্দের গীত রূপে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের মতেই বিষম-ধ্রুবা রীতির গান। লৌকিক ক্ষেত্রে চলিত ভাষায় চর্যাগীতি উৎকৃষ্টতম নিবদ্ধ-প্রবন্ধ শ্রেণীর রচনা।

চর্যাগীতিতে ও বজ্রগীতিতে যেমন মহাযান ধর্মমতের অন্তর্গত বজ্রযান ও সহজিয়া মতের ভাবপ্রচার হয়েছিল, এই লৌকিক ভাষার নিবদ্ধ-প্রবন্ধ গানে তেমনি কিছুকালের মধ্যেই বৈষ্ণব ভাবেরও অভূতপূর্ব স্ফুরণ হয়েছিল

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে। লক্ষ্মণসেনের সভায় অনেক কবি, নটী, শাস্ত্রকার প্রভৃতির সঙ্গে জয়দেব প্রধান সভাকবি ছিলেন। এঁদের মধ্যে হলায়ুধ, ধোয়ী, উমাপতি ধর, সেখ জালালুদ্দিন, বুঢ়ন মিশ্র, বিদ্যুৎপ্রভা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জয়দেবের কথা নানাভাবে অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিংবদন্তীও অনেক। 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থটিতে জয়দেব ও তৎকালীন নৃত্যের উল্লেখ অতিরঞ্জিত হলেও মূল্যবান বলতে হবে। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণে পরাজিত হন লক্ষ্মণসেন। কাজেই সভাসদদের ইতিহাস এখানেই বিচ্ছিন্ন।

গীতগোবিন্দ কাব্যের স্থান সাহিত্যে অতুলনীয়। সুর, ছন্দ, বিষয়, ভাব এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য, লালিত্য ও সুষমা এই কাব্যকে এক মহিমময় সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর অন্তর্নিহিত সুর বিশেষ করে কাব্যকে সংগীতের দিকে প্রবলভাবে টেনে নিয়ে গেছে। আমাদের বিচার সেদিক থেকে। কাব্যটির দ্বাদশ সর্গে ৮০টি শ্লোক, ২৪টি গীতের সমন্বয়। ৭২টি শ্লোক বৃত্ত ছন্দে, ১টি জাতি ছন্দে, অবশিষ্ট ২টি শ্লোক অপভ্রংশের ছন্দে। গানগুলি প্রায়ই আটটি পদে রচিত বলে অষ্টপদী বলা হয়। অষ্টপদী গানগুলি কোন কোন স্থলে কর্ণাটক সংগীতে বিশেষ শ্রেণীর সংগীতরূপে ব্যবহৃত। সংগীতকে মোটামুটি সূড় প্রবন্ধ শ্রেণীর ধাতু-অঙ্গ-তাল যুক্ত নিবদ্ধ-করণ-প্রবন্ধ গান বলা হয়ে থাকে। ভাষ্যকার রাণা কুম্ভা এই প্রবন্ধ গানের নাম করেছেন কীর্তিধবল প্রবন্ধ। গানের সূত্রে বারোটি রাগের উল্লেখ আছে: মালব, মালবগৌড়, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি বা রামক্রী, কর্ণাট অথবা কেদার, দেশাখ বা দেশাগ, দেশবরাড়ী, গোণ্ডকিরি বা গোণ্ডক্রী, ভৈরবী, বরাড়ী বা বরাটী, বিভাষ। তাল পাঁচটি: যতি, একতালী, রূপক, নিঃসারী, অষ্টতালী। বর্তমান রাগের নামের সঙ্গে সেকালের নামের সাদৃশ্য থাকলেও সেকালের রাগরূপ কোথাও বর্তমান আছে কিনা বলা যায় না। তালের সামঞ্জস্য থাকা সম্ভব। এধরণের তাল যেমন বাংলা পদাবলী কীর্তনে চলিত আছে তেমনি উড়িষ্যায় ও কর্ণাটক সংগীতেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। পুরী মন্দিরে গীতগোবিন্দ গানের বিধান মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত।

শৃঙ্গার রসেই এই কাব্যের অভিনবত্ব। শৃঙ্গার রসের প্রভাব যে ভাবেই হোক এখানে শৃঙ্গার শান্ত রসেরই প্রকাশ বলে স্বীকৃত। কারণ নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার স্থায়ীভাবসম্পন্ন, শুচি এবং উজ্জ্বল বেশাত্মক রস। শৃঙ্গারের এই

ভাবপ্রবাহের ওপরই নির্ভর করেছে পদাবলী কীর্তনের শ্রীরাধার প্রকাশ। রাধার নাম এই কাব্যে নেই। নায়িকা পরমা প্রকৃতি এই শ্রীরাধা গীত-গোবিন্দের পরবর্তী স্ফুরণ বলে স্বীকৃত। গীতগোবিন্দের অন্তহীন প্রভাব সারা দেশময় ছড়িয়েছিল। মধ্যযুগেই পূজারী গোস্বামী (চৈতন্যদেবের পরবর্তী), রাণা কুম্ভা (১৩৩৩-৬৮), চেনাকুড়ি লক্ষ্মীধর, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, প্রভৃতি শাস্ত্রীগণ এবং পরে ৪০ জনের অধিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও সংগীত রচনা নিয়ে কাজ করে গেছেন। বাংলা পদাবলী কীর্তনের ভিত্তি রচনা করেছে গীতগোবিন্দের রসতত্ত্ব তথা মূল ভাব ও পদমাধুর্য—পদাবলী কীর্তনের ৬৪ রস, শ্রীরাধাতত্ত্ব এবং অনেক বিখ্যাত মহাজন-পদাবলী। মোটামুটি বলা যায়, বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে, রাজস্থানে এবং এমন কি কোন কোন হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী ঘরাণায় গীতগোবিন্দের গান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

৯০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় যেমন রাগপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এই সময়ের আরো একটি বিশেষ লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রের টীকা রচনা। স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে একদিকে যেমন অভিজাত দেশী সংগীতের প্রবাহ চলেছিল এবং তার প্রয়োগ বিশেষ করে লোকপ্রচলিত গানেই হচ্ছিল, অন্যদিকে ভরতকে অনুসরণ করে বিচিত্র মার্গসংগীতের ধারাও অব্যাহত ছিল, অথবা এমনও হতে পারে যে জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ভাষারাগ ইত্যাদি এবং অন্যদিকে দেশীরাগের প্রচারের ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল তাকে লক্ষ্য করে কিছু কিছু রক্ষণশীল চিন্তাও প্রসারিত হয়েছিল। হয়ত সেই সূত্রেই অভিনবগুপ্তের ভরতভাষ্য 'অভিনব ভারতী' ১০০০ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। কিছুকাল পরেই (১২শ শতকে) নান্যভূপাল ভরতভাষ্য "সরস্বতী হৃদয়ালঙ্কার" রচনা করেন। অত্যল্পকাল পরেই শার্ঙ্গদেবের উক্তিতে দেশী সংগীতের সম্বন্ধে এই যুক্তিটি আরো স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, গন্ধর্বরা রীতিসংগত ভাবে বংশপরম্পরা গান্ধর্বসংগীত প্রচার করে এসেছে কিন্তু "যত্তু, বাগগেয়কারেণ রচিতং লক্ষণান্বিতম্ দেশী রাগাদিষু প্রোক্তং তদ্‌গানং জনরঞ্জনম্"।—বাগ্‌গেয়কারগণ যখন জনরঞ্জনের জন্যে গ্রহ-অংশ-ন্যাস ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত রাগ রচনা ও প্রচার করেন তখন তাকেই দেশী সংগীত বলা যায়। এই সমসাময়িক কালে রাগ সংগীত মানেই এই জনরঞ্জনকারী দেশী পর্যায়ের সংগীত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাগ সংগীত : মুসলিম সংস্কৃতি ॥ সালগ সূড় প্রবন্ধ ॥ দেশী রাগ ॥ ধ্রুবপদের প্রথম স্তর ॥ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক

১২০০ থেকে ১৩০০ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক একটি বিশিষ্ট সাংগীতিক যুগ। গান্ধর্ব ও প্রাচীন ধারার সংগীতকে ব্যাখ্যা করে নতুন ধারার সংগীত পদ্ধতিকে পূর্ণ তাত্ত্বিক রূপ দান করেন **শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকর**-এ। তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন রীতিতে এই আলোচনা বর্তমান ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিভূমি জানিয়ে দেয়। হয়ত আমরা আঙ্গিক ছাড়া প্রকৃতি নিরূপণের কোন প্রত্যক্ষ উদাহরণ উপস্থিত করতে পারি না, কিন্তু তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সমসাময়িক সংগীতের মূল প্রবাহকে প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিয়ে দেয়। অনেক কিংবদন্তী ও বর্তমান সংগীতের (ধ্রপদ, খেয়াল, ঠুমরী ইত্যাদি) উৎস সম্বন্ধে অনেক লোক-কথিত ধারণা পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে এই শতকের শেষ থেকে উত্তর ভারতে নতুন সংগীতরূপের গোড়াপত্তন হয়। মুসলমান রাজত্বের পটভূমিতে ধ্রুবপ্রবন্ধ থেকে ধ্রুপদ রূপ-পরিগ্রহ করতে থাকে, আমীর খুসরৌ রাগের উদ্ভাবন করতে থাকেন, সুফী মতবাদের প্রচারের সংগে ধর্মীয় সংগীতের নতুন ধারা প্রবাহের পটভূমি তৈরী হয়। এই যুগ উত্তর ভারতে সংগীত-পদ্ধতি রূপান্তরের প্রথম স্তর ও রসিক সমাজে সংগীত প্রচারের যুগ। আগেকার সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল মোটামুটি নাট্যের প্রয়োজনে এবং ধর্মীয় ভাবপ্রচার ও অনুশীলনের প্রয়োজনে। নাটকের দর্শক ও শ্রোতাকে পূর্ণ সংগীত-রসিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না যদিও ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নয়। এ যুগ থেকে সংগীত প্রকৃত সংগীত-প্রিয় বিদগ্ধ জনসমাজের অভিমুখী। আলাউদ্দিন খিলজীর সভা মানেই সংগীত জনসমাজে প্রচারের অভিমুখে। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রসঙ্গ থাকলেও নতুন সংগীত প্রসংগ প্রাধান্য লাভ করে। সংগীতের 'ফর্ম' (form) বা রূপ নিয়ে চিন্তার উদ্রেক হয়, নতুন রূপও পাওয়া যায়। বৈজু উদাসী সন্ন্যাসী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর রচনা সংগীতের আসরে এসে পড়ে। আমীর খুসরৌ ও গোপালের প্রতিযোগিতার কিংবদন্তীও এই ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

শার্ঙ্গদেব কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ভাস্করের পৌত্র, সোঢ়লের পুত্র। ভাস্কর কাশ্মীর ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে আসেন। অনুমান করা হয় শার্ঙ্গদেব সুপ্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারী ছিলেন। রাজা সিংহনের (১২১০-১২৪৮) পৃষ্ঠপোষকতায় ১২১০-এর পরে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যাঁদের গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। সংখ্যা ত্রিশটিরও অধিক। তাছাড়া আরো অনেক বেশি পড়েছেন। সংগীত-রত্নাকর সাতটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। অধ্যায়গুলি হল: স্বর, রাগ, প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ, তাল, বাদ্য ও নৃত্য সম্বন্ধীয়। নাদ, শ্রুতি, স্বর, বাক্যাংশ (মাতু) ও সংগীতাংশ (ধাতুর) কথা বলতে বলতে শার্ঙ্গদেব সংগীত-রচয়িতা বা 'বাগ্গেয়কার' সম্বন্ধে বলেছেন। সংগীত-রচয়িতাদের পারদর্শিতা, স্বাভাবিক কণ্ঠগুণ (সুশারীর), প্রতিভা, রসবোধ, কাব্যবোধ, আঙ্গিকবোধ ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে তাদের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। এরপর উচ্চারিত স্বরের গুণাগুণ বর্ণনা, কণ্ঠের ১৫টি গুণ বর্ণনার পর বৃন্দগায়ন-বিশ্লেষণ। তারপর, শ্রুতি-বিস্তার, গ্রাম, মূর্ছনা, ক্রম, তান, জাতি, গীতি, রাগের নানা অঙ্গ, গমক বিশ্লেষণ, আলাপ ও আলপ্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমাপ্ত করে রাগপ্রসঙ্গ উপস্থাপিত। এ সম্পর্কে প্রথমে পাঁচটি গীতি (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী) এবং তার আশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত গ্রামরাগগুলির শ্রেণীবিভাগ করেন। এই পর্যায়ে উপরাগ এবং পরে ভাষারাগ এবং বিভাষারাগের উল্লেখ করেন। মোটামুটি যাবতীয় প্রকার-ভেদসহ সেকালের রাগের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৪টি। বিভাগগুলি এইরূপ: গ্রামরাগ—৩০, উপরাগ—৮, রাগ—২০, ভাষা ৯৬, বিভাষা—২০, অন্তরভাষা —৪, পূর্বের প্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ—৩৪, সে সময়ে প্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ—৫২। মোট সংখ্য ২৬৪। ভাষা শব্দটি এস্থলে লক্ষ্য করা দরকার। সাধারণ সাংগীতিক অর্থে ভাষাদ্বারা প্রকার বোঝায়। নানান চলিত ভাষার অবলম্বনে রাগ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করেছে ভাষা সেই অর্থ-জ্ঞাপক। এরপর দেশী রাগ সম্বন্ধে কথা আসে। টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন যে সকল রাগে স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, জাতি ইত্যাদির নিয়মাদি রক্ষা করা হয় না আর যাতে দেশীয় সংগীতের প্রভাব থাকে তাকেই দেশী রাগ বলা চলে। গ্রামরাগগুলো দেশীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ ইত্যাদি দেশীর পর্যায়ভুক্ত। বিভাষা, অন্তরভাষা রাগও দেশী পর্যায়ের বলে স্বীকৃত।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শার্ঙ্গদেবের প্রবন্ধ পরিচ্ছেদটি অমূল্য বলা যায়। মার্গ সংগীতে গীতি অর্থে ধাতুযুক্ত সন্দর্ভকেই বোঝাত। প্রবন্ধ গান্ধর্ব-গানের পরবর্তী স্তর। দেশী রাগের অবলম্বনেই প্রবন্ধের প্রসার। গীতির ভাগ-গুলোও নানা ভাবে প্রচারিত, কিন্তু প্রবন্ধ থেকে স্বতন্ত্র। গান অর্থে জন-রঞ্জনকারী গীত, প্রবন্ধকে গানের সংগে যুক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধ দুই প্রকার—অনিবদ্ধ (বন্ধহীন আলপ্তি) এবং নিবদ্ধ। নিবদ্ধ ৩ প্রকার : প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপক। প্রবন্ধের ৪টি ধাতু : উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ। প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ : স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট, তাল। প্রবন্ধের পাঁচটি জাতি : মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, ভাবনী এবং তারাবলী ; জাতির অন্য নাম : শ্রুতি, নীতি, সেনা, কবিতা, চম্পূ। সাধারণ ভাবে দুটো প্রকারভেদ : অনির্যুক্ত এবং নির্যুক্ত। অনির্যুক্ত অর্থে যে গান সবগুলো নিয়ম মেনে চলে না। প্রবন্ধের তিনটি সাধারণ বিভাগ :

(১) সূড়—৮টি প্রকার : এলা, করণ. ঢেঙ্কী, বর্তনী, ঝোম্বড়া, লম্ভ, রাসক, একতালী।

(২) আলি—২৪টি প্রকার বর্ণ, বর্ণেশ্বর, গদ্য · আর্যা, গাথা রাগ-কদম্ব, পঞ্চতালেশ্বর, তালার্ণব · ।

(৩) বিপ্রকীর্ণ—৩৬টি প্রকার : শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস,····ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ···চচ্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, রাহড়ী ।

এই প্রবন্ধগুলোর বিস্তৃত গায়ন-পদ্ধতি বর্ণনার পর শার্ঙ্গদেব এলা প্রবন্ধের বিশেষ বর্ণনা করেছেন। এলা প্রবন্ধের চারটি ভাগ : গণৈলা, মাত্রৈলা, বর্ণৈলা, দেশৈলা। অসংখ্য এর প্রকারভেদ। এর মধ্যে গণ-এলার অন্তর্গত নাদাবর্তীর উল্লেখ আজও চলে। কোন কোন বর্তমান সংগীত-রীতির রূপ নাদাবর্তীতে নিহিত ছিল। এ ছাড়া আর কোন এলা প্রবন্ধের চিহ্নমাত্রও কোথাও আজকাল পাওয়া যায় না। হয়ত পরিবর্তিত রূপে কোন কোন প্রবন্ধের অস্তিত্ব আছে। সূড় প্রবন্ধের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সালগ-সূড় বা ছায়ালগ নামে যে প্রবন্ধ শ্রেণীর কথা শার্ঙ্গদেব বলেছেন সেই শ্রেণী থেকেই বর্তমান সংগীতের মূল উদ্ঘাটিত হয়েছে। ছায়ালগ মিশ্র শ্রেণীর হলেও তাতে শুদ্ধ সংগীতের ছায়াপাত হয়েছে। শুদ্ধ গীতের অন্তর্গত হল জাতি, কপাল, কম্বল, গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা ইত্যাদি। ছায়ালগের গানগুলোর রীতিনীতি শাস্ত্রীয় প্রণালীভুক্ত নয় কিন্তু এগুলো শুদ্ধ-প্রণালীর

সদৃশ বলেই স্বীকৃত। বিভাগগুলি : ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাস এবং একতালী। একথা স্বীকৃত যে বর্তমান ধ্রুবপদ>ধ্রুপদ এই ধ্রুবগীতি থেকে এসেছে। প্রবন্ধের ৪টি ধাতুতে ধ্রুব শব্দের উল্লেখ আছে গানের তুক অর্থে। বর্তমান 'ধ্রুব' স্বতন্ত্র বিষয়।

সর্বশেষে শার্ঙ্গদেবের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একথাই বলা দরকার যে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক গ্রন্থটিতে প্রত্যক্ষ সংগীত অভিজ্ঞতার এবং শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে অমূল্য সাহিত্যিক সত্তা বিকশিত হয়েছে। গ্রন্থটি শুধু সংগীতের গতিপ্রকৃতি ও কলারূপই ধরিয়ে দেয়নি। উত্তরকালের জন্যে ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করে রেখে গেছে। অন্য দিকে সম্ভবত শার্ঙ্গদেব সংগীত-স্রষ্টাও ছিলেন।

পারসিক প্রভাব : আমীর খুসরৌ

এ পর্যন্ত গান্ধর্ব যুগ থেকে আরম্ভ করে সংগীতের স্তরগুলো লক্ষ্য করে বোঝা যায় যে জাতিগান ও গীতি অপ্রচলিত হয়ে যাবার সংগে সংগে আসে গ্রামরাগ, ভাষা, বিভাষা, উপরাগ, রাগ, অন্তরভাষা, উপাঙ্গ, ভাষাঙ্গ এবং ক্রিয়াঙ্গ অবলম্বনকারী প্রবন্ধ গানের যুগ। ত্রয়োদশ শতকের সংগীতের লক্ষণ দেখে মনে হয় এ সময়ের বর্ণিত সংগীত-রূপগুলো লুপ্ত এবং রূপান্তরিত হবার পথে। কারণ অত্যল্প কাল পরে যে সব সংগীতরূপের উদ্ভব সেগুলোই বর্তমানে নানা ভাবে প্রচলিত। অর্থাৎ, এমন কি দেশী সংগীতের প্রাথমিক স্তরের সংগে আজকের গান তুলনা করে বোঝা অসম্ভব অথবা বিচক্ষণ গবেষণার কাজ। আজকের উত্তরভারতীয় হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের উৎস নানা প্রবন্ধ, দেশী সংগীত, সূড় জাতীয় গানের রূপান্তর এবং লোকপ্রচলিত ও উদ্ভাবিত সংগীতের মিশ্র-সংস্কৃতি। আমীর খুসরৌর উল্লেখে এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুর্কী খোরাসানী বংশীয় আমীর সইফুদ্দিন, আমীর খুসরৌর পিতা, ইলতুতমিসের সভায় ছিলেন। আমীর খুসরৌ (আমীর আবুল হাসান খুসরৌ দিহলবী) ১২৫০ থেকে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবনকালের মধ্যে ৯৯টি গ্রন্থ রচনা করেন, যদিও এর মধ্যে ২২টি পাওয়া যায়। গাথা, চতুর্দশপদী, ঐতিহাসিক কাব্য এবং কিছু গদ্য রচনা এর মধ্যে প্রধান। ইনি অনেকগুলো

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অল্প বয়সেই সংগীত ও সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ হয়। খড়ী হিন্দীতে কবিতা রচনা করেন। মিশ্র ব্রজ-ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষা রূপে প্রয়োগ করেন। সংগীতের দিক থেকে দ্বাদশ সুর-সপ্তক বা মোকাম পদ্ধতি চালু করে নতুন রাগ ও তানের উদ্ভাবন করেন। ইমন্, জীলফ, সাহানা, সরপরদা, ফিরোদস্ত, সাজগিরি প্রভৃতি রাগ ও সওয়ারী, ফেরোদস্ত, পোস্ত প্রভৃতি তালগুলোর প্রচলন আমীর খুসরৌর সাক্ষ্য দেয়। তারানা, ত্রিবট প্রভৃতির প্রচলনও তাঁর নামের সংগে যুক্ত। কবাল রীতির গানের প্রচলনের সংগে খেয়ালের উদ্ভব সম্পর্কে নানা মতামত প্রচলিত আছে। আসলে কবাল রীতি খুসরৌর শিষ্যবংশে প্রচলিত হয়ে দিল্লীর চারদিকে ছড়িয়েছিল। বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ধ্রুপদ কিংবা খেয়ালের কোন রীতিই সরাসরি মুসলমান যুগের সৃষ্টি নয়। প্রাচীন প্রবন্ধের রূপকালপ্তি জাতীয় গানের মধ্যে খেয়ালের রূপ নিহিত ছিল। আমীর খুসরৌ সম্ভবত রূপকালপ্তি প্রবন্ধের আলংকারিক বর্ণোজ্জ্বল রূপকে খেয়াল নামক স্বতন্ত্র আরবী শব্দেই অভিহিত করেন। কবাল বস্তুত ধর্মীয় সংগীত। সে অর্থে গজল ধর্মীয় নয়। আমীর খুসরৌর মধ্য দিয়ে প্রবল স্ফী মত কবাল, গজল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কবাল রীতি উদ্ভাবনের সংগে, খুসরৌর 'মোকাম'-প্রয়োগ, রাগ-উদ্ভাবন, তাল প্রয়োগ ইত্যাদি সব বিষয় একসংগে জট পাকিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া খেয়াল-রীতির প্রচলন, তবলার উদ্ভাবন, সেতারের সৃষ্টি, *ইত্যাদি ঘটনাগুলি কিংবদন্তীর মত প্রচলিত। ধ্রুপদ যে ধ্রুব প্রবন্ধ থেকে এসেছে—

১ The invention of sitar, again, has been so persistently ascribed to Khusrau that it is now generally accepted to be a fact beyond doubt. . But unfortunately I have been unable to trace the name "Sitar" anywhere in Khusrau's writings, although there are pages full of descriptions of various instruments used in his time. Nor does any contemporary or even later writers mention the name.—Dr Mohammad Wahid Mirja : *The Life and Works of Amir Khusrau.* Published : I-Darah-i Adabiyat-i-Delli, Delhi-6

Tabla could not have been purely an invention of Amir Khusrao. Hazrat Amir Khusrao by Abdul Halim Jaffar Khan : *Journal of India Musicological Society.* Vol 4. No 2, Baroda.

একথাই কিছুকাল পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। খেয়াল সৃষ্টির সংগে শুধু যে আমীর খুসরৌর নামই যোগ করা হয় তা নয়, সুলতান হুসেন শর্কী খাঁর নাম এবং চুটকলা গানের রীতির খেয়ালে রূপান্তর ইত্যাদি নানা কথনও প্রচলিত আছে। কয়েক শত বৎসরের মুসলমান সংস্কৃতির চাপে বহু ইতিহাস এভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ গানের অসংখ্য সাংগীতিক রূপে কিছু কিছু নতুন নামে প্রবর্তিত হয়েছে। খুসরৌর প্রযুক্ত পার্শী যন্ত্র ববাব ও তনবুব প্রচলিত নাম। সিতাব সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই। কিন্তু সিতারকে যেমন জিথাব থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, অন্য দিকে প্রাচীন চিত্রা বীণার সংগেও সংযোগ করা হয়। আমীর খুসরৌ সিতাব তৈরি করেছিলেন একথাও কিংবদন্তী। অন্য দিকে খেয়াল সম্বন্ধে একথাও অনুমান করা হয় যে ফিকবাবন্দী মিশ্রিত কৌল গানের সংগে চুটকলা গানের যোগ হয়েছিল আমীর খুসরৌর শিষ্যবংশগুলোতে পরবর্তী কালে। আমীর খুসরৌ সংগীত প্রতিযোগিতায় নায়ক গোপালকে হারিয়েছিলেন—একরূপ কিংবদন্তীও প্রবল। কয়েক যুগ পরে একথা উল্লেখ করেছেন ফকিরুল্লাহ্। ইতিহাসের দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে আমীর খুসরৌর সংগীত সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্যায়নের জন্যে এসব অতিশয়োক্তি ও কিংবদন্তীর দরকার হয় না। আলাউদ্দিনের সভায় যুক্ত থেকে আমীর খুসরৌ ভারতীয় সংগীতের রাগ-পদ্ধতিতে যে সংযোজন করেন তারই ফলে রাগ-সংগীত উত্তর ভারতে নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়। এখানেই খুসরৌর অতুলনীয় ঐতিহাসিক অবদান। এর সংগে যুক্ত তরানা, কবাল প্রভৃতি গানের সৃষ্টি। এর চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। এ কথা সত্য যে আমীর খুসরৌর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জ্ঞান ও কলা শিল্পের মিলন হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক, কবি, দার্শনিক সাংগীতিক, ৯৯টি গ্রন্থ রচয়িতা নিজে কতটা সংগীত সাধনা করতেন? প্রত্যক্ষ সংগীতে তাঁর দুই বন্ধু "সমুৎ" ও "ততার" সহকারী ছিল। মনে হয় খুসরৌ সেরা বাগ্গেয়কারই ছিলেন। পরে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হবে যে গোপাল নায়কের সঙ্গে আসলে "বাগ্গেয়কার বৃত্তি'র প্রতিযোগিতা হয়েছিল। খুসরৌ সুফী নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সংস্পর্শে এসে সুফী মতাবলম্বী হয়েছিলেন এবং গুরুর তিরোধানের পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মোটামুটি পারসিক সংগীত ও ভারতীয় সংগীতের সমন্বয় খুসরৌর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

গোপাল : বৈজু

ত্রয়োদশ শতকের সংগীত ঐতিহ্যের সংগে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। এই পরিবর্তনের সময়ে যখন এক সংস্কৃতি আর এক সংস্কৃতিব দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, যখন খুসরৌর মতো যুগান্তকারী প্রতিভা ক্রিয়াশীল এবং রাজপুরুষের দ্বারা সমর্থিত, তখনকার কাহিনীগুলি যুগ যুগ ধরে অতিরঞ্জিত হয়েছে। আমীর খুসরৌব সংগে গোপালের প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে গোপাল নায়কের সংগে বৈজু বাবরার সম্পর্ক প্রচুর জট পাকিয়েছে। এই সম্পর্কে শুধু কয়েকটি মূলগত তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

গোপাল নায়ক বিজয়নগর থেকে অথবা দাক্ষিণাত্যের মাদুরা থেকে বন্দী হয়ে আলাউদ্দিনেব সভায় এসেছিলেন। তিনি খুসরৌব মতো অভিজাত মুসলমানেব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস্য কি? আমীর খুসরৌর প্রতিযোগিতায় 'কল্যাণ' রাগেব কিংবদন্তী শোনা যায়। 'কল্যাণ' কি তেমন ভাবে প্রচলিত হয়েছিল? গোপালেব সংগীত-পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র রকমের, তিনি কঠিনতম প্রবন্ধ গানের অনন্যসাধারণ শিল্পী ও জ্ঞানী। সত্যই কি তাঁকে তারানা গান করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল? না কি একই সভায় তারানা রচনার জন্যে অভিনবত্ব জ্ঞাপক রাজকীয় সমর্থন দেওয়া হয়েছিল? গোপাল ও আমীর খুসবৌর দিহ্লবীর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে চারশত বছর পরে ফকিরুল্লাহ্ গল্পটি জমিয়ে সংগীত-দর্পণে বলেছেন—গোপাল বার শত শিষ্য নিয়ে তীর্থ করতে এসেছেন। তিনি আসছেন জেনে আলাউদ্দিন খুসরৌকে প্রতিযোগিতায় তৈরি করলেন। ৭ দিন অসুস্থতার যুক্তিতে খুসরৌকে একটি চৌপায়াব তলায় লুকিয়ে থাকতে দেওয়া হল। লুকিয়ে খুসরৌ গান শুনলেন। প্রকাশ্যে যখন এরপর প্রতিযোগিতা হল তখন গোপালকে আগে গান কবতে হল। তিনি গাইলেন 'হবগীত', 'মন' ও 'স্ববর্তনী'। মীর বললেন, "এই সব গান আমি আগেই বেঁধেছি"। গোপালের গানের প্রত্যুত্তবে মীর কওল-বচনা গান করেন। ধবে নিতে পারা যায় খুসরৌ সংগীতকুশলীর চেয়েও প্রধান ছিলেন স্রষ্টা, রচয়িতা এবং কবি-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রূপে। কল্লিনাথের কথায় জানা যায় গোপাল বিশিষ্ট একটি তালে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতেন। ব্যাংকটমখীর উক্তিতে

গোপাল প্রবন্ধগীতে ও দেশজ তালে সেরা স্রষ্টা শিল্পী ছিলেন। ৩২-রাগযুক্ত আলি জাতীয় প্রবন্ধ—'রাগকদম্বে' তিনি ছিলেন সুদক্ষ। রাগ-কদম্ব না গেয়ে খুসরৌর জন্যে তিনি কি অন্য গানই গেয়েছিলেন? শিল্পী হিসেবে তারানার মৌলিক রচনাকে তাঁর পক্ষে সমধিক প্রশংসা করাও স্বাভাবিক। গোপাল নায়ক যে যুগে গান করতেন সে ছিল সালগ-সূড় প্রবন্ধের যুগ, মিশ্র পদ্ধতিতে তিনি যশস্বী ছিলেন। নায়ক সম্ভবত বংশজ নাম। স্পষ্টই বোঝা যায় যে হারজিতের কাহিনী পরবর্তী যুগে তৈরি হয়েছে। কারণ খুসরৌ গোপালের গানে প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন উক্তিও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বহু গায়ক নিয়ে এ রকম হারজিতের কাহিনী প্রচলিত।

গোপাল নায়কের সংগে গোপাললালের একটা সংমিশ্রণ হয়েছে। দুজনার মধ্যে একজন তেলেঙ্গানার 'ধরু' গান প্রচারিত করেন। 'গোপাললাল' একটি স্বতন্ত্র নাম, বিশেষ করে বৈজু নামের সংগে যুক্ত। বৈজু সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী আছে এবং বৈজুর ভণিতায় গানগুলো থেকে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মোটামুটি: (১) বৈজু আলাউদ্দিনের সময়কার লোক। (২) বৈজু ধ্রুপদ সৃষ্টি করেছিলেন, রচনা থেকে মনে হয় গোপাল প্রধানত শিষ্য, অথবা প্রতিযোগীও হতে পারেন। (৩) বৈজু বাবরা মান রাজার সময়ের লোক। (৪) গানের ভণিতায় বৈজু, বৈজুনাথ, নায়ক বৈজু, বৈজু বাবরা ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় বৈজু আর বৈজু বাবরা এক ব্যক্তি এবং বৈজুনাথ এবং বৈজু আর এক ব্যক্তি। ৫) কিন্তু চারজনই কি এক ব্যক্তি? অথবা ভিন্ন? (৬) গানের রচনার মধ্যে স্তর-ভেদও আছে। বৈজু বাবরার গান থেকে বৈজুর গান উন্নত মানের মনে হয়। বৈজুর গান শুদ্ধ ভাষায় রচিত। (৭) বৈজু ও বৈজু বাবরা এই দুই শ্রেণীর গানের মধ্যে বাবরা সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈজু উত্তর ভারতের গুণী—গোপাললালের সমসাময়িক। (৮ চার তুকওয়ালা ধ্রুব-রাসক-একতালী গান করতেন বৈজু, এসব গান ধ্রুবপদ রূপ পরিগ্রহ করত। এই সময়েই চৌতাল, ধামারের প্রাথমিক রূপ চালু হওয়া সম্ভব কি? (৯) ব্যবহৃত রাগ সম্বন্ধে এখন নির্দিষ্ট করে কিছু বলা চলে না, কারণ সবই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ যুগে এসে পৌঁচেছে। (১০) বৈজুর গানে দেবস্তুতি, নাগবর্ণনা, নায়িকাভেদ বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

এই সংগে গোপাললাল সংশ্লিষ্ট তা 'কহে বাবরা সুনিয়ে গোপাললাল' পদ থেকেই বোঝা যায়। গোপাল সংগ্রাহক শাস্ত্রী ছিলেন। হয়ত তেলেঙ্গানার

'ধরু' গান, পাঞ্জাবের 'ছন্দ', পূর্বদেশের 'ঝুমুর' (বা ঝোম্বড়া প্রবন্ধ) ইত্যাদি রীতি সংগ্রহও প্রচার করতেন। গোপাললাল শিষ্য না সমসাময়িক ? বৈজু-গোপালের প্রতিযোগিতায় সত্য কতটা আছে ? বৈজুর গানে পাথর গলে যেত, হরিণ মালা পরত ইত্যাদি কথা চমকপ্রদ। মোটামুটি বহু পাঠ বহু রচনার বিকৃতি ও অনুপ্রবেশ থেকে ধারণা করা যায় এই যে সূড় প্রবন্ধ প্রচারক গোপাললাল বৈজুর সমসাময়িক এবং তিনি রাজা মানের প্রভাবকেও ম্লান করে দিয়েছিলেন। একটি মতে তিনি সুলতান হুসেন শর্কীর সমসাময়িক। একদিকে গোপালের পাণ্ডিত্য এবং নানা রাগ রচনা সম্বন্ধে যেমন প্রসিদ্ধি আছে, অন্য দিকে প্রচলিত ধ্রুপদগুলি প্রমাণ করে সরল ধ্রুব-প্রবন্ধকে ভেঙেচুরে বৈজুই চার তুকে গানকে নির্দিষ্ট করেন এবং বর্তমানের বহু প্রচলিত তালের গোড়া পত্তন করেন। গানের অলংকারাদি কিরূপ ছিল বলা চলে না, কিন্তু বর্তমান ধ্রুপদীয়ানার গোড়াপত্তনও এইখানে। অনেকের মতে হনুমন্ত মতের রাগ-রাগিণী ভেদের সৃষ্টিও বৈজুর গানের সঙ্গে হয়েছে। শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণে দেখা যায় রাগ-রাগিণী পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের আগে হয় নি। আসলে শিবমত শব্দটি একটি জট পাকানো ধারণা মাত্র। সমর্থন কোন প্রকার নেই। হনুমন্ত মতের উল্লেখ পরবর্তীকালে (১৫শ, ১৬শ) পাওয়া যায়। নারদের সংগীত-মকরন্দতে রাগের পুরুষ-নারী ভেদ পাওয়া গেলেও তথাকথিত রাগ ও রাগস্ত্রী বা রাগিণী-ভাবনা নয়। রাগ-রাগিণী পরবর্তী আরোপ একথা স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায়।

ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তিনশত বৎসর ভারতীয় সংগীত-ক্ষেত্রে উপরিস্তরে কয়েকটি প্রবাহ এবং অন্য দিকে অন্তঃশীলা ফল্গুপ্রবাহ সংগীত-তত্ত্বকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছিল। প্রবল মুসলমান প্রভাব এবং অন্যদিকে আচার্যদের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ দুয়ের সম্মিলিত ফসল ফলিয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাছাড়া নতুন ধর্মীয় ভাবধারা নানা ভাবে বিকশিত হচ্ছিল। সংগীতে এগুলো নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করা যায়ঃ (১) রাগসংগীতে আমীর খুসরৌর দান, (২) সংগীত-রত্নাকরের পূর্ণাংগ গ্রন্থের মাধ্যমে দেশী সংগীতের নানা প্রবন্ধ ও সালগ-সূড়ের প্রচার (অবশ্য অনতি-পূর্বেই নাট্যশাস্ত্রের ভাষাও লিখিত ও প্রচারিত হয়েছিল), ১৪শ শতকের শেষে সিংহভূপাল সংগীত-রত্নাকরের ভাষ্য রচনা করেন। সিংহভূপাল সংগীত ব্যাখ্যায় নানারূপ উদ্ধৃতির ব্যবহার করে পার্শ্বদেবের সংগীত-সময়সার

গ্রন্থের নানা বিষয় (দেশী রাগ এবং সালগ সূড়ের নানা অজ্ঞাত দিক) সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। এই সূত্রে পার্শ্বদেবকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি সময়ের এবং শার্ঙ্গদেবের সমসাময়িক বলেও মনে হতে পারে। (৩) অন্যদিকে জনসমাজে চলেছিল ধর্মীয় সংগীতের নানা প্রবাহ। (৪) সংগীত নিয়ে যেমন ব্যাখ্যা ও তত্ত্বশাস্ত্র রচিত হচ্ছিল তেমনি প্রাচীন ধর্মসংস্কৃতি সম্বন্ধীয় কাজও হচ্ছিল। আচার্য সায়ণ বিজয়নগরের মন্ত্রী ছিলেন, ১৩৮৭তে তাঁর প্রয়াণ হয়। চারি বেদ ও উপনিষৎ প্রভৃতির অমূল্য ভাষ্য তিনি লিখেছিলেন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে বৈদিক সংগীত এবং গান্ধর্ব-সংগীতের প্রথম তুলনামূলক তত্ত্ব-গ্রন্থ নারদী শিক্ষা। দেখা যায় সংগীত তত্ত্ব আলোচনায় প্রত্যেকেই সামগানের সংগে তাঁদের বর্ণিত সংগীতের যোগসূত্র রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। অন্য দিকে উত্তর ভারতে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের সংগে দক্ষিণ ভারতে সংগীত অনেকটা স্বতন্ত্র ভাবেই বিকশিত হতে আরম্ভ করে। শার্ঙ্গদেবের রচনায় দক্ষিণের রূপ বিশেষ বিধৃত, একথাও বলা হয়ে থাকে। ১৩০৯—১৩১২তে রচিত হরিপালদেবের সংগীত-সুধাকর গ্রন্থে সম্ভবত সর্বপ্রথম কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী সংগীতের কথা লিখিত হয়। গ্রন্থটি এখনো ছাপা হয় নি। জানা যায় কর্ণাটক সংগীতের প্রধান ক্ষেত্র ছিল তাঞ্জোর, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর। ১৩৪০ (?) এ **মাধব বিদ্যারণ্য** বিজয়নগরে ছিলেন। তাঁর সংগীতসার গ্রন্থে দ্বাদশ স্বরের ব্যবহার, সপ্তস্বরের মূর্ছনা অবলম্বন এবং রাগগুলোকে নিয়ে মেল পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বোধ হয় প্রথম ১৫টি মেলের আভাস এবং জন্য রাগের উল্লেখ। বিদ্যারণ্যের সংগীতসার সেদিক থেকে একটি বিশেষ গ্রন্থ।

বিদ্যারণ্য ১৩৪৩এ বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মন্ত্রী ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল নানান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও সংগীত তত্ত্বের কাজ করেন। বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশটি মেল মূর্ছনাবলম্বী নয়, বরং কারও মতে সমসাময়িক মুসলমান সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন প্রভাবযুক্ত। মেলগুলির নাম: নট্টা, গুজরী, বরাটী, শ্রী, ভৈরবী, শঙ্করাভরণ, আহীরী, বসন্ত-ভৈরবী, সামন্ত, কাম্বোজী, মুখারী, শুদ্ধরামক্রী, কেদারগৌড়, হিজুজ্জী, দেশাক্ষী। রঘুনাথ ভূপের সংগীত-সুধা গ্রন্থ থেকেই এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিজুজ্জী নামটি পারসিকদের দান, একথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতকের সংগীতধারা

পঞ্চদশ শতকের সংগীতধারার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ এইরূপ :

(১) কল্লিনাথের রত্নাকর ভাষ্যই এ সময়ের বিশেষ তাত্ত্বিক রচনা, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে সংগীত-সংস্কৃতির ১০ম—১২শ শতকের প্রভাবই বর্তমান। এরপর থেকে উত্তর ভারতে স্বতন্ত্র ভাবধারার (হনুমন্ত মতের) বিকাশ।

(২) সুলতান হুসেন শর্কী ও খেয়ালের আদি স্তর।

(৩) রাজা মানসিং তোমরের সময় থেকে ধ্রুপদ।

(৪) ধর্মীয় সংগীতের বিভিন্ন শ্রেণীতে একদিকে কবীর, নানক, শঙ্করদেব, শ্রীচৈতন্য এবং অন্যদিকে কর্ণাটক সংগীতে পুরন্দর দাস। কিন্তু ধর্মীয় ধারা পর্যায়ক্রমে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত, কারণ ষোড়শ শতকে ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী কীর্তনের রীতি নির্ধারণ, সন্ত সংগীতে মীরা, সন্ত সুরদাস, তুলসীদাস, উড়িষ্যায় ছান্দ ও জনান গান এ সকলই বিবেচ্য।

এ যুগের সংগীত-চিন্তা

এই সময়ের সংগীত-ধারা বর্ণনা সূত্রে রাগ রাগিণী বিভাগের কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ ধ্রুপদ যখন তৈরি হচ্ছে তখন উত্তর ভারতে রাগ-রাগিণী ভাবনার মূল রাগার্ণবপ্রণেতা হনুমন্ত মতের প্রাবল্য এবং উমাপতি সমর্থিত শিবমত ভাবনাও সেই সঙ্গে বেশ প্রচলিত। আমরা জানি সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে তত্ত্বের দিকে বহুপ্রকার ধারণা সংগীত-ক্ষেত্রে এসেছিল। তখনই নাট্যশাস্ত্রেরও টীকা লেখা হচ্ছে। অন্যদিকে সংগীত-মকরন্দকার সুরের পুরুষত্ব, নারীত্ব ও নপুংসকত্ব প্রতিপাদন করেছেন। মকরন্দ-কার নারদকে দ্বাদশ শতকের পূর্বের শাস্ত্রী বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই সময় থেকেই রাগ বিচারের নানামুখী তত্ত্বের উদ্ভব হতে থাকে : গান্ধর্ব সংগীতের মার্গ ও দেশী রূপ অনুসরণ করে পরবর্তী ধারায় রাগের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয়। এর মধ্যেই উত্তর ভারতে রাগ-রাগিণী চিন্তা এবং কর্ণাটক সংগীতের মেল-পদ্ধতি ও জনক-জন্য রীতির উদ্ভব হতে থাকে। উত্তর ভারতে

এই ভাবনার সংগে সংমিশ্রিত হয় নতুন রাগ, অর্থাৎ; কতকগুলো চিন্তা আরবী, পার্শী প্রভাবের সঙ্গে গড়িয়ে আসতে থাকে। এ সবই যুক্তিবদ্ধ ভাবনা নয়, এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত। এ-যুগে এসে আমরা এই মতগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করি কোন্‌টা কিভাবে সংগীতকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে চলেছে। গান্ধর্ব গানের গোড়ায় ব্রহ্মাভরত (দ্রুহিন) নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন, সেই সূত্রেই উল্লিখিত ব্রহ্মা মত। মধ্যযুগে এসে খুঁজে দেখি ব্রহ্মা মতের (১) তালিকায় কিছু রাগ, যথা, ভৈরব, শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম ও নট। (২) ব্রহ্মা-ভরতের অনুসরণ করে সদাশিব ভরত অনুরূপ নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন, সেই সূত্রে প্রাপ্ত শিবমত—যদিও শিবমতের ব্যাখ্যা নানা ভাবে বিকশিত হতে থাকে। প্রায় শার্ঙ্গদেবের সমসাময়িক "উমাপত্যম্‌" গ্রন্থের লেখক উমাপতি শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণ রাগকে শিব ও শক্তির সংযোগে উদ্ভূত বলেছেন। শুদ্ধ রাগ—শিব, ছায়ালগ—শক্তি। এই শিব-শক্তি কল্পনা তান্ত্রিক ভাবধারার অনুসারী, উমাপতিরই নিজস্ব চিন্তা নয়। এর মূল প্রাচীন তত্ত্বে উদ্ভূত হলেও উদ্ভব তান্ত্রিক যুগের পরবর্তী বলা চলে। (৩) মুনি ভরতের মত সম্বন্ধে আমরা জানি। যদিও ভরত বিনয় সহকারে নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন যে তিনি পূর্বসূরীদের মতামত সংগ্রাহক মাত্র তবুও ভরত সংগীত-তত্ত্ব শাস্ত্রের মূল খুঁটি স্বরূপ। পরবর্তীকালের এই ভরত নামাঙ্কিত রাগ সম্বন্ধে তেমন যুক্তিবদ্ধ চিন্তা নেই। ভরত মতের নামে প্রচলিত রাগ ভৈরব, মালব কৌশিক, হিন্দোল, দীপক ও মেঘ। এইসব মতগুলো দ্বাদশ শতকের পরে দানা বাঁধতে থাকে। একটি উদাহরণে তা বোঝা যাবে। ভৈরব এবং ভৈরবীকে পাওয়া যায় ভিন্নষড়জ নামে গ্রাম-রাগের ভাষা বা জন্য রাগ হিসেবে। পার্শ্বদেবের সংগীত-সময়সার গ্রন্থে এর প্রথম উল্লেখ। সংগীত-সময়সারের রচনাকাল সপ্তম শতাব্দী থেকে শার্ঙ্গদেবের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া ভৈরব রাগের প্রাচীনত্ব প্রমাণের উপায় নেই। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় চমৎকার বিশ্লেষণে 'রাগরাগিণীর নামরহস্য' গ্রন্থে একথা প্রমাণ করেছেন যে ভৈরব শব্দটি অভীর (ভীরপা) জাতি থেকে উদ্ভূত।

(৪) সবশেষে হনুমন্ত মত। রাগ, রাগস্ত্রী—রাগিণী এবং এঁদের পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে যেন মানবিক সংসার। এই মতের স্রষ্টা আঞ্জনেয় হনুমানকে কোন্ সময়ে দাঁড় করানো যাবে সে এক সমস্যা। সমগ্র গান্ধর্ব যুগের সংগীতশাস্ত্রীদের মধ্যে কেউ এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। শার্ঙ্গদেবের

গ্রন্থে অবশ্য আঞ্জনেয়র উল্লেখ মাত্রই আছে। এরপর অহোবলের 'সংগীত-পারিজাত', লোচন পণ্ডিতের 'রাগ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থগুলোতে সপ্তদশ শতকেই স্পষ্ট প্রকাশিত। এদিকে ষোড়শ শতকে আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল সংগীত আলোচনায় রাগ-বিবেক অধ্যায়ে ঈশ্বর মত বা শিবমত অনুসারে কতকগুলো রাগ এবং হনুমন্ত মতানুসারে কতকগুলি রাগ বর্ণনা করেন। ১৬৭৫ খৃঃ-এর পূর্বে রচিত মীর্জাখাঁর "তুহ্‌ফাতুল হিন্দ্" গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, "বর্তমানে যে মতটি প্রচলিত তা হনুমান মত। এই চারটি মত যে-সব গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে সেগুলি হচ্ছে রাগার্ণব, সংগীত-দর্পণ, মান্‌কুতূহল, সভাবিনোদ প্রভৃতি।"

অতএব ষোড়শ শতকেই রাগ-রাগিণীরা উত্তর ভারতের সংগীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে —এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতকে বিশেষ করে আকবরের সভায় সংগীতজ্ঞদের একটি বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন যে সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল, স্বভাবত এর গোড়াপত্তন পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে। নানা বিশ্লেষণে বোঝা যায় রাগরাগিণীর ধারণা নিয়ে গান সৃষ্টি, ঋতুবোধ নিয়ে গান করা, রাগে সময় আরোপ ইত্যাদি ধারণা এই সময় থেকেই স্পষ্টত আঞ্চলিক রচনায় প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সঙ্গে আরো একটি প্রসঙ্গ আসে—রাগ-রাগিণীর ধ্যানমূর্তি। স্বরের দেবতার কল্পনা পূর্বে পাওয়া যায়। কিন্তু রাগের ধ্যানমূর্তি প্রচলিত ছিল না। পঞ্চদশ শতকে রাণা কুম্ভার (১৪৩৩-১৪৭৮) সংগীত-রাজ গ্রন্থে রাগের ধ্যানমূর্তিও পাওয়া যায়।

হুসেন শর্কী ও খেয়ালের আদি স্তর

জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী খাঁ সম্বন্ধে ফকিরুল্লাহ্ তাঁর সঙ্গীত-দর্পণ গ্রন্থে বলেছেন, "জৌনপুরের প্রচলিত গীতকে 'চুটকলা' বলা হয়। এতে দুটি কলি থাকে। পদান্তে মিল থাকে না ও তালে গাওয়া হয় না। দুটি কলির দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ কবিতার মত বিন্যস্ত। প্রথম কলিতে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। এটি প্রেম ও বিরহ বিষয়ে রচিত—এইরূপ লিখিত আছে। এই গীত যুদ্ধ সম্পর্কেও রচিত হয় এবং উক্ত গীতকে 'সাধর্ চুটকলা' বলা হয়। এই গীতের স্রষ্টা হচ্ছেন সুলতান হুসেন শরকী। ইনি জৌনপুরের বাদশা ছিলেন। ইনি দিল্লীর বাদশা বাহলুল লোদীর সঙ্গে অনর্থক যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে রাজ্য ও সর্বস্ব হারান।"

এরপর বলেছেন :—'দিল্লীতে প্রচলিত গীত—কওল, তরানা, খেয়াল, নকশ্, নিসার, বসিৎ, তিলাল্লানা, সোহ্‌লা এইগুলি মীরখুসরও কর্তৃক প্রবর্তিত। তাঁর সাযুৎ ও ততার নামে দুই বন্ধু ছিলেন। ফার্সী সউং ও নক্‌শ্ এবং হিন্দী সংগীতের মিশ্রণে এই গীতগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।"

এই অংশে গোপাল নায়ক ও খুসরৌর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ বর্ণনার পর খেয়াল সম্বন্ধে ফকিরুল্লাহ্ আবার বলেছেন, "খিয়াল দুটি কলিতে প্রচলিত। আকবরের সময়ে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন আকবরাবাদ রাজধানী হল সেই সময় যাবতীয় গায়ক ও ওস্তাদ যাঁদের তুলনা কোনও যুগে দেখা যায় নি তাঁরা ওই স্থানে জমা হয়েছিলেন। বর্তমানে যেসব ভাষা ভালভাবে বলা হয় তা দশ শতেরও অধিক। এইসব ভাষায় প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধীয় গান রচিত হয়েছে। কতকগুলি খিয়াল আছে যেগুলি চারটি কলি সহযোগে গঠিত। কিন্তু প্রথম দুটি কলির পদান্তে মিল শেষের দুটি কলির মিল থেকে ভিন্ন।" আবুল ফজল খেয়াল সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি : 'যে গীত জৌনপুরে প্রচলিত তাকে চুটকলা বলে। দিল্লীতে যে গীত গাওয়া হয় তার নাম কওল ও তারাণা।' তুহ্‌ফাতুল হিন্দ্ গ্রন্থে মীর্জা খাঁ বলছেন, "খিয়াল শব্দটি আরবী কিন্তু বর্তমানে হিন্দুস্থানে এর 'খ' উচ্চারণটি আববী রীতিতে করা হয় না ; এটি সাধারণ খিয়াল-এ পরিবর্তিত হয়েছে। এই গীত দুটি তুক দ্বারা গঠিত। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী এই গীতের প্রবর্তক। এটি বেশীর ভাগ খয়রাবাদের ভাষায় রচিত। পাঞ্জাবে প্রচলিত গীতকে ডপা (টপ্পা ?) বলে। এক তুকের গীতকে চুটকলা বলে। এর প্রকারভেদ বর্তমান। পূর্বী ভাষায় দুই তুকে গঠিত হলে তাকে বলে পূর্বী। কওল ও তারানাকে বর্তমানে হিন্দুস্থানে তিলানা বলা হয়। এই এই জাতীয় গীতে আরবী ও ফার্সী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সোরবন্ধ নামক প্রকারভেদে অর্থহীন এলা, এলালা, এলালুম, তা না, তন্, দোর না, দানী, নাদানী প্রভৃতি শব্দ সহযোগে গাওয়া হয়। আমীর খুসরও এর প্রবর্তক।" এই সকল উক্তিই খেয়াল গানের উদ্ভব সম্পর্কিত তত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে নানাভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যগুলি এইরূপ দাঁড়ায় : (১) কোন একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ গান পরবর্তীকালে খেয়ালে পরিণত হয়। (২) খেয়াল নামকরণ ও উদ্ভবের সঙ্গে একদিকে আমীর খুসরৌর নাম সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে চুটকলা গান ভেঙে সুলতান হুসেন শর্কী খেয়াল তৈরী করেন

একথাও জানা যায় (৩ আকবরের সময়ে খেয়াল দিল্লীর চারদিকে প্রচলিত ছিল উল্লেখ আছে।

॥ ধ্রুপদের প্রথম স্তর ও রাজা মানসিং তোমর ॥

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতের সংগীতে রাজা মানসিং তোমরের দান অবিস্মরণীয়। বর্তমান প্রচলিত ধ্রুপদ গানের ভিত্তি তৈরি, রীতি সৃষ্টি ও নতুন সংযোজনের পেছনে রাজা মানের ইতিহাস স্পষ্টভাবে যুক্ত। এ সময় পর্যন্ত কি কি ধরণের প্রবন্ধ গান হত তার উল্লেখ নানা সূত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে নেহাত খবর ছাড়া, সাংগীতিক রূপ বোঝবার উপায় নেই। রাজা মানের সময় থেকে ধ্রুপদ ধারাবাহিক ভাবে আজকের যুগে এসে পৌঁচেছে। গোপাল ও বৈজু সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ও বিরোধী চিন্তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সে সব ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সন্ধিক্ষণের কথা, অর্থাৎ রাজা মানের দুশো বছর আগে থেকে সমসাময়িক কালের কিছু আগেকার কাহিনী। কিন্তু সংগীতে দুশো বছরে কিরূপ পরিবর্তন হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

রাজা মানসিং তোমর ১৪৮৫-১৫১৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজত্বকালের প্রায় অনেকটা সময়ই তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটাতে হয়। কিন্তু তিনি সংগীত-চিন্তা থেকে বিরত হননি। রাজা মানের **মানকুতূহল** গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ফকিরুল্লাহ্-এর **সংগীত-দর্পণ** গ্রন্থ (১৬৬৬) থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত। ফকিরুল্লাহ্ রাজা মানের কথা বিশেষ ভাবে বলে গেছেন। রাজা মানসিং তোমর নিজে সংগীতশাস্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর গুর্জর রাণী মৃগনয়নী রাজ্যে যে অভূতপূর্ব সংগীতের পরিবেশ গড়ে তোলেন তাতে বহু সংগীতশিল্পী, অনুরাগী, শিক্ষার্থী প্রতিপালিত হন, সংগীত চর্চা করেন ও শিক্ষা করেন। পরে গোয়ালিয়রের ১৫ জন গুণী আকবরের সংগীত-সভা সমৃদ্ধ করেছিলেন। তানসেনও কিছুকাল গোয়ালিয়রে থেকে সংগীত শিক্ষা করেন।

আবুল ফজল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তাঁর আইন-ই-আকবরীর সংগীত নিবন্ধে তৎকালীন নানা শ্রেণীর গানের বর্ণনা করেছেন। তখন ধ্রুপদ গাওয়া হত রাজধানী আগ্রা, গোয়ালিয়র, বারী ও তার নিকটস্থ অঞ্চলে। আগে এখানে বড় আকারের গান গাওয়া হত। রাজা মান তাঁর রাজত্বকালে নায়ক বখশু, মাহমুদ (বা মচ্ছু) ও ভানু (বা ভন্নু) প্রভৃতি

তিনজন গুণীর সহায়তায় এক বিশেষ পদ্ধতির সর্বজনস্বীকৃত ধ্রুপদ গানের প্রচলন করেন। রাজা মানের মৃত্যুর পর বখশু ও মাহমুদ গুজরাটের সুলতান মাহমুদের আশ্রয়ে এ সংগীত-রীতিতে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ধ্রুপদ রীতিটি এই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি বলে স্বীকৃত হয়। ধ্রুপদের আকৃতি সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেছেন যে, ধ্রুপদ চারটি ছন্দোবদ্ধ পংক্তিতে রচিত এবং এই পদগুলোর পরিধি সমান নাও হতে পারে। বিশেষ উল্লেখ্য, এর বিষয়বস্তু "প্রেম-বৈচিত্র্য" এবং সৌন্দর্যও চিত্তাকর্ষক।

আবুল ফজল অন্যান্য সমসাময়িক গানেরও উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে মথুরায় প্রচলিত **বিষণপদ** (বা বিষ্ণুপদ) ছ'সাতটি পংক্তির গান। এই রীতি পরবর্তীকালে ধমাররূপে ধ্রুপদে এসেছে কিনা বিচার্য। গুজরাটের অঞ্চলে গাওয়া হত করকা বা সাদরা। এই গানগুলো বীররসাত্মক। এগু'লি চার বা ছটি (মতান্তরে ছয় বা আট) ছত্রে গঠিত এবং বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হত। এই ধরণের গীতগুলির প্রতি সম্রাট আকবরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গানগুলো সাবঙ্গ, পূর্বী, ধনাশ্রী, রামকলী, সুহ্রাঈ এবং অপরাপর শ্রেণীর মধ্যে সুহু, দেশকাল (?) ও দেশাখ ইত্যাদি রাগে গাওয়া হত। এই বীররসাত্মক গানের অনুপ্রেরণায় পরে ধ্রুপদেও অনুরূপ রচনা হয়েছে কিনা বিচার্য। বিশেষত বখশু ও মচ্ছু পরে গুজরাটেই প্রতিষ্ঠিত হন বলেই এই ভাবনা আসে। (ফকিরুল্লাহ্ সাধর চুটকলা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা বলেছেন।)

ধ্রুপদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফকিরুল্লাহ্ যা বলেছেন তা হল : "প্রধানতঃ এই গীতকে গঠন করেন গোয়ালিয়রের রাজা মান। এটি চারটি কলিতে নিবদ্ধ (পাদটীকায় এই চারটি কলি উদ্ধৃত হয়েছে—উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুয়া, ও আভোগ)। সম্মেলনে আগত নায়ক বখশু, নায়ক ভান্নু, মাহমুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ এঁদের সাহায্যে এ গীত রচনা করা হয়। এই ধরণের রচনা অভিজ্ঞ এবং সাধারণ সকলেরই পছন্দ হয়েছিল। এ অঞ্চলে এর মত উত্তম রচনা আর নেই। এর প্রমাণ স্বরূপ আমার দুটি বক্তব্য আছে। প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদের রাগ ও গীত মার্গপদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। অপরটিতে রাগ-সংগীত অল্পতর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি। এই জাতীয় সংগীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাষায় গেয়ে থাকে—একথাও আগে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ধ্রুপদে গায়ন-বৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই কারণে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও

মার্গ উভয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত (দেশী ও মার্গ শব্দ দুটো সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত)। সত্যি কথা বলতে কি, রাজার নিজের আমলের গায়ক সম্মেলন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; তথাপি সেই প্রতিষ্ঠার গৌরব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পরবর্তীকালে যদি উক্ত রাজার মত আর একজন জন্মগ্রহণ করতেন এবং তাঁর মত ক্ষমতাসম্পন্ন হতেন তা হলে তাঁর সময়েও ধ্রুপদের মত সংগীত সৃষ্ট হতে পারত। সেই ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও প্রসারের অস্তিত্ব সম্ভব নয়; মনে হয় সেরকম বুঝি আর হবে না। একথা বলছি কেন না মার্গীয় রাগ-সংগীত, দেশী ভাষায় সম্পাদিত মার্গ সংগীত এবং দেশী পদ্ধতিকে একত্র করে যে উত্তম নাদের (সঙ্গীতের) সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে কেউ যদি তদনুযায়ী কোনও নতুন রচনা করেন তা হলেও তা সব কিছুই রাজার নির্দেশে প্রস্তুত ধ্রুপদকেই অনুসরণ করে থাকে। দেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সময়ানুসারে বা স্থানানুসারে ঘরোয়া (খড়ী বোলী) ভাষায় গাওয়া হয়। মার্গীয় রীতিতে অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সংস্কৃত ভাষায় গাওয়া হয়। দেশীয় প্রথায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ গোয়ালিয়র থেকে আকবরাবাদ (আগ্রা) ও বারী অঞ্চলে প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্যন্ত এর সীমা। পূর্বে এটাওয়া, দক্ষিণে উন্‌ছ্ এবং পশ্চিমে ভূসাও ও বয়ানা পর্যন্ত এর সীমা নির্দিষ্ট। এই শহরগুলিতে হিন্দুস্থানের ভাষাসমূহ বহুল পরিমাণে শুদ্ধ ও সুন্দর ভাবে বলা হয়।"

ধ্রুপদ সম্বন্ধে কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলেছেন মীর্জা খাঁ 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ' গ্রন্থে (১৬৭৫-এর পূর্বে): "দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ হচ্ছে ধ্রুপদ। এটি চারটি তুকে নিবদ্ধ। এই তুকগুলির নাম হচ্ছে—আস্থল (স্থায়ী), একে পিড়াবন্দা-ও বলা হয়। দ্বিতীয়টিকে অন্তরা বলে। পরের দুটি তুককে ভোগ বলা হয়; সাধারণ্যে এটি আভোগ নামে পরিচিত। কেউ কেউ চতুর্থ তুককে আভোগ বলেন। এই গীত ব্রজভাষায় প্রচলিত এবং গোয়ালিয়রের রাজা মান এটি রচনা করেন। ধ্রুপদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুই তুকের ধ্রুপদকে তিউট বলেন। এর সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল উচ্চারণ করা হয়। এর একটি প্রকারভেদ—ফুলবন্দ। আর এক প্রকারের নাম—যুগলবন্দ। এতে দুজন গান করে থাকেন। একজন গান করেন আর একজন তালের বোল প্রভৃতি উচ্চারণ করেন। রাগ ও রাগিণীর প্রকৃতি অনুসারে গাইলে তাকে রাগসাগর বলে। দীর্ঘ কবিতাযুক্ত একপ্রকার গানকে বিষেণপদ বলে। সুরদাস এই গীত রচনা করেন এবং চমৎকার ভাবে গাইতেন।"

বাজা মানের সংগে সম্পর্কিত ধ্রুপদ সৃষ্টির কয়েকটি নিরপেক্ষ বর্ণনার পর সংক্ষেপে আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে বলা যায়। রাজা মানের জন্যেই বা গুর্জর রাণীর অনুপ্রেরণায় গুর্জরীর কয়েকটি সংমিশ্রিত রাগ প্রস্তুত হয়েছিল। নায়ক বখশু ঢাড়ী বংশীয় ব্রাহ্মণ। তিনিই ধ্রুপদকে জনপ্রিয় করেছিলেন, বহু গান রচনা করেন, এমনকি হোরী ধমার রচনাও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত। 'রাগ-এ-হিন্দ' নামে একটি গ্রন্থে নাকি বহু ধমার সন্নিবেশিত হয়েছিল। বকশু, বচ্ছু আবার বৈজু নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। বচ্ছু নামে হুমায়ুনের একজন প্রিয় সভা-গায়ক ছিলেন। ভন্নু বা ভানু মানের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের দিকে চলে যান। তাঁর পরবর্তী বংশধর গুণ সেন। একমতে মচ্ছু বা মজঝুই বৈজু বাওরা। মহম্মদ করম ইমাম 'মাদ্‌নুল মৌসিকী' গ্রন্থে বলেন বিজয়নগরের পাণ্ডবীয় বা পাণ্ডেয় গোয়ালিয়রে রাজা মানের সভায় উপস্থিত হয়ে শাস্ত্র বিচারে সাহায্য করেন। কথিত আছে পরবর্তীকালে তিনি বৈজু বাবরা নামে পরিচিত হন। অর্থাৎ মানের সভায় জনৈক বৈজুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু কে এ বৈজু, কি তাঁর রচনা? নির্দেশ করা চলে না। মোটামুটি গোয়ালিয়রের এই পবের সঙ্গে আরো কয়েকটি নাম যুক্ত করা যায় যা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য: বৈজু, গোপাললাল, বৈষ্ণববাদী সন্ত হরিদাস প্রভৃতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় সংগীত : পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক

ধর্মীয় সংগীতের ধারা অনুসরণ করা যায় এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিন্তু এর বহু পূর্ব থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে বিভিন্ন স্রোতগুলো। এ সম্বন্ধে বলা দরকার যে ধর্মীয় সংগীত-রীতির প্রকাশ প্রবন্ধ গানের মধ্য দিয়ে। তা আমরা লক্ষ্য করেছি চর্যাগীতি এবং গীতগোবিন্দ কাব্যে। সমসাময়িক কালে মঙ্গল গীতি, চণ্ডীমঙ্গল, মনসা মঙ্গল প্রভৃতি ধরণের গান সমগ্র পূর্ব ভারতেই অনেকটা পাঁচালী বা পঞ্চ-তালেশ্বর প্রবন্ধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এগুলো লোকগীতি পর্যায়ের গান। কিন্তু একথা সত্য যে এ সংগীতে ধর্মীয় আবেদন প্রবল ছিল বলে গ্রামীণ সমাজ রাত্রি জাগরণ ক'রে ('মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে

জাগরণে', অথবা 'দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জনে' ইত্যাদি) এসব গান করত। বিশেষ করে মনসার গান তো অসমীয়াতে প্রবল ভাবে বিস্তৃত ছিল। উড়িষ্যায় গীত হত ছান্দ, চৌতিশা, জনান ইত্যাদি। এখানে আমরা এসব লৌকিক পর্যায়ের গানের সম্বন্ধে আলোচনা করব না, কারণ এসকল সংগীতে প্রচলিত গানের দ্বারাই প্রভাবিত মূল ধর্মীয় সংগীত বিশ্লেষণ করলে এগুলো বুঝতে পারা যায়।

উত্তর ভারতে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় ধারা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির জন্যে সংগীতকে অবলম্বন করেছিল। এ সংগীতই মধ্যযুগের সত্যিকার লোক-প্রচলিত সংগীত। এ সংগীত ধর্মীয় তত্ত্বগুলোর সংগে অত্যন্ত নিগূঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ। এর মধ্যে সংগীত-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে বৈষ্ণব ভাবধারা। মোটামুটি ১০ম শতক থেকে ভাগবত পুরাণ অবলম্বন করে যে বিশেষ ভাবের স্ফুরণ হয় তা গীতগোবিন্দে লক্ষ্য করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতকে আচার্য শঙ্করের মতবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে প্রবলভাবে প্রচারিত হয়। দক্ষিণ ভারতে আগত মুসলমানদের একেশ্বরবাদের ফলেই অদ্বৈতবাদের নতুন অভিব্যক্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। একাদশ শতকে তামিল দেশে রামানুজ জ্ঞানপ্রধান পরমাত্মার ধ্যান এবং সেই সঙ্গে রাম ও শ্রী বা লক্ষ্মীর উপাসনার প্রবর্তন করেন। ১২শ শতকে নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, বিশেষ করে এর বিস্তার হয় বৃন্দাবনে ও রাজস্থানে। নিম্বার্কের মতে সহস্র সখী-পরিবৃতা রাধাসহ কৃষ্ণই উপাস্য। দ্বৈতবাদী মাধ্বের (আনন্দতীর্থ) ত্রয়োদশ শতকে কর্ণাটকে জন্ম। তিনি কৃষ্ণ-উপাসক—গোপাল ও কৃষ্ণ। এই মতে গোপী বা রাধার উল্লেখ নেই। রামানন্দ চতুর্দশ শতকে কাশীতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি রামানুজ মতাবলম্বী, রাম-সীতার উপাসক। জাতি-ভেদ মানেন না। ষোড়শ শতকের কবীর, দাদূ ও তুলসীদাস সকলেই রামানন্দী ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভের প্রচার মথুরা, রাজস্থান ও গুজরাটে। এই মতে ব্রজের বালকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ দেবতা। রাধা ভক্তির যোগ্য। এছাড়া দাক্ষিণাত্যে তামিল আলওয়ারদের মধ্যে ভক্তিধর্মের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। এখান থেকেই রাধাভাবের সূচনা, অনেকে মনে করেন। এই সমস্ত মতবাদেরই সাংগীতিক প্রকাশ কোন না কোন ভাবে হয়েছে। উত্তর ভারতে সূফী ভাব-ধারাও এভাবে সংগীতাশ্রয়ী হয়েছিল। তাছাড়া শৈব ভাবধারার মাধ্যমে বিশেষ করে নৃত্যনাট্য এবং গম্ভীরা ইত্যাদি সংগীতের স্ফুরণও সপ্তম থেকে

নবম শতকের মধ্যে হয়েছিল। অন্যদিকে বৌদ্ধ মহাযান মতের কথা আসে। বাংলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক, সহজিয়া এবং বৈষ্ণব ভাবধারার একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ হয়েছে, গানের মাধ্যমে এর প্রকাশ বিশেষ রূপলাভ করেছিল।

অর্থাৎ, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর থেকে মুসলমান যুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতিতে কতকগুলি ধর্মীয় ভাবধারা বিকশিত হচ্ছিল। এরা কখনো আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধীও ছিল। কিন্তু সহ-অবস্থানেও ত্রুটি ছিল না। কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে মহাযান বৌদ্ধ মত বিকশিত হয়েছিল কণিষ্কের পর থেকে অতি বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাবে। মহাযানীরা বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ ও বিধিবদ্ধ উপাসনা পদ্ধতি ছেড়ে বুদ্ধের সাকার মূর্তি উপাসনায় ব্রতী হন। একটি শ্রেণী এই বুদ্ধ-মূর্তিতে আরোপ করেন শক্তির লক্ষণ। বুদ্ধ-মূর্তিতে শক্তি-কল্পনার ফলে কিছুকাল পরে কালীর সঙ্গে একটা বিস্ময়কর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তান্ত্রিক ক্রিয়ার ভিত্তিভূমি হয় এই বিশ্বাস। সেই সূত্রে বজ্রেশ্বরী প্রভৃতি দেবী পূজার উদ্ভব। নানা গুহ্য যৌগিক প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। ক্রমে এই শ্রেণীর মহাযানীরা পুরুষ ও নারীতে সহজ সাধনের ভাব আরোপ করে সহজিয়া মতে এসে উপস্থিত হন। বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে সহজিয়া মত সম্মিলিত করে এই ধারা যাঁরা অবলম্বন করেন, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের ভাব নায়িকাতে অর্পণ করেন এবং মানুষ ভজনা আরম্ভ করেন। তাঁরা মনে করতে থাকেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, রায় রামানন্দ এঁরা সকলেই ভক্ত সহজিয়া। এই ধর্মীয় রীতি যেমনই হোক, সংগীতের মাধ্যমেই এর প্রকাশ এবং বিশেষ করে পদাবলী কীর্তনের সংগে এই ভাব সংমিশ্রিত হয়ে মানব-প্রীতিমূলক একটি সুর ধ্বনিত করে। এবারে **পঞ্চদশ শতকের** ভক্তিধর্মীয় সংগীত-অবলম্বী সাধকদের কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে :

(১) **বিদ্যাপতি** : ছন্দ, সংগীত, রংএর সুষমা এবং সৌন্দর্য সম্ভোগের তরঙ্গলীলা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি-পদাবলীর ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলী, কিন্তু বাংলাদেশে প্রবল প্রচারের ফলে সম্মিলিত কৃত্রিম ভাষারূপ নিয়ে বিদ্যাপতির অনেক পদ ব্রজ-বুলিতে পরিণত। বিদ্যাপতির রচনাগুলো : সংস্কৃতে—পুরুষ পরীক্ষা, গঙ্গাবাক্যাবলী, শৈবসর্বস্ব-হার, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, এবং অবহট্টে—কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা। মধুর পদগুলি পৌঁছে গিয়েছিল পুরীতে, যেখানে রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য গীতগোবিন্দও চণ্ডীদাসের পদ গানও আস্বাদন করতেন। পরে নানা লৌকিক সুরে গীত হতে

থাকে। এসব পদে নানা রাগের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে নতুন রাগের নামও পাওয়া যায়। আনুমানিক চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে (১৩৫৮?) বিদ্যাপতি দ্বারভাঙা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে মিথিলারাজ শিবসিংহের সভায় সংযুক্ত হয়ে শৃঙ্গার রসের পদ রচনা করেন। রাজ-অন্তঃপুরে লছমীদেবীর প্রীতি উৎপাদন করেছিল এই গীত। নিয়মিত গীতও হত। বিদ্যাপতির বর্ণনার ঐশ্বর্যে কিশোরী-রাধিকার মাথুর-ভাবোল্লাস-প্রার্থনা প্রভৃতির ভাব-সম্পদপূর্ণ পদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। মধ্যযুগের বাঙলা গান ও কবিতা বিদ্যাপতির দ্বারা এমন ভাবে প্রভাবিত যে বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলিতে পদ রচনা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, এবং বাংলা পদের সঙ্গে পদাবলী সংগীতে সংমিশ্রিত হয়। অন্য দিকে মিথিলার সংগীত-সংস্কৃতিতে কতকটা সংগীতের আভিজাত্য রক্ষা করা হয়। ১৪৪৮ পর্যন্ত বিদ্যাপতি বেঁচে ছিলেন বলে জানা যায়।

(২) **চণ্ডীদাস:** বাংলায় বিদ্যাপতির গানের সংগে চণ্ডীদাসের নাম যুক্ত হয়ে আছে চৈতন্য-যুগ থেকে। একজন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। তিনজন চণ্ডীদাস বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ছড়িয়ে আছেন—বড়ু, দ্বিজ, দীন। এঁদের নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা প্রচুর। এর মধ্যে কোন্ চণ্ডীদাস চৈতন্য-দেবের মনে রেখাপাত করেছিলেন এবং বিদ্যাপতির রূপরসসমৃদ্ধ পদের সঙ্গে একযোগে কার পদ উচ্চারিত হত বলা মুস্কিল। সংগীতের দিক থেকে চণ্ডীদাস যেই হোন, আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাসকেই লক্ষ্য করব, যাঁর পদাবলী কীর্তনের অক্ষয় সম্পদ। যেসব পদ কোমল মাধুর্যে, পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহের আকূতিতে অপূর্ব আবেশ সৃষ্টি করে, সেই সব পদই আমাদের লক্ষ্য। সংগীতের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস নিয়ে বহু কিংবদন্তীর জট ছাড়ানোর দরকার নেই। চণ্ডীদাসের পদে দুঃখের সুরের অভাবনীয় বিকাশ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। আবেগের গভীরতা, ব্যাকুলতা এবং সেই সঙ্গে অলঙ্কার-বিহীন স্বচ্ছ, প্রতীক-ধর্মী, সহজ ভাষা মনকে এমনই একটি স্তরে নিয়ে যায় যে কীর্তনের সুর ও ছন্দের সংযোগে প্রেমের গভীরতম অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই সূত্রে "পীরিতি সূচক" অসংখ্য গানগুলোর কীর্তনে ব্যবহার, সেই সংগে আখর দিয়ে ব্যাখ্যার কথা মনে করা যেতে পারে। চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে পরকীয়া তত্ত্বের বিকাশের কথা আসে। চণ্ডীদাস ও রামী কাহিনী অবলম্বন করে এই পরকীয়া তত্ত্ব গড়ে উঠেছে বলেই এক শ্রেণীর পদ বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কতকগুলো এক ধরনের রাগের নাম প্রায় অধিকাংশ পদাবলীতে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই রাগগুলোর ব্যবহার কখন হয়েছিল বা আদৌ হত কিনা বলা যায় না। সংগীতের দিক থেকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্তনের অঙ্গরূপেই বিবেচ্য।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতকে ব্যাপ্ত। বরং তিনজন চণ্ডীদাসের ব্যাপ্তি আরো বেশি। পদাবলী কীর্তনের বিষয় অনুসারে এঁরা এক সঙ্গেই উল্লেখ্য, একথা বলেছি। পঞ্চদশ শতকে যে কয়েকজন মহাপুরুষ ধর্মীয় সংগীতের গোড়াপত্তন করেন তাঁদের প্রায় সকলেই পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এঁরা হলেন: শঙ্করদেব, কবীর, নানক, পুরন্দর দাস, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শ্রীচৈতন্য।

(৩) **কবীর** (১৪৪০ (?)—১৫১৮): সময় নিয়ে বহু মতভেদ আছে। অনেকেব মতে জন্ম চতুর্দশ শতকে। কিন্তু রামানন্দের সংগে কবীর সম্পর্কিত রামানন্দ-শিষ্য হিসেব ধরে জন্ম তারিখ নির্ধারণের চেষ্টাও দেখা যায়। জন্ম কাশীতে। ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভজাত। কিন্তু পরে মুসলমান হন। কবীর নিজেকে "কোরী" বলে পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেব মতে তিনি নিম্নজাতীয় তাঁতি— "তু বাম্‌হন মৈ জাতি জুলহা।" তিনি গুরুর পরিচয় দেননি, কিন্তু গুরুর ভাবপ্রচারই তাঁব ব্রত ছিল। লোঈ রমনীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন শোনা যায়। ধর্মীয় তত্ত্ব: সূফী-যোগী-বৈদান্তিক মতবাদের সহযোগিতায় এক সমন্বয়-মূলক মতবাদের স্ফুরণ হয়। অদ্বৈতবাদ ও ইসলামের সমন্বয়ে একেশ্বরবাদ তাঁর মূল চিন্তা। এজন্যে রাম-রহিম-আল্লা-হরি-গোবিন্দ-সাহেব সবই এক। প্রবাদ, রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে তিনি একজন। সে সময়ে জাতিভেদ, মূর্তিপূজা, অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ও ক্রিয়ানুষ্ঠানাদির বিরোধী মনোভাবেই সন্তগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় (১৬—১৭—১৮শ শতকে)। এঁরা হলেন রৈদাস, নানক, ধরমদাস, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি। হিন্দু কবীরপন্থীরা দুই দলে বিভক্ত—বারাণসী ও ছাত্রশগড়ে। মুসলমান কবীরপন্থীদের কেন্দ্র মগ্‌হর-এ। পরে কবীরপন্থীর সন্ন্যাসাশ্রম ধর্ম স্থাপিত হয়। পদ সমৃদ্ধি, সমন্বয় ধর্ম এবং স্বাভাবিক কাব্যিক বিকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ১০০টি পদ ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন। সংগীতের দিক থেকে কবীরের দোহাগুলি বহুল প্রচারিত। গানগুলোর মধ্যে নামগান, গুরুবাদ, বৈরাগ্য, জীবে-প্রেম, বিভেদের বিরুদ্ধ ভাবপ্রচাব প্রভৃতি আছে। বর্তমানকালে কিছু কিছু গান

রাগযুক্তও পাওয়া যায়। ভজনের মতো করে খঞ্জরী, শিক, একতারা প্রভৃতি সহযোগে অনেক দোহা সাধারণ্যে গাওয়া হত।

(৪) **নানক** (১৪৬৯—১৫৩৮): লাহোরের (নানকানায়) তালওয়ান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাধুসঙ্গের আকর্ষণ, শিক্ষায় বৈরাগ্য, ফার্সী শিক্ষা, পৈতা গ্রহণে আপত্তি প্রভৃতি বাল্য বয়সের ঘটনা তাঁকে বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে যায়। বিবাহের পর কর্মে নিযুক্ত হন কিন্তু পরে সংসার ত্যাগ করেন। ব্রহ্মের প্রত্যাদেশ, তীর্থভ্রমণ (মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, সিংহল, গয়া, কাশী, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন ইত্যাদি) তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও মতবাদের সহায়ক হয়। মতবাদ: ঈশ্বর এক, তিনি সত্য, স্রষ্টা, নির্ভীক, নিঃসপত্ন, অমর, অজ, স্বয়ম্প্রকাশ মহান এবং দাতা। ঈশ্বর, গুরু ও নামজপ প্রধান কর্ম। মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধতা, সহনশীলতা ও সামাজিক মিলন, আচারপ্রিয়তার নিন্দা, পশুবলির বিরুদ্ধতা ইত্যাদি ভাবধারা প্রচার করেন। সহনশীলতা এবং ধর্মগত সামাজিক মিলনের চেষ্টা তিনি করেন। কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এরূপ কিংবদন্তীও আছে।

ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় একজন রবাব-বাদক ছিলেন নানকের সঙ্গী। সেই থেকেই তিনি নামসংগীত এবং ভজন প্রধান অবলম্বন করে নেন। বহু ভজনই মোটামুটি রাগ অবলম্বন করে গাওয়া হয়, এবং কতকগুলি গান ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের সুরে পৌঁছে যায়। উপাসনার রীতিই ভজনের প্রধান অঙ্গ। শিখ মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতি লক্ষ্য করলে সংগীত প্রয়োগের সহজ বৈশিষ্ট্য বিশেষ আকৃষ্ট করে।

(৫) শিখদের ধর্মগ্রন্থে **নামদেবের** অনেক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের ধর্মীয় সংগীতের মধ্যে ভক্তিমার্গী কয়েকটি নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতকের ধ্যানেশ্বর বা ব্যাসদেব এবং চতুর্দশ শতকের **নামদেব** এক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয়। সরল ভক্তিমূলক ভাবপ্রচারের মূলে ছিলেন নামদেব। হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। শিখদের ধর্মগ্রন্থের মতো, গুজরাতী অভঙ্গেও নামদেবের কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানের মাধ্যমেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পন্থা নির্ধারিত করেছিলেন।

(৬) **শঙ্করদেব** (১৪৮৯-১৫৬৮): অসমীয়া সমাজে একেশ্বর নাম ধর্ম প্রচার করে বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। নারায়ণের অভিব্যক্তি বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের দাস্য ভাবের সাধনাই মূল কথা। শঙ্করদেব নাম-ঘর স্থাপন

করে তাতে নামকীর্তনের বিধির প্রচলন করেন। বিহার এবং পুরীতে তিনি যাতায়াত করতেন। পরবর্তী জীবনে তুলসীদাসের রামচরিত-মানস ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। স্বীয় গান রচনায় ব্রজবুলির মতো মৈথিলী ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভাগবত অবলম্বন করে নানা নাটক রচনা এবং বরগীত (নামঘোষা) রচনা শঙ্করদেবের বিশেষ অবদান। তিনি বরগীত গানের রীতি সরল ভাবেই নির্ধারণ করেন। তাঁর ৩৪টি বরগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। শঙ্করদেবের অনুসরণ করেন মাধবদেব (১৪৯০)। মাধবদেব হাজারীঘোষা বা নামঘোষার মতো হাজার গান রচনা ও প্রচার করেন। মাধবদেব স্বীয় রচনাগুলোতে রাগ প্রয়োগের অধিকতর কৌশল আরোপ করেছিলেন মনে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বহু রাগের উল্লেখ আছে। মাধবদেব বিশিষ্ট সংগীত-কুশলী ছিলেন।

(৭) **শ্রীচৈতন্যদেবের** দান বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। এই ধর্ম অবলম্বন করে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারও সুবিস্তৃত। জন্ম ১৪৮৬-তে নবদ্বীপে, বিবাহ, ২০।২১ বৎসরে পাণ্ডিত্য অর্জন, গৃহত্যাগ, দীক্ষা, সন্ন্যাস ইত্যাদি নিয়ে আকর্ষণীয় কাহিনী লীলা কীর্তনের বিষয়রূপে প্রচলিত। নামসংকীর্তন, নগরকীর্তন, বেড়াকীর্তন, উদ্দণ্ডকীর্তন ছিল ধর্মীয় ভাবপ্রকাশের প্রধান পন্থা। চৈতন্যদেবের প্রেরণার সুদূরপ্রসারী ফসল ফলেছিল। দুইবারে মোট প্রায় ১৮ বৎসর পুরীতে বসবাস কালে নিয়ত স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর, রূপ-সনাতন প্রভৃতি লীলা-সহচরদের সঙ্গে রাগ ও তাল সহযোগে যেমন পদাবলীর (বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস) সংগীত চর্চা চলতো তেমনি ভাগবত অবলম্বনে নাট্যচর্চাতেও সংগীত প্রযুক্ত হত। এভাবেই কীর্তন অনেকটা বিকশিত হতে থাকে। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পরই রাধাভাবের স্ফুরণ হয় বিশেষ ভাবে। পুরীতে তিনি কীর্তনীয়াদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ৭টি কীর্তনীয়া দল পুরীতে সমাগত হয়েছিল। সেখানেই পদ-কীর্তনের প্রথম বিকাশ হয়েছিল। ১৫৩৩-এ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেই পদাবলী কীর্তন প্রকৃত লীলাকীর্তনের রূপলাভ করে ঠাকুর নরোত্তম দাসের খেতুরী মহোৎসবে। জীবনী-রচয়িতাগণ চৈতন্য-প্রবর্তিত সংগীত-রীতিকে প্রবন্ধ

থেকে উদ্ভূত এবং প্রকৃত শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারী বলে বর্ণনা করেছেন এইভাবে তাঁরা পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ঠাকুর নরোত্তমের হস্তক্ষেপের পূর্বেই মনে হয় শ্রীখোল বাদন এবং গানের অন্যান্য রীতি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হতে থাকে।

(৮) **রায় রামানন্দ** (১৪৭০ ?) : চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কীর্তন বিকাশের পথে পরম সহায়ক ছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সভায় ছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাব চিন্তা ও সংগীত-অনুভূতির নিত্য সঙ্গী ছিলেন। সমসাময়িক **স্বরূপ দামোদর** সত্যিকার সংগীতশিল্পী ছিলেন। তিনিই চৈতন্য সমক্ষে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ গান করতেন এবং কীর্তনে চৈতন্যের সহযোগিতা করতেন। **নরহরি সরকার** সমসাময়িক হলেও চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌরলীলার প্রচার তিনিই করেন। পদকর্তাদের অনুসরণে কিছু উৎকৃষ্ট পদের রচনা ও সুর সংযোজনা করেছিলেন। এছাড়াও সমসাময়িকদের মধ্যে **অদ্বৈতাচার্যের** সংগে শ্রীচৈতন্যের সংগীত-সংযোগের কথা বিশেষ প্রচলিত। কীর্তনীয়া **রামানন্দ বসু, মুকুন্দ দত্ত** এবং **গোবিন্দ ঘোষ** ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়—এসকলকে নিয়ে চৈতন্যদেবের পরিবেশে এক সংগীত-সংসার বিরাজ করতো।

এখানে একটি কথা বলা দরকার, শ্রীচৈতন্যের সময়কালের (১৪৮৬-১৫৩৩) মধ্যে বাংলায় বিপুল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও সূচনা হয়েছিল। হুসেন শাহের রাজত্বকাল সুরু ১৪৯০ নাগাদ। এ সময়ে কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া বাংলায় অন্যান্য সাহিত্যও রচিত হতে থাকে।

(৯) **পুরন্দর দাস** : পুণার কাছে পুরন্দরগড়ে ১৪৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বণিক বৃত্তি ছেড়ে কর্ণাটকে সন্ত 'হরিদাসে' পরিণত হন। গুরু শ্রীব্যাসরায় স্বামীর দ্বারা বিজয়নগরে ভক্তিধর্মের পথে অনুপ্রাণিত হন। এরপর ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রে প্রচুর গান রচনা ও গান করে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কানাড়া ভাষার এই অপূর্ব কীর্তনরাজি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। কানাড়া ভাষায় গণেশ স্তবটি আদ্যোপান্ত এখনো ছোটদের গানরূপে প্রচলিত। কর্ণাটক সংগীতকে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শন করেন। কিছু কিছু গান শিক্ষার্থীদের জন্যে রচনা করেন। মায়ামালবগৌলা মেলকে ভিত্তিমূলক মেল হিসেবে প্রচার করেন। লক্ষণ এবং লক্ষগীত রচনা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে

ছড়িয়ে দেন। সূলাদি তালে শ্রেষ্ঠ গানগুলি নিবদ্ধ করেন। আদি, চাপু ও ঝম্পতালে মুক্ত ভাবে রচনা করেন। সুরের রূপগুলোর নাম "বর্ণ-মত্ত"। পুরন্দর দাসের প্রায় ৬০০ গান ছাপা হয়ে প্রকাশিত। ত্যাগরাজ বলেছেন, পুরন্দর দাস কর্ণাটক সংগীতের বাল্মীকি।

ধর্মীয় সংগীতের প্রসঙ্গে যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এঁদের মধ্যে অনেকেই **পঞ্চদশের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত** ব্যাপ্ত। ষোড়শ শতকের সংগীত বর্ণনার সুরু থেকে এজন্য আমরা পূর্বধারা অনুসরণ করছি। ধর্মীয় সংগীতের পর্যায়ে এখানে আছেন :

(১০) **মীরা** (১৪৯৮-১৫৪৮ অথবা ১৫০৪-১৫৬৩।৭৩) : কর্ণেল টডের মতে রাণা কুম্ভের মহিষী। কিংবদন্তী অনুসারে আকবর ও রূপগোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কাহিনীও প্রচারিত। রাঠোর দ'দাজীর পুত্র রতন সিংএর কন্যা। রাণা সংগের পুত্র ভোজের সংগে বিবাহ, বৈধব্য ঘটে অল্প সময়ের মধ্যে। এরপর সংসারে বিরোধ, বৃন্দবনে গমন, পরের জীবন গুজরাটে কাটানো সবই অনুমানের ওপর নির্ভরশীল। তিনি নিজেকে রৈদাসের শিষ্যা বলেছেন। এসবই স্বতন্ত্র ভাবে বিচার্য। 'ভক্তমাল' গ্রন্থের খবরগুলো কিংবদন্তী-নির্ভর। বাল-গোপালের সাধনা, বণছোড়জীর সাধনা, চৈতন্যদেবের নামোল্লেখ, ভজনে রামের নাম, পতিভাবে পূজা এসব একই বৈষ্ণব ভাবধাবার প্রতিফলন নয়। তাছাড়া অন্য প্রকারের কিংবদন্তীগুলো অনেকটা মনগড়া মনে হয়। একাধিক মীরার অনেক পদ একসঙ্গে এসে মিশেছে অথবা কবীর প্রভৃতি সন্তদের গানের চাপে এ গানগুলো তেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। পরে সুবে ছন্দে এবং সহজ আকুতিমূলক আবেদনেব জন্যে নানাভাবে সাধারণ্যে সমাদৃত হয়েছে। কবীর, রৈদাস ইত্যাদির তুলনায় মীরার কতকগুলো পদে সরাসরি আবেদনসূচক ভাব আছে। এই প্রচলিত গানগুলোর সহজ আকুতিতে নিশ্চয়ই সহজ সুব ছিল যেগুলো লৌকিক গানে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। কিন্তু কেউ কেউ কিছু গান মথুরা-বৃন্দাবনের 'বিষ্ণুপদ' শ্রেণীভুক্ত করতে চান। সহজ ভাব প্রকাশের জন্যে যেমন কবীরের গান, তেমনি মীরার গানও রাগসংগীত গায়কের হাতে রাগ-মণ্ডিত হয়েছিল। সংগীতের প্রচার মোটামুটি রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেই বিশেষ হয়েছিল, পরে এ গান আরো ছড়িয়ে যায়।

মীরার পদে অনেকের নাম থাকা সত্বেও **রৈদাসের** সঙ্গে সম্পর্কটা বিশেষ আলোচিত। রামানন্দী দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে রৈদাসের দু-একটি পদের

আকর্ষণ মীরার পদের মতোই সহজ ও সরস—"প্রভুজী তুম চন্দন হম পানী, জা কী অঙ্গ অঙ্গবাস সমানী"। রৈদাস যা রবিদাস চর্মকারের ঘরে জন্মেছিলেন কিন্তু পঞ্চদশ শতকেই তাঁর জন্ম বলে মনে হয়! রচনাগুলোর ভাষা ও ভাবকল্প বিচারে মীরার পদ রৈদাসের পদের সঙ্গে ভাব-বিকাশের দিক থেকে তুলনীয়।

(১১) **কনক দাস** (১৫০৮-১৬০৬) ছিলেন বিজয়নগরের জমিদার। ছেলেবেলায় অনাথ হয়ে পড়েন। পরে প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী হয়ে রাজার বিশিষ্ট যোদ্ধা সেনাপতি—কনক নায়ক। ১৫৬৫-তে ব্যাসরায়ের প্রেরণায় মানবের সমতা প্রচার করে ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করেন। পরে কাগিনেলিতে স্থায়ী হয়ে প্রচুর রচনা ও সংগীত প্রচার করেন। কাব্য রচনা ছাড়া ১৩৬টি পদ সংরক্ষিত। কীর্তন রীতিতে রচিত পল্লবীসহ কয়েকটি চরণ আছে। কর্ণাটকী রাগ ভৈরবী, ধন্যাসী, কল্যাণী, কাম্বোজ, শঙ্করাভরণ, নন্দনক্রিয়া এবং তাল আদি, চম্পু, ত্রিপুটা ব্যবহার করেন। কথার ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও গভীরতার জন্যে কনক দাস খ্যাত। সংগীতরূপের অভিনবত্ব স্বীকৃত। 'দাসকূট' রচয়িতাদের মধ্যে পুরন্দর দাসের মতো কনক দাসও একজন শ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্যের অধিকারী।

(১২) **সুরদাস**ঃ গান রচনার ক্ষেত্রে কয়েকজন সুরদাস আছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে আমরা দুজন সুরদাসকে পাই। একজন ভক্তিবাদী সংগীতের রচয়িতা এবং অন্য সুরদাস রাগসংগীত রচয়িতার শ্রেণীভুক্ত, আকবরের সভায় ছিলেন। কয়েকটি (সুরদাস) নামের জট ছাড়ানো সম্ভব নয়। অনুমানের ওপরেও নির্ভর করা চলে না। একজন সুরদাস (ভক্ত) অন্ধ ছিলেন, অন্য একজন সুরদাস কাশীতে ছিলেন (১৫৩০-১৬০০)। তিনি প্রধানতঃ চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত। একজন সুরদাস সুরশ্যাম নামে পরিচিত। বিখ্যাত ভজন (বরসত নৈন হমারে সো নিসদিন)' রচয়িতা সুরদাস কে? জানা যায় একজন সুরদাস পঞ্চদশ শতকের অষ্টম দশকে (১৪৭৮-১৪৮০) দিল্লী এলাকার কাছে জন্মেছিলেন। বৈরাগ্য অবলম্বন করেন বাল্যকালে। অনেক স্থানে পর্যটন করে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভের শিষ্যরূপে বৈষ্ণব পন্থা অবলম্বন করেন। পরে বৃন্দাবনের গোবর্ধনের কাছে পারসোলীতে বসবাস করেন। এখানে তখন যে রীতির গান প্রচলিত ছিল তাকে বিষ্ণুপদ বলা হত। সুরদাসের গান

সংখ্যায় দুহাজারের মতো। সুরসাগর নামক গ্রন্থে গানগুলো সংকলিত। রচনাগুলো লৌকিক সুরেই গাওয়া হত।

(১৩) **তুলসীদাস** (১৫২৩।৩১-১৬ ৩।২৪ খৃঃ): মহাকবি তুলসীদাস হিন্দী সাহিত্যের যুগস্রষ্টা। রামচরিত-মানস বা রামচরিত্রের মানসসরোবব হিন্দী রামায়ণ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তুলসীদাস কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ, রাজপুর জেলার বান্দাগ্রামে জন্ম। পত্নী রত্নাবলীর প্রতি অতিশয়ানুরক্তির জন্য ভৎর্সনা লাভ করেন। সেই থেকে তুলসীদাসের বৈরাগ্য, জীবন সাধনা, পর্যটন, অধ্যয়ন ইত্যাদি চলে। বিপুল পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও কাব্যিক অভিব্যক্তির ফসল এই রামচরিত-মানস। গ্রন্থটি সাত কাণ্ডে নয়, 'সাত-সোপানে' রচিত। ব্রজভাষার প্রভাবযুক্ত হিন্দীভাষা 'সাধু-অলঙ্কার পুষ্ট, সুচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল'। সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ছেড়ে দিলেও এদেশে রামায়ণ গানের রীতি অত্যন্ত প্রাচীন। লৌকিক সংগীতের রূপে পাঁচালী রীতিতে গাওয়া হয়।

তুলসীদাসের দোহাবলী রচনার বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত সরস ও স্বচ্ছ। 'শ্রীরাম-চন্দ্র কৃপাল' অথবা 'জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁবর' উৎকৃষ্ট ভজনরূপে এখনো গাওয়া হয়। তুলনা করলে দেখা যায় বর্ণনাত্মক রচনায় এরূপ কাব্যিক স্ফুর্তি ভজন গানে বেশি দেখা যায় না। 'দোহাবলী' ও 'গীতাবলী' ভক্তিমূলক গানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সম্পদ।

(১৪) **দাদূ** ১৫৪৪।৪৫—১৬০০।১৬০৩): আমেদাবাদ অথবা জৌনপুরে মুচি অথবা মুসলমান ধুনকের বংশে জন্ম। রামানন্দী শিষ্যপরম্পরায় ছ'জনের পর দাদূ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বিস্তৃত জীবন ও পদেব ব্যাখ্যা করেছেন। দাদূ বাংলায় পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তাই বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গেও সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। পূর্ণ গৃহস্থ ছিলেন তিনি। নীচ জাতিরূপে লাঞ্ছনা কম ভোগ করেন নি। মানবিকতার এক সহজবোধ তাঁর দোহাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট, সেজন্যে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, আচার, বাহ্য ভেখ, রীতিগত সাধন, এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন দাদূ। তিনি সদ্‌গুরুবিশ্বাসী ছিলেন। আকবরের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার-আলোচনার ইতিহাসও শিষ্য সম্প্রদায়ের উল্লেখে জানা যায়। দাদূ দয়ালের অনেকগুলো ভজন অত্যন্ত লোকপ্রচলিত। 'অজহুঁ ন নিকসে প্রাণ কঠোর' গানটি বিশেষ আকুতিপূর্ণ। দাদুর গানের সুর সরল ও সংমিশ্রিত।

(১৬) **নরোত্তম ঠাকুর ও পদাবলী কীর্তন :** ধর্মীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কীর্তনের উদ্ভবের প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যের সংগে—সংশ্লিষ্ট একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য-যুগে নামকীর্তনের কয়েকটি বিশেষ রূপ প্রচলিত হয়েছিল। নাম-কীর্তনই কীর্তন সংগীতের উৎস। আঞ্চলিক ভাষায় চর্যাগীতির সংগীত-রীতি এবং তত্ত্বের দিক থেকে গীতগোবিন্দের গানের তাত্ত্বিক ও নাটকীয় দিক এই দুটোই পদাবলী কীর্তনে স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চাবিত হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সময়ে নায়ক-নায়িকা ভাবের আরোপ করে কীর্তন গান কতকটা গুহ্য ভাবেই হত। কারণ মধুর-ভাব সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল না। শ্রীচৈতন্য কীর্তনে বাধাভাবের প্রাবল্যের কথা নিজেই বলতেন। বসসমৃদ্ধ এই কীর্তন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ রইল না।

ষোড়শ শতকে (১৫৩০-এ রাজসাহী জেলার গোপালপুর পরগণার কৃষ্ণপদ দত্তের পুত্র নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পরই ইনি বৃন্দাবনে যান। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থেকে জীবগোস্বামীর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন, লোকনাথের (শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর) কাছে দীক্ষা গ্রহণ এবং রাগসংগীত শিক্ষা করেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে তিনি পুরীতে যান। সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারা পদকীর্তন প্রচারের জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট হন। রাজসাহীতে ফিরে ১৫৮২ খ্রীঃ নাগাদ খেতুরীতে কয়েকটি শ্রীগৌরাঙ্গ এবং অন্যান্য মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ করে বিরাট মহোৎসব করেন। সারা দেশ থেকে বৈষ্ণবেরা এই উৎসবে (বিশেষ ক'রে কীর্তনে) যোগদান করেন। এই সম্পর্কে বলা হয়, তিনি তাঁর সৃষ্ট গরানহাটা কীর্তনের রীতি খেতুরীতে প্রচার করেন। এই বর্ণনা নানা গ্রন্থেই আছে। কীর্তন রীতির গায়কী নির্ধারণের জন্যে এখানেই প্রবন্ধ সংগীতে নিবদ্ধ-অনিবদ্ধ রূপের গান এবং জাতিরাগ-গ্রামরাগ ইত্যাদিও আলোচিত হয়। স্বভাবতই প্রাচীন সংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির এই বিশেষ চেষ্টা। মনে হয় যে ঠাকুর নরোত্তম কীর্তনকে রাগসংগীতের রূপ দান করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অর্থাৎ গানের বিভিন্ন অঙ্গের জন্যেই সম্ভবত লৌকিক ও দেশী সুর ও ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। কীর্তনে আঞ্চলিক রীতির উদ্ভব এই কারণেই সম্ভব হয়। মনোহরশাহী (বীরভূম), রেনেটী (বর্ধমান), মন্দারিণী (?) ও ঝাড়খণ্ডী (?) প্রভৃতি কীর্তনের রীতিগুলো লৌকিক নাম, বিশিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত।

এই সময় থেকে পদাবলী কীর্তনের রূপ বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত হতে থাকে।

বিকশিত পদাবলী কীর্তনের অঙ্গকে নিম্নলিখিত কয়েকভাগে ভাগ করা যায়—(১) শ্রীখোল-বাদন, (২) গৌরচন্দ্রিকা, (৩) রসতত্ত্বের ৬৪ রসের মধ্যে কোনটি লীলাকীর্তনে ব্যবহৃত হবে তার নির্দেশ, (৪) কথা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর ইত্যাদি গানের ভাগ (বা পাঁচটি উপাঙ্গ), (৫) কীর্তনীয়ার গানের নিয়ম পদ্ধতি ও দোহার এবং বাদকদের সহযোগিতার নিয়ম, (৬) তালবৈচিত্র্য ও লয়, (৭) সুরব্যবহার ও নাট্যভঙ্গি। এর কয়েকটি দিকের ব্যাখ্যা বহু বিস্তৃত ভাবে হতে পারে। সংক্ষেপে, শ্রীখোল বাদনের প্রারম্ভিক রীতির উদ্দেশ্য পরিবেশ সৃষ্টি। শ্রীগৌরাঙ্গ গানের মূল উৎস, কাজেই গৌরচন্দ্রিকায় রূপ বর্ণনাসহ গৌরাঙ্গ স্তুতি ও পালার নির্দেশ। এরপর রস সম্পর্কে দ্বাদশ তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ রাধা বা গোপীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বপ্রকার কামনামুক্ত অবস্থা, ঠিক সেজন্যে যুগলরূপ তত্ত্বের প্রকাশ ও বিলাস, রসাস্বাদন, পারস্পরিক ভজনা, ভগবান-ভক্ত সম্পর্ক, সাধ্যবস্তু, সাধনা, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন প্রভৃতির মূল রস বোঝা দরকার।

লীলা বা পালাগুলো রস ও ভাবের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়ায়। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা বিশেষ করে রূপ-সনাতন, কবি কর্ণপুর, পীতাম্বর দাস প্রভৃতি পদাবলীর ভাবসম্পদকে রসের ব্যাখ্যায় নিয়ন্ত্রিত করেন ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের বর্ণনা আছে : শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত। সাহিত্য ক্ষেত্রে আরো বেশি একটি রস—শান্ত (সব নিয়ে নয়টি)। কিন্তু কীর্তনে রসের প্রয়োগ বিশিষ্ট রকমের। সংক্ষেপে, ভক্তিতত্ত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : (১) শুদ্ধা এবং (২) রাগানুগা। এক্ষেত্রে পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা নায়িকা। তিনি প্রধান এই কয়েকটি রতির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এগিয়ে যান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। কিন্তু লীলা বা পালার সম্পর্কে শৃঙ্গার বা মধুর রসের প্রকারভেদই প্রাধান্য লাভ করে। মধুর রসকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায় : বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের অর্থ পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস এই চারটি : এবং সম্ভোগ চার প্রকারের—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। এই আটটি রসের প্রত্যেকটির আটটি করে ভাগ, সেগুলো নায়িকার মূল ভাবাবেগ অনুসারে এইরূপ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা। আটটির আট ভাগে সবশুদ্ধ ৬৪টি। সমগ্র

পদাবলীতে এই রসের বৈচিত্র্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের প্রতি রাধার ব্যক্তিত্ব বা হ্লাদিনী শক্তির সমর্পণের কথা অপূর্ব ভাবে বিকশিত।

মোটামুটি প্রায় তিনশত পদকর্তা কয়েক হাজার পদ রচনা করেছেন। কিন্তু এই পদ-গানের রীতি অনুসারে কীর্তনীয়া কথা এবং ছন্দোবদ্ধ পদ, দোহা, গান ও আবৃত্তি করেন। আখরে সহজ সুরে নানাভাবে অর্থ বিশ্লেষণ করেন। খানিকটা উচ্চ ধরণের সাংগীতিক অলঙ্কারও প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেন। বিশেষ আকর্ষণীয় হলো কীর্তনীয়ার নটভঙ্গি—নায়িকার অভিনয়ের পূর্ণ প্রকাশ করে নায়ক কৃষ্ণকে মহিমামণ্ডিত করা, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার উভয়ের ক্ষেত্রে নায়িকা রাধার ভূমিকাকে পূর্ণরূপে অভিনয় করা। সমস্তটা মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ করবার দায়িত্ব এ কীর্তনীয়ারই থাকে। নায়িকার নানা ভেদ এবং নায়িকাকে সঙ্গ দানের জন্যে সখী, দূতী, গোপী প্রভৃতির মধুর ভূমিকাও পদকীর্তনে ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। নরোত্তম ঠাকুরের সময় থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ পদাবলীসংগীত-পদ্ধতি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই বিকশিত হয়েছে এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে অষ্টাদশ শতক সংকলনের সময়কাল। নরোত্তম দাসের কৃতিত্বে পদকীর্তনকে রাগ-সংগীতে পরিপুষ্ট করা হয়েছিল। খোল বাদনে ক্রমে ১০৮টি নানা রকমের তাল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। ভক্তি-তত্ত্বের প্রকরণের কেন্দ্র রূপগোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থ এবং জীব গোস্বামীকৃত টীকা। বাংলা গানের অভিনব সৃষ্টি এই পদকীর্তনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই নবদ্বীপ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এখান থেকে প্রভাব বিস্তৃত হয় মণিপুরে। ঠাকুর নরোত্তম যেমন রাগসংগীত মর্যাদায় কীর্তনকে উন্নীত করেছিলেন তেমনি কিছু পদ এবং কতকগুলো গ্রন্থও রচনা করে গিয়েছেন। তিনি আজীবন কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করেন। সবশেষে একথাই বলা দরকার যে চৈতন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, অদ্বৈত গোস্বামী, নরহরি সরকার প্রভৃতি সকলে মিলে নিভৃতে সংকীর্তনের সাধনায় যে নতুন রাগ ও সুরের প্রচলন ও আস্বাদন করেন ঠাকুর নরোত্তম তারই বিধিবদ্ধ প্রয়োগ ও প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন পদাবলী কীর্তনে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হরিদাস স্বামী ঃ তানসেন ঃ নওরসী আদিল

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতের প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয়ার্ধে আকবরের রাজত্বকালে পরিণতি। এই শতক পর্যন্ত বিস্তৃত নানান ধর্মীয় ধারা। ভক্তিধর্মের নানা প্রচার হয় গীতের মাধ্যমে। প্রবল রাগ-সংগীতের প্রভাবে ধর্মীয় সংগীতের স্বাভাবিক স্ফূরণ হয়েছিল।

রাজা মানসিং তোমরের সংগীতের অবদান বজায় ছিল আকবরের সভা পর্যন্ত। গোয়ালিয়র নাম সমগ্র ভাবতে বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করেছে। দিল্লীর চারদিকে, মথুরা-বৃন্দাবন প্রভৃতি এলাকায়, জৌনপুর-গুজরাট অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল নানা সংগীত। এ সব প্রায় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় গান। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা অবশ্য প্রেমের গানের কথাও উল্লেখ করেছেন।

হরিদাস স্বামী (১৪৮০ খৃঃ)ঃ এই শতকের রাগ-সংগীত সম্পর্কে স্বামী হরিদাস ও তানসেনের কথা আসে। হরিদাস স্বামীর কাছে তানসেনের সংগীতের গোড়াপত্তন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কিংবদন্তী। শিষ্য-পরিবৃত হয়ে হরিদাস পথে চলেছিলেন, বালক তানসেন গাছের পেছনে লুকিয়ে থেকে গর্জন করে ওঠেন এবং হরিদাস স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থ এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থই পরবর্তীকালের। কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এসব গ্রন্থ অবলম্বন করে বলেছেন, "হরিদাসের অপ্রাকৃতী ভাবই সংগীত ধারায় বিগলিত হয়ে ভগবৎপদে উৎসৃষ্ট হয়েছিল · শুধু তানসেনই সে অমর সংগীত শ্রবণ ও শিক্ষার অধিকার পেয়েছিলেন· তানসেন শুধু গানই শেখেন নি যৌগিক পন্থাও শিখেছিলেন"...ইত্যাদি। আর একটি প্রচলিত কিংবদন্তী ঃ আকবর বাদশাহ তানসেনের সঙ্গে ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাসের গান শোনেন। আকবর বাদশাহ চক্ষু মুদ্রিত করে গান শুনে অতি-প্রাকৃত অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিলেন। এছাড়া নানা কিংবদন্তী অবলম্বনে হরিদাস স্বামীকে রাজা মানের সঙ্গে সংযুক্ত করা, বৈষ্ণব সাধক রাজ্যে নানাভাবে কয়েকজন হরিদাসের (অর্থাৎ বেশ কয়েকজন হরিদাস নামক ব্যক্তির) খবর বহু সংশয়ের সৃষ্টি করে। এই কয়েকজন হরিদাস স্বামী একই সময়ে বর্তমান

ছিলেন। তাঁদের সকলের রচনা একসঙ্গেই মিশে গিয়েছে। ডাঃ বিমল রায় এসম্পর্কে আলোচনা যুক্তিবদ্ধ ভাবেই করেছেন। একদিকে হরিদাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরিদাস আছেন। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিভাবাপন্ন সাধক মাত্রেই হরিদাস। যে হরিদাস স্বামী বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারীর মন্দির সংস্থাপক, তিনি সখীভাবে সংসার-ত্যাগীদের সংগে নৃত্যগীতে ব্যাপৃত থাকতেন। এই হরিদাস স্বামী কি ধ্রুপদ রচয়িতা ও শিক্ষাদাতা? অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধক এবং কলাবন্ত কি অভিন্ন? কলাবন্ত শব্দটি সমসাময়িক আবুল ফজল বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "বর্তমানে সুপরিচিত। এঁরা ধ্রুপদ গান করেন।"

হরিদাস স্বামী কি একাধারে বৈষ্ণব সাধক এবং ধ্রুপদী ছিলেন? সবদিক থেকে বিবেচনা করে যাঁরা প্রসঙ্গটি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। হরিদাস স্বামী নিজ মন্দিরে ভক্তি ভাবের গান করতেন, বিশেষ করে 'বিষেণপদ' বা 'বিষ্ণুপদ' গান, একথাটি ঠিক হওয়াই স্বাভাবিক। গায়ক ও সাধক এ দুয়ের পন্থা স্বতন্ত্র। কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের পথ—কলাসমন্বিত সাধনার রীতি অবলম্বন করা। এজন্যেই বিষ্ণুপদ গানের উদ্ভব সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া মধ্য যুগের বৈষ্ণব সাধকদের গানের রীতি ও লৌকিক গান এ কথা প্রমাণ করে। হরিদাস স্বামীর মধ্যে উচ্চস্তরের সংগীত সাধনার অভিব্যক্তি হয়েছিল। তাই রূপক-প্রবন্ধ ও চর্চরি তালের সংযোগে বিষ্ণুপদ গানকে হয়ত তিনি আহ্লাদসূচক ধমারে পরিণত করেন। সাধারণতঃ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদই বিরহ গানের মধ্যে প্রবল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাধা হ্লাদিনী শক্তির প্রতিরূপ। অতএব ধমার এই সূত্রেই এসে থাকবে। ধমারে আহ্লাদসূচক ভাবেরই আঙ্গিকগত বিকাশ ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে হয়েছিল বলে মনে হয়।

হরিদাস স্বামী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বাস করতেন। আজীবন ব্রহ্মচারী। কিন্তু হরিদাসজীর পদ ও বাণী যা কিছু পাওয়া যায় সবই সংমিশ্রিত। কিছু হরিদাসী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের রচনা। তানসেনের গুরু হরিদাস সম্বন্ধে যে কথা প্রচলিত আছে তার মধ্যে একথা জানা যায় যে হরিদাস স্বামী প্রাচীন সালগ সূড় শ্রেণীর ধ্রুব প্রবন্ধ প্রকরণে কতকগুলো রাগের প্রচলন করেন ও নতুন রীতির সন্ধান দেন। রাগ সংগীতের এই আঙ্গিক সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই হরিদাস স্বামীকে যুক্ত করা যায়। হরিদাস স্বামী যদি আকবরের প্রথম যুগের রাজত্ব পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তবে তাঁর ষোড়শ শতকের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করা দরকার। অর্থাৎ ১৫৭৫ যদি হরিদাস

স্বামীর তিরোধান ধরা যায় তা হলেই এ প্রশ্ন আসে। তানসেনের তিরোধান ১৫৮৫ খৃঃ (৮০ বছর বয়সে)। কিংবদন্তী অনুসারে বাল্যকালে স্বামীজীর সঙ্গে তানসেনের সাক্ষাৎ। সবটা নিয়ে বহু সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় বেশ কয়েকজন হরিদাস নামক সাধক ব্যক্তির সঙ্গে 'হরিদাস চতুর্বেদী' নামটি সংমিশ্রিত। প্রবাদ আছে এই চতুর্বেদী হরিদাসের কাছেও তানসেন যৌবনকালে সংগীত শিক্ষা করেন। কিন্তু এসম্বন্ধে বিচার হয়নি। সংগীতের দিক থেকে হরিদাস স্বামীর দান যে ভাবেই বলা হোক না কেন, শুধু কিংবদন্তী-নির্ভর অথবা মিশ্রিত পদ নিয়ে পরবর্তী কালের আকবর-হরিদাসের দুটো চিত্র অবলম্বন করে ইতিহাস সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। যদি হরিদাস স্বামী ধর্মীয় সাধক পরমবৈষ্ণব হয়ে থাকেন তা হলেই তিনি আহ্লাদ-সূচক আনন্দের ভাব-সম্পৃক্ত ধমার গান সৃষ্টি করে থাকবেন—একথাও যুক্তিবদ্ধ ভাবে আলোচনা করা দরকার। তবু বলতে হবে ধমারে পরিণত করা গান অর্থাৎ (বিষ্ণুপদ গানে রূপক ও চর্চ্চরী তালের বিকাশ সাধন করে) ধামারের গোড়াপত্তন করার সাংগীতিক কৃতিত্ব হরিদাস স্বামীরই। কিভাবে তা তানসেনের কাছে পৌঁছেছিল—হরিদাস স্বামী থেকে অথবা তদীয় শিষ্য বেওয়ার হরিদাসের কাছ থেকে? প্রশ্নটা স্বতন্ত্র

তানসেন: রাজা মানের পরবর্তী যুগে তানসেনের কথা ওঠে—ধ্রুপদ নতুন রীতিতে গীতিবদ্ধ করা ও প্রচার করা ও দেবনিন্দিত কণ্ঠে গান করা, রাগ সৃষ্টি ও নতুন রচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে। তাছাড়া তানসেনের আর একটি কাজ বিপুল সংখ্যক পুত্র-শিষ্য শ্রেণীর মধ্য দিয়ে গান ছড়িয়ে দেওয়া। তানসেনের সময়ে ধ্রুপদ কে বা কারা গান করতেন? আবুল ফজলের বর্ণনায় 'কলাবন্ত'রা তখন গায়ক ছিলেন। তাছাড়া 'হুড়ুক্কু' বা 'আওয়াজ' নামে যন্ত্রের সঙ্গে পুরুষেরা ধ্রুপদ ও তজ্জাতীয় গান করতেন। ঢাড়ীশ্রেণীর অন্তর্গত স্ত্রীলোক দফ ও ডুহল বাজিয়ে ধ্রুপদ গান করতেন। (ঢাড়ী=বাদ্য। এ বাদ্য বাজিয়ে পাঞ্জাবে পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে একপ্রকার গান করতেন।) গানের শ্রেণী বর্ণনা এবং শাস্ত্রীয় সংগীত বর্ণনায় আবুল ফজল পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়েছিলেন। খবরগুলোও সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। তবু তানসেনের যুগের গানের পরিচয় নানা ভাবেই মিলে। ধ্রুপদ গান অনেক ক্ষেত্রে কৌশল ও

কলাসমন্বিত রূপের অপেক্ষা করে নি। রাজা মানের সময়ে যা হয়েছিল, তানসেনের সময়ে তা আরো নতুন ভাবে রীতিবদ্ধ হয়েছিল।

তানসেনের গোড়ার জীবনের কথা নানাভাবে সংশয়মূলক। কি ভাবে তিনি ধ্রুপদ স্রষ্টা হলেন? হরিদাস স্বামীর কাছে কি শিখেছেন? না কি, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ পেয়েছেন। তানসেনের অন্যান্য শিক্ষক কারা ছিলেন? তানসেন বেশি বয়সে বা অত্যন্ত পরিণত বয়সে আকবরের সভায় এসেছিলেন। যদি ষাট বছর বয়স নাগাৎ এসে থাকেন তা হলে তাঁর পূর্বের জীবন—অর্থাৎ, দীর্ঘকাল অনুশীলন, শিক্ষা ও কলাবন্ত-জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারেই নির্বাক। জন্মকাল সম্বন্ধে বহু রকমের ধারণা চলিত আছে— ৪৯০, ১৫০১, ১৫০৫-৬, ১৫১৬, ১৫২০, ইত্যাদি। আকবরের সভায় তানসেন যখন এসেছিলেন তখন তাঁর পুত্রেরা সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক। এঁরা আকবরের সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণ গৃহীত ধারণা জন্ম: ১৫০৫-৬। ডাঃ বিমল রায় বলেন ১৫১৬ খৃঃ। যুক্তি, তানসেন ষাট বছর বয়স নাগাৎ আকবরের সভায় যোগদান করেন এবং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী রচনার সময় ১৫৮০ (?) এবং তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ জাহাঙ্গীরের সভায় যদি ৬০ বছরের কম বয়সে এসে থাকেন তাহলে ১৫১৬ (?) হওয়া বিধেয়। আমরা মোটামুটি ১৫৮৫ মৃত্যুকাল ধরে ১৫০৬ জন্মকাল গ্রহণ করতে পারি।

তানসেন গোয়ালিয়র-বাসী মকরন্দ পাণ্ডের পুত্র 'রামতনু' বা 'তন্না'। নাম নিয়েও সমস্যা। ছেলেবেলা থেকে বোধ হয় সাংগীতিক নাম তানসেনই প্রচলিত। ছেলেবেলায় গোয়ালিয়রেই সংগীত শিক্ষা করেন। তানসেনের গুরু কে? কিংবদন্তীতে মহম্মদ গৌসের সঙ্গে সম্পর্কের উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পর সমাধি দেওয়া হয় মহম্মদ গৌসের সমাধির কাছে। মহম্মদ গৌসের নামে দুটো সংগীত গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কাজেই সংগীত শিক্ষা কি সুফী মহম্মদ গৌসের কাছে? না কি নায়ক বখসুর কাছে? আমরা ছেলেবেলার শিক্ষার মূলে এ দুজনকেই দাঁড় করাতে চাই। কারণ সুফী সন্ত অভিভাবক হিসেবে তানসেনকে সংগীত-নায়কের কাছেও দিতে পারেন। তানসেনের প্রথম জীবনেই গোয়ালিয়রের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। তানসেন হরিদাসের সন্ধান পান, অবশেষে রেওয়া-তে আসেন। অর্থাৎ হরিদাস স্বামীর কাছে যদি গিয়েও থাকেন, তিনি অবশেষে আসেন স্বামীজির শিষ্য রেওয়ার হরিদাসের কাছে। গোয়ালিয়রে তিনি শিখেছিলেন মানের ধ্রুপদ

পদ্ধতি। রেওয়ার হরিদাসের কাছে শেখেন বিশুদ্ধ প্রবন্ধের রীতি। দুটোর অভিনব সমন্বয় করেন। রেওয়া রাজ্যে হরিদাসের পর সভাগায়ক হন। বাঘেলখণ্ডের রাজা রামচন্দ্র বাঘেলার দরবার থেকে তানসেন ১৫৬০ বা মতান্তরে ১৫৬৮ খৃঃএ আকবরের দরবারে আসেন। তারপর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও রচয়িতা। প্রতিদিন গান রচনা এবং নতুন পদ্ধতির চিন্তায় ব্রতী। ফকিরুল্লাহ্ বলেছেন, আকবরশাহী জমানায় গায়কেরা আকছার 'আতাঈ' হতেন। প্রয়োগের দিক থেকে যাদের কায়দা ওস্তাদদের মত কিন্তু জ্ঞান-সমৃদ্ধ নয়, তারাই 'আতাঈ'। ডাঃ বিমল রায়ের সমর্থন অবশ্য 'কিতাব-ঈ-নওরস' গ্রন্থের উল্লেখে। এখানে আতাঈর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট গায়ক। কিন্তু এ অর্থ বর্তমানে গ্রাহ্য নয়।

তানসেনের সম্বন্ধে সে সময়ে ও পরে বহু বিরুদ্ধ মত ছিল। তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তানসেনেব নব সৃজনীশক্তি অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। অন্ততঃ ফকিরুল্লাহ্ তানসেনের শক্তিকে স্বীকার করলেও, গায়কী সম্বন্ধে তেমন উল্লসিত ছিলেন না। তিনি বলেন রাজা মানের সময়ে যেরূপ সেরা গায়ক ছিলেন একপ আব কখনো হয়নি। তানসেনেব নতুনত্ব এবং মৌলিক সৃষ্টি-প্রবণতা কি এই মতেব জন্যে দায়ী? তানসেনের শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতির আলাপ-স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ গান, স্বরের বৈচিত্র্য (৮।৯ স্বর ব্যবহার), কানাড়া-মল্লার-সারং-কল্যাণ-টোড়ী প্রভৃতি পর্যায়ে নতুন রাগ সৃষ্টি, দীপক রাগের নতুন রূপদান ইত্যাদি নতুন চমৎকারিত্ব সৃষ্টির কথাই বলে। নবস্রষ্টা সব সময়ে প্রচলিত পথে বিচরণ করেন না, একথা সকলে জানেন।

তানসেনের উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিকতা অনস্বীকার্য। রবাব যন্ত্রকে তানসেন নতুন ভাবে ব্যবহার করতেন। বিষয়বস্তু হিসেবে তানসেনের গানে বহু বৈচিত্র্য—দেবতা ও সূফীসন্তদের স্তুতি, রাজপ্রশংসা, নাদ সম্বন্ধে মতামত, রাগরাগিণীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ, নায়িকাভেদ ও নায়িকা বর্ণনা, কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, মানসিক গুণ, ঋতু ইত্যাদি বহু উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ভাষা-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। মিঞা-কী এবং দববারী নামোল্লেখে তানসেনের রচনা বোঝায়, অর্থাৎ এসকল তানসেনের রচিত রাগ—দরবারী কানাড়া, দরবারী কল্যাণ, দরবারী তোড়ী, মিঞা-কী মল্লার, মিঞা-কী সারং মিঞা-কী জয়জয়ন্তী ইত্যাদি। তানসেন 'রাগমালা' ও 'সংগীতসার' এ দুটো গ্রন্থ লিখেছিলেন।

তাছাড়া আকবরের সম্পাদনায় 'রাগসাগর' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

তানসেনের চার পুত্রের মধ্যে তান-তরঙ্গ ও বিলাস খাঁ আকবরের সভায় ছিলেন। পুত্র সুরৎ সেন ছিলেন পণ্ডিত হিসেবে। শরৎ সেনের কথা তেমন ভাবে কোথাও নেই। বিলাস খাঁ (কনিষ্ঠ পুত্র) জাহাঙ্গীরের সভা পর্যন্ত বজায় ছিলেন। তিনি প্রকৃতিতে উদাসী, রবাব ও বীণা-বাদক ছিলেন। তাঁর গান সম্বন্ধে তেমন না জানা গেলেও রচয়িতা হিসেবে বিলাসখানী তোড়ী রাগ এবং গান রচনার দ্বারা বিশেষ পরিচিত। তানসেনের কন্যা সরস্বতী সম্বন্ধে কিংবদন্তী যথেষ্ট প্রচারিত। মোঘলযুগের ঐতিহাসিকদের বা লেখকদের রচনায় সরস্বতী সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ মিলে না। সম-সাময়িক বীণকার মিশ্রি সিং (বা পরবর্তী নবাৎ খাঁ)-এর সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহ হয়। মিশ্রি সিং বীণে তানসেনের সহকারী সংগীতকার, দক্ষতায় অতুলনীয় বাদক ছিলেন। দুয়ের সমন্বয়ে সংগীত হত। নবাৎ খাঁ সম্বন্ধেও বহু গল্প প্রচলিত। তিনি গোড়ায় সিংহল-গড়ের রাজা ছিলেন—সমোখন সিং-এর পুত্র অথবা নিজেই সমোখন সিং। এঁর কন্যাবংশে পরবর্তীকালে (ন্যামৎ খাঁ) সদারঙ্গের জন্ম। প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে (পুত্রও হওয়া সম্ভব) তানতরঙ্গ এবং মানতরঙ্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তানসেনের শিষ্যমণ্ডলীর নাম: খোদাবখস, মসনদ আলী, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, মামুদ খাঁ, সুন্দীবর খাঁ, চাঁদ খাঁ, সুরা খাঁ, রমজান খাঁ, লাল খাঁ, নিজাম খাঁ, শোভা খাঁ, বীরমণ্ডল, সলিল খাঁ, চঞ্চল শশী, ভীমরাও, তাজ বাহাদুর, ভগবান দাস, চণ্ডলাল, দেবীলাল (রামদাস ও সুরদাস?)—মতান্তরে আকবরের সভায় রামদাসের স্থান ছিল তানসেনের পরে—সমকক্ষ রূপে।

এ সম্পর্কে বলা যায়, আবুল ফজল এই সব উৎকৃষ্ট সংগীতজ্ঞের নাম করেছেন:—রামদাস, সুরদাস, চরজু, রাগসেন, চাঁদ খাঁ, মিঞা লাল, সরোদ খাঁ, সুভান খাঁ, বিচিত্র খাঁ, শ্রীজ্ঞান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বাজ বাহাদুর, তান তরঙ্গ, পরবীন খাঁ, সুলতান হাফিজ হুসেন, হাফিজ খাজা আলী, রহমৎউল্লা, মহম্মদ খাঁ ধাড়ী, দাউদ ধাড়ী, মোল্লা ইশাক ধাড়ী, পীরজাদা, বীর মণ্ডল খাঁ, শিহার খাঁ, কাসিম, তাশ বেগ, মীর আবদুল্লা, উস্তা দোস্ত, শেল দাওন ধাড়ী, উস্তা ইউসফ, সুলতান হাশিম, উস্তা মহম্মদ অগীন, উস্তা মহম্মদ হুসেন, উস্তা শা মহম্মদ, বয়রম কুলী, মীর সৈয়দ আলী, মহাপাত্র ইত্যাদি।

তানসেনের সময়ের যে কয়েকজন কলাবন্ত সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন তার মধ্যে বাজ বাহাদুর বিশেষ স্বীকৃত। আবুল ফজল বাজ বাহাদুরের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে বলেছেন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি মালবের শাসক ছিলেন, কিন্তু ১৫৭২-এ রাজ্য হারিয়ে আকবরের সভায় যোগদান করেন। বাজ বাহাদুরের গান কতকটা খেয়াল প্রকৃতির অনুসারী ছিল বলে প্রবাদ, কিন্তু ধ্রুপদই ছিল। সম্ভবত গুজরাটে শিক্ষা। বদাওনীর বচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে বাজ বাহাদুর ও তানসেন দুজনে মুহম্মদ আদিলশাহ্'র শিষ্য ও সমকক্ষ ছিলেন। রামদাসের সুকণ্ঠের কথা তিনিই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বলেছেন, আকবরের প্রতিযোগিতা ব্যবস্থায় সেখ বন্ধু তানসেনেরও অগ্রগামী হয়ে সংগীতের জন্যে হাজার মুদ্রা লাভ করেছিলেন। আকবরের সভা-গায়কদের মধ্যে রামদাস (যিনি পূর্বে গোয়ালিয়রে শিক্ষালাভ করেন এবং ইসলাম শার দরবারে ছিলেন) এবং সুরদাস এই দুজনাই তাঁদের নামে মল্লার ও সারং রাগ সৃষ্টি করে প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

বাজ বাহাদুর ছাড়া চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁ এ দুটো নাম তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু এর মূলে কোন যুক্তি স্পষ্ট নয়। এদের রীতি খয়রাবাদী বলে প্রসিদ্ধি আছে। ধ্রুপদের মিশ্রণে পাঞ্জাবী খয়রাবাদী খেয়ালের মূলে এই রীতি রয়েছে কিনা সঠিক বলা যায় না।

ফকিরুল্লাহ্ বলেছেন জগন্নাথ কবিরায় সম্বন্ধে—তানসেনের পর এত দক্ষতা আর কারুর ছিল না। তানসেন নাকি তাঁর নট রাগের গান শুনে বলেছিলেন, "সংগীতে আমার পরে এ আমার মত হবে।" কবিরায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন। কবিরায় সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে। ইনি শাহজাহানের দরবারে বৃদ্ধ বয়সে উচ্চপদ পেয়ে 'কবিরায়' উপাধি নিয়েছিলেন। শত বৎসব বাঁচেন, মৃত্যু—১৬৬০ খৃঃ।

সংগীতের দিক থেকে ধ্রুপদের চারটি রীতির কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কখন কি ভাবে এই সব রীতি বা বাণী উদ্ভাবিত হয়েছিল এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বাণী সম্বন্ধে বলা হয়: (১) গুবরহার বা গওহারী বাণী—তানসেনের উদ্ভাবিত, (২) খাণ্ডার বাণী—নবাৎ খাঁ (?), (৩) ডাগরবাণী (করম ইমামের মতে) বৃজচন্দ্র বা মতান্তরে হরিদাস ডাগর এবং (৪) নওহার-বাণী—শ্রীচন্দ্র বা মতান্তরে সুভান খান নওহার উদ্ভাবন করেন। কেহ কেহ বাণীর মূলে যথাক্রমে রস আরোপ করেন: (১) শান্ত ও ধীরগতি, (২) তীব্র ও

দ্রুততর, (৩) সহজ, সরল, লালিত্যপূর্ণ এবং (৪) অদ্ভুত রসোদ্দীপক। বলা যেতে পারে এই বাণীর নামগুলো অনেকটা আঞ্চলিক নামেরই প্রতিরূপ, কোন বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। প্রয়োগ বিধিই উদ্ভাবিত বলা যায়। বর্তমানে এমন কি কোন কোন ঘরানা এই সব বাণীর উদ্ভাবন দাবী করেন। অল্প বিস্তর এই সকল ভঙ্গি ও রস অধিকাংশ ধ্রুপদে সংমিশ্রিত হয়। বহু অনুসন্ধান ও সংগ্রহ বিশ্লেষণের পর পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন, "পরন্তু য়হী কহনা পড়ে যা কি আজকল ইস চারোঁ বাণীয়োঁ কী স্বতন্ত্র ধ্রুপদেঁ সুনাই নহীঁ দেতী।"

বিজাপুরের **নওরসী** সংগীত-সাধক **ইব্রাহিম আদিল শা** (সুলতান, ১৫৭৯—১৬২৬) যে গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন "নওরস-ই-আদিল" তা আকবরের যুগের সংগীতরূপের আর একটি বিশিষ্ট দিক উদ্ঘাটন করে। রস-তত্ত্বকে জীবনের সংগীত-সাধনায় প্রয়োগ করে আদিল শা বুঝিয়ে দিয়েছেন আকবরের সংগীত-প্রীতির সম্পর্ক। আকবরের বিপুল শক্তি, সমৃদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার ফলে সংগীতকে নিজের কাজে ও প্রচারে প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাতে সংগীতজ্ঞেরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সংগীত-পরিচর্যা করে একটি যুগসৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মৌলিক সংগীত-প্রাণ যে এই আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে, নওরসী আদিল তা প্রমাণিত করেছেন। তিন ধাতুর অসংখ্য ধ্রুপদ রচনা এই গ্রন্থে বিধৃত। নওরস কথাটি নবরস থেকে সৃষ্ট হলেও পরে বহু ভাবেই বহু স্থলে তিনি মঙ্গলসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি কবি, সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী ছিলেন। নওরস শব্দটিকে নাম রূপেও ব্যবহার করেছেন। গানের মধ্যে ছিল সৌন্দর্য বর্ণনা, রাগবর্ণনা, প্রকৃতি ও প্রেম, ভক্ত কবির প্রেম বর্ণনা প্রভৃতি বহু বিষয়। উত্তর ভারতীয় ১৫টি রাগে ৫৭টি গানের (৫৯এর মধ্যে) রচনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কানাড়া রাগ সবচেয়ে প্রিয়, পরে নওরসী-কানাড়া নামে পরিচিত হয়। পৌরাণিক বিষয়ে আদিল শাহের মন অত্যন্ত মুক্ত ছিল। সংগীত-শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। বোধহয় আশাবরী, কেদার, রামক্রী, কানাড়া প্রভৃতি রাগে তিনিই প্রথম লক্ষণগীত রচয়িতা। ভৈরব রাগের কল্পনায় শিবের রূপ, গৌরী কল্পনায় সুনয়নী ব্রাহ্মণী ইত্যাদি রাগের ধ্যানীরূপের সম্পর্কে আর একটি দিক উদ্ঘাটিত করে। রচনা অনেকটা দক্ষিণী হিন্দীতে। গ্রন্থ থেকে কিছু বাদ্যযন্ত্রের পরিচয়ও মিলে। সব থেকে আদিল শাহের বৈশিষ্ট্য সংগীতের প্রাণময় স্বরূপ, যা আকবরের মধ্যে ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলে, মহারাষ্ট্র এলাকায় ধ্রুপদগানের প্রচারের এই প্রথম উদাহরণ।

ক্ষেত্রজ্ঞ (১৬২৩-১৬৭২) : কর্ণাটক ভক্তি-মূলক দাসকূট গানের সূত্রে যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়, তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষ স্মরণীয়। ইনি বিশিষ্ট পদম্ রচয়িতা। কর্ণাটক সংগীতের এটি একটি মনোমুগ্ধকর শ্রেণী। এই গানের বিশেষ প্রত্যক্ষ সাংগীতিক রূপ আছে। এই গান ভরত নাট্যম্-এর নৃত্যের সংগে সম্পর্কিত। ভরত নাট্যম্-এ আছে: প্রথম ভাগে—১। আলরিপু, ২। জাতিস্বর, ৩। শব্দম্, ৪। বর্ণম্ এবং দ্বিতীয় ভাগে পদম্। মুখে পদমের অভিনয় চলে গানের সঙ্গে। ক্ষেত্রজ্ঞের অধিকাংশ রচনা তেলেগুতে। কর্ণাটক রাগসংগীতকে তিনি বিশেষ প্রভাবিত করেন। অন্ধ্রতে কৃষ্ণানদীর তীরে বসবাস করতেন। গ্রামটি ভরত নাট্যমের কেন্দ্র কুচিপুড়ি থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত, তেলেগু সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার-শাস্ত্র, সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ে পারদর্শিতা লাভ করে তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের সভায় যান। ক্ষেত্রজ্ঞ ২০০০ পদ রচনা করে গান করেছিলেন। ১৫০০ পদ গোলকুণ্ডার আব্দুল্লাহ্ কুতুবশার অনুরোধে রচিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ নামটি ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। ক্ষেত্রজ্ঞের পদের ভাগ: নায়ক, নায়িকা, সখী, দূতী। সাহিত্য, সংগীত ও ভাবের দিক থেকে পুরন্দর দাসের রচনার সংগে মিল আছে। ধীর লয়, ত্রিপুটা তাল এবং ৩৯টি রক্তি রাগ ব্যবহার ও বিস্তারের সুযোগদানের জন্যে তিনি খ্যাত। বহু সংখ্যক পদমের মধ্যে ৩৩০টি সংগৃহীত ও ছাপা পাওয়া যায়। এর মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটি গায়কেরা ব্যবহার করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেল, ঠাট ও রাগের শ্রেণীবিভাগ

গ্রন্থ সংগীত—(ক) রামমাত্য : স্বরমেল কলানিধি, সোমনাথ পণ্ডিত : রাগ বিবোধ ; বেঙ্কটমুখী : চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকী শ্রীকণ্ঠ : রসকৌমুদী।

(খ) পুণ্ডরীক বিট্ঠল : সদ্‌রাগ চন্দ্রোদয় ও অন্যান্য ; লোচন পণ্ডিত : রাগ-তরঙ্গিণী ; অহোবল : সংগীত পারিজাত ; হৃদয়নারায়ণ দেব : হৃদয় কৌতুক, হৃদয় প্রকাশ ; শ্রীনিবাস : রাগতত্ত্ব বিবোধ, ভাবভট্ট : অনূপসংগীত বিলাস ও অন্যান্য।

এবারে ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ করে মধ্য যুগের সংগীত-তত্ত্বের নানা পর্যায়ের আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে। এখানেই বর্তমান ভারতীয় সংগীতের মূল উৎস। যদিও প্রাচীন যুগ থেকেই ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে, প্রাচীন এখান থেকেই নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আসলে রাগের অভিব্যক্তি, রাগের গঠন, স্বর সংযোজনার ভিত্তি—এ সব নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত। রাগের প্রাচীন নামগুলো বর্তমান, হয়ত রূপও অনেক স্থলে কিছু ঠিক আছে। কিন্তু শ্রেণী-বিভাগ করলে দেখা যায়, প্রকৃতি বদলে গেছে, নতুন ভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে, নতুনের সঙ্গে মিশেছে, রচনাপদ্ধতির গঠন বদলে গেছে। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন হয়েছে? কোথায় হয়েছে? সে সব খবর আমরা কতকগুলো গ্রন্থ বিশ্লেষণ করলেই পেতে পারি। এগুলো সবই সংগীত-তত্ত্বের গ্রন্থ। একালের সংগীত উপাদানের বিশ্লেষণ এসব গ্রন্থে আছে বলেই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে "A comparative study of some of the leading music systems of the 15th, 16th and 17th centuries" নিবন্ধে এগুলোকে বলেছেন—"**গ্রন্থ সংগীত**"। অর্থাৎ এ যুগের সংগীতের ব্যাখ্যা এ সব গ্রন্থ অবলম্বন করেই দাঁড়ায়। এই গ্রন্থগুলোতে আছে রাগের শ্রেণী-বিভাগের নানা পদ্ধতির উদ্ভবের কথা। সেই সংগে প্রশ্ন জাগে কি ভাবে ঠাট বা মেল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে? উত্তর ভারতে (হিন্দুস্থানী সংগীতে) এবং দক্ষিণ ভারতে (কর্ণাটক সংগীতে) কি ভাবে স্বতন্ত্র পথ বাঁধা হয়েছে? অর্থাৎ তত্ত্বের দিক

থেকে এ যুগটি এমন একটি ধাপ—যেখান থেকে যেন সংগীতের তাত্ত্বিক ইতিহাস অনুধাবন নতুন ভাবে সুরু করা হচ্ছে।

সে যুগের গ্রন্থগুলোকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দুই সারিতে ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছেন—উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়। উদ্দেশ্য, রাগের গঠন-প্রকৃতির ইতিহাস বুঝে নেওয়া; দ্বিতীয়, উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) সংগীতে ঠাট পদ্ধতি অবলম্বন করে রাগ শ্রেণীবদ্ধ করা। আমরা জানি, এ সময়ে উত্তর ভারতীয় সংগীতে এসেছে নানা প্রভাব: নানা দেশী রাগ, হনুমন্ত মতের প্রাবল্য, রাগের ধ্যানরূপের প্রভাব প্রভৃতি লক্ষণগুলি এবং সেই সঙ্গে শ্রুতি, মূর্ছনা ইত্যাদির ধারণাগুলো মিলে স্বরপ্রকরণ ও ঠাট অনুসারে রাগ ব্যাখ্যার চেষ্টাও চলেছে। মনে রাখা দরকার যে ইতিহাসের দিক থেকে আমরা এখানে হুমায়ুনের রাজত্বের শেষ সময় থেকে আরম্ভ করে আউরঙ্গজেবের সময়-কাল পর্যন্ত লক্ষ্য করছি। এ সময়ের মধ্যে মুঘল যুগের লেখকদেরও বিশেষ স্থান, এঁরা হলেন বদাওনী, আবুল ফজল, ইব্রাহিম আদিল শাহ, আবুল হামিদ লাহোরী, ফকিরুল্লাহ্, মীর্জা খাঁ প্রভৃতি।

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও তাঞ্জোরকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাতে নতুন নিয়ম-পদ্ধতির সৃষ্টি। এই অনুসারে দুই শ্রেণীর লেখক ও সংগীত গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করতে পারি: ক।(১) রামমাত্য: স্বরমেল কলানিধি, (২) সোমনাথ: রাগ বিবোধ, (৩) বেঙ্কটমখী: চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ, খ। (৪) পুণ্ডরীক বিট্ঠল: সদ্‌রাগ চন্দ্রোদয় ও অন্যান্য গ্রন্থ, (৫) লোচন পণ্ডিত: রাগতরঙ্গিণী, (৬) অহোবল: সংগীত পারিজাত, (৭) হৃদয় নারায়ণ দেব: হৃদয় কৌতুক ও হৃদয় প্রকাশ, (৮) ভাবভট্ট: অনূপ সংগীত বিলাস, অনূপ রত্নাকর, (৯) শ্রীনিবাস: রাগ-তত্ত্ব বিবোধ এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

এই গ্রন্থগুলোতে আলোচিত সংগীত-পদ্ধতির বিচারে নানাভাবে স্বর-প্রয়োগের কথা আসে এবং সেই প্রসঙ্গে এর সঙ্গে শ্রুতিও সম্পর্কিত। যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় রাগ নির্ধারণে সাধারণতঃ ৭ স্বর এবং এই ৭টির বিকৃত বা কোমলের নানান আরোহী-অবরোহী রূপ আলোচিত হয়, এ সম্বন্ধেই প্রথমে বলা দরকার। আজকাল শুদ্ধ স্কেলের স্বর বলতে আমরা বুঝি—স র গ ম প ধ ন অর্থাৎ বিলাবল ঠাট। এর সঙ্গে আরো পাঁচটি বিকৃত স্বর—ঋ জ্ঞ হ্ম দ ণ যোগে সম্পূর্ণ সপ্তকে দাঁড়ায় ১২টি স্বর—স ঋ র জ্ঞ গ ম হ্ম প দ ধ ণ ন

অর্থাৎ, কোমল বা বিকৃত স্বর আর শুদ্ধ স্বরনাম—তীব্র। প্রাচীন বা মধ্য-যুগের শুদ্ধ স্কেল বলতে ৭টি শুদ্ধ স্বর, যা দাঁড়ায়—**স র জ্ঞ ম প ধ ণ**—অর্থাৎ বর্তমান কাফি ঠাট। সে যুগের এই শুদ্ধ স্কেলে (বা বর্তমান কাফি ঠাট) কোমল বা বিকৃত স্বরগুলোর স্থান কিভাবে নির্ধারিত হত বা স্বরগুলো রাগের আরোহী-অবরোহী ক্রমে কি ভাবে সাজানো হত এটাই প্রধান প্রশ্ন। এর ওপর নির্ভর করে রাগ গঠন ও শ্রেণী বিভাগ। প্রাচীন যুগ থেকে এই স্বর নির্ধারণের ভিত্তি 'শ্রুতি' এবং স্বর নির্ধারণের পর রাগ গঠন নির্ভর করত মূর্ছনার ওপর।

প্রাচীন যুগে ছিল তিনটি সপ্তক (মন্দ্র, মধ্য, তার—এই তিন স্থান) এবং ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম। গান্ধার গ্রাম গান্ধর্ব যুগেই অপ্রচলিত। এর মধ্যে ভরতের সময়ে দুটো স্কেল প্রচলিত—ষড়জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। এই দুটো গ্রামে ৭ স্বরের উত্থান পতন নিয়ে ৭টি করে মূর্ছনা, যথা, ষড়জ গ্রামে **স** থেকে আরম্ভ করে অবরোহী ক্রমে ৭টি মূর্ছনা। ষড়জ গ্রাম : ১। উত্তর মন্দ্রা (**স-র-জ্ঞ ম-প-ধ-ণ | ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স**), ২। রজনী (**ণ-স-র জ্ঞ-ম-প-ধ | ধ-প ম-জ্ঞ র-স-ণ**), ৩। উত্তরায়তা (**ধ্** থেকে), ৪। শুদ্ধ ষড়জা (**প্** থেকে) ৫। মৎসরী কৃতা (**ম্** থেকে), ৬। অশ্বক্রান্তা (**জ্ঞ্** থেকে) এবং ৭। অভিরুদ্গতা (**র্-গ্ ম্-প্-ধ্-ণ্-স | স-ণ-ধ্-প্-ম্-জ্ঞ্-র্**)। অন্যদিকে মধ্যম গ্রাম : ১। সৌবীরী (**ম-প-ধ-ণ-র্স-র্র-র্জ্ঞ | র্জ্ঞ-র্র-র্স-ণ-ধ-প-ম**), ২। হরিণাশ্বা (**জ্ঞ** থেকে), ৩। কলোপণতা (**র** থেকে), ৪। শুদ্ধ মধ্যা (**স** থেকে), ৫। মার্গী (**ণ্** থেকে), ৬। পৌরবী (**ধ্** থেকে), ৭। হৃষ্যকা (**প্-ধ্-ণ্-স-র-জ্ঞ ম | ম-জ্ঞ-র-স-ণ্-ধ্-প্**)।

মূর্ছনা প্রসঙ্গটি অনেক ক্ষেত্রে মধ্য যুগেই বর্জিত হয়েছে। ঐ শব্দটি (মূর্ছনা) অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু শ্রুতিগুলো সাজিয়ে কি ভাবে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন রূপে বিকৃত ও কোমল স্বরগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সেই সাজানোর ফলে কি ভাবে রাগ পরিচয় দিয়েছেন—বোঝা দরকার।

শ্রুতি বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম স্বর—বারোটি স্বরের একটি সপ্তককে ২২টি ভাগে ভাগ করলে যা দাঁড়ায়। এর মধ্যে ৭টি শুদ্ধ বা প্রধান স্বর (৭টি শ্রুতি) কতটা দূরত্বে দাঁড়াবে—সেই নিয়মই শ্রুতির প্রথম দিক। এ নিয়মে **স** থেকে **ন** পর্যন্ত ৭টি শুদ্ধ স্বরকে ৪+৩+২+৪+৪+৩+২ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

শ্রুতির ভাগগুলো আনুমানিক ভাগ, একটি শ্রুতি থেকে অন্য শ্রুতি বা এক স্বর থেকে পরবর্তী স্বরে যে হিসেবের সমতা রক্ষা হচ্ছে একথা বলা চলে না। তাই মতভেদও যথেষ্ট। আবার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ভাইব্রেশনের (বা তরঙ্গের) সংখ্যা নিরূপণ করেও আধুনিক বিশ্লেষণ করা হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বর সাতটিকে প্রতি ভাগের প্রথমে স্থাপন করা হবে, না কি, প্রতি ভাগের শেষে স্থাপন করা হবে? যথা **স** স্বরটি ১নং শ্রুতিতে না কি ৪ নং শ্রুতিতে নির্ধারিত হবে? মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রতি স্বর, শ্রুতি ভাগগুলোর শেষেই নির্ধারিত হয়েছে; তাতেই শুদ্ধ স্বর বর্তমান কাফি ঠাটের সঙ্গে মিলে। তবু প্রাচীন ষড়জ-মধ্যম-গান্ধার গ্রামের ক্ষেত্রে ৭টি স্বরের সাজানো বিষয়ে তারতম্য হয়। বর্তমান যুগে উত্তর ভারতে আমরা যে স্বর-স্থান মানি তা হচ্ছে প্রতি স্বরকে প্রতি ভাগের প্রথমে স্থাপন।

শ্রুতিগুলোকে পাবার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল তা হচ্ছে দুটো সম-দৈর্ঘ্যের বীণায় প্রথমে একটিকে এক সুরে বেঁধে, তারপর অন্য বীণায় একসুরে বেঁধে প্রধান তারটি একটু (এক শ্রুতি) নামিয়ে বাঁধা এবং ষড়জ অথবা ষড়জের পূর্ব থেকে এক একটি আঘাত করে স্বর সৃষ্টি করা। প্রতি সূক্ষ্ম স্বরের আঘাতে এমনি দুটোতে শ্রুতির বৈষম্য বোঝা যাবে। বীণার দৈর্ঘ্য ইত্যাদির নিয়ম-কানুন এবং ঘাট বাঁধার পদ্ধতিও এই পরিমাপের সহায়ক। বীণায় বাঁধা তার বাজিয়ে দুটো রীতিতে এই বাইশ শ্রুতি হৃদয়ঙ্গম হয়—বিশেষ করে স্বর থেকে উত্থান করা অথবা তারস্বর থেকে অবরোহণ। শুদ্ধ স্বর স্থির থাকলেও বাইশটি শ্রুতিতে বিকৃত স্বরগুলোর উদ্ভব নানারূপ হয়। বলে রাখা দরকার, শার্ঙ্গদেব (স্বরাধ্যায়ে) স্বরগুলো অনেকই যে বিকৃত ভাবে পরিণত হয় সে কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধ স্বর ৭টি এবং বিকৃত স্বর ১৯টি। মধ্যযুগে রামমাত্য থেকে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। চ্যুত—**স**, তিনশ্রুতি—**গ**, চার-শ্রুতি—**গ**, চ্যুত—**ম**, তিনশ্রুতি—**প**, তিনশ্রুতি—**ন**, চারশ্রুতি—**ন** প্রভৃতি রাগের স্বর ব্যবহারের ব্যাখ্যার জন্যে পরিকল্পিত। ধীরে ধীরে এই ব্যাখ্যা-গুলো পাঁচটি বিকৃত স্বরের দিকেই গিয়েছে।

মধ্যযুগে এই সময়ে উত্তর ভারতীয় সংগীতে শ্রুতির ব্যাখ্যা, শ্রুতি নাম উল্লেখ এবং শ্রুতির প্রয়োগের বিচিত্র চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এসব নামও অর্থহীন হয়ে গেছে কারণ ১২টি স্বর ব্যবহারের অতিরিক্ত কোন শ্রুতির স্বতন্ত্র বা বিশেষ প্রয়োগ ১২টি স্বরের মতো স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে হয় নি।

শ্রুতি সংখ্যা		প্রাচীন ষড়জ গ্রাম	বিকৃত স্বর নাম	বর্তমান স্কেল	কম্পন মতভেদে
১	তীব্রা		কৈশিক ন	স	২৪০/২৫৬
২	কুমুদ্বতী		কাকলি ন		
৩	মন্দা		চ্যুত ষড়জ ন/মৃদু স	ঋ	
৪	ছন্দোবতী	স	অচ্যুত ষড়জ		
৫	দয়াবতী			র	২৭০/২৮৮
৬	রঞ্জনী				
৭	রতিকা	র		জ্ঞ	
৮	রৌদ্রী		তীব্র র/চতুঃশ্রুতি র	গ	৩০০/৩২০
৯	ক্রোধা	গ	পঞ্চশ্রুতি র, তীব্রতর র		
১০	বজ্রিকা		সাধারণ গ/ষঠ্রাত র (তীব্রতম)	ম	৩২০/৩৪০⅓
১১	প্রসারিণী		অন্তর গান্ধার		
১২	প্রীতি		চ্যুত গ/মৃদু ম	হ্ম	
১৩	মার্জনী	ম	অচ্যুত পঞ্চম		
১৪	ক্ষিতি			প	৩৭০/ ৮৪
১৫	রক্তা		তীব্রতম ম		
১৬	সন্দিপনী		মৃত প/বিকৃত প/চ্যুত পঞ্চম ম	দ	
১৭	আলাপিনী	প			
১৮	মদন্তী			ধ	৪০৫/৪২৬⅔
১৯	রোহিণী				
২০	রম্যা	ধ	বিকৃত ধৈবত	ণ	
২১	উগ্রা		তীব্র ধ/চতুঃশ্রুতি ধ	ন	৪৫০/৪৮০
২২	ক্ষোভিণী	ন	পঞ্চশ্রুতি ধ		
১	তীব্রা		কৈশিক ন/ষট্শ্রুতি ধ		

রামমাত্য : স্বরমেল কলানিধি (১৫৫০ খৃঃ)—১৬শ শতকের প্রথম-ভাগে বিজয়নগর রাজ্যে জন্ম। শার্ঙ্গদেবের পর মাধব বিদ্যারণ্যের কথা ছেড়ে দিলে এই ধরণের রচনা আর পূর্বে দেখা যায় না। কর্ণাটক সংগীতের

উপাদানের আলোচনাই উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি পাঁচটি প্রকরণে ভাগ করেছেন। প্রথমে 'গান্ধর্ব' এবং 'গান' সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন বর্তমান সংগীতের রূপ 'গান' বা দেশী সংগীতে বিধৃত। এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৭টি বিকৃত স্বরের কথা। এ বিষয়ে শাঙ্গর্দেবের বর্ণিত ১২টি বিকৃত স্বরের উল্লেখ করে বলেছেন প্রকৃত পক্ষে ৭টিই বিকৃত স্বর আছে। যথা: ১) শুদ্ধ **স**, ২) শুদ্ধ **র**, ৩) শুদ্ধ **গ** বা পঞ্চশ্রুতি **র**, ৪) সাধারণ গান্ধার বা ষট্‌শ্রুতি **র**, ৫) অন্তর **গ**, ৬) চ্যুত মধ্যম **গ**, ৭) শুদ্ধ **ম**, ৮) চ্যুত পঞ্চম **ম**, ৯) শুদ্ধ **প**, ১০) শুদ্ধ **ধ**, ১১) শুদ্ধ **ন**, বা পঞ্চশ্রুতি **ধ**, ১২) কৈশিক **ন** বা ষষ্ঠশ্রুতি **ম**, ১৩) কাকলী **ন**, ১৪) চ্যুত ষড়্‌জ **ন**। ইনি একটি গ্রামই স্বীকার করেন এবং এঁর মতে মূর্ছনা মধ্যশ্রুতি থেকে সুরু। 'বীণা প্রকরণ', 'মেল প্রকরণ' বর্ণনা করে তিনি রাগ-প্রকরণে গ্রন্থ শেষ করেন। ৬৩টি জন্য-রাগের শ্রেণী বিভাগের জন্যে রামমাত্য ২০টি মেল বা ঠাটের কথা উল্লেখ করেছেন। সবশেষে বলা যায় চ্যুত মধ্যম **গ** এবং চ্যুত ষড়জ **ন** কিভাবে ব্যবহার হবে? একদল মনে করেন অন্তর এবং কাকলী দুটো স্বতন্ত্র স্বর, আর একদল বলেন চ্যুত মধ্যম গান্ধার ও চ্যুত ষড়জ নিষাদকে স্বীকার করা দরকার। রামমাত্যে রাগের পুরুষ-স্ত্রী বিভাগের কোন প্রভাব নেই। হনুমন্ত মত অনুপস্থিত। রামমাত্য মুখারীকে আদি ও শুদ্ধমেল বলেছেন: হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুসারে এই স্বর—**স ঋ র ম প দ ধ র্স**।

সোমনাথ পণ্ডিত: রাগ বিবোধ—(১৬০৯/১০) কর্ণাটক সংগীতের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনে হয় তিনি কিছুকাল উত্তর ভারতীয় সংগীতেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কিছু পারসিক রাগ (হুসেনী, নওরোজ, এবং ইরাখ ইত্যাদি) উল্লেখ করেছেন। ইনি ২২ শ্রুতি স্বীকার করে নিয়েছেন, স্বর-স্থান চলিত (অধরা শ্রুতি) ৪, ৭, ১৩, ১৭, ২০, ২২ সংখ্যায়ই শুদ্ধ স্বরের স্থান বলেছেন। শাঙ্গর্দেবের ১২টি বিকৃত স্বরের পরিবর্তে ইনিও ৭টি বিকৃত স্বর ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ দেশী রাগের কোথাও কোথাও পঞ্চশ্রুতি বা ষট্‌শ্রুতি **র** এবং **ধ** ব্যবহার করেছেন। আসলে পঞ্চশ্রুতি, ষট্‌শ্রুতি **র**, **ধ** কোন স্বতন্ত্র স্বর নয়। মোট ১৭টি স্বরের উল্লেখ হলেও দুটো অপর নামের সংগে সংমিশ্রিত মোট ১৫টি। সোমনাথ ২৩টি মেল বা ঠাটের উল্লেখ করেছেন। প্রায় ৭৫টি রাগের সঙ্গে উত্তর ভারতীয়দের পরিচয় আছে। পারসিক রাগের মধ্যে হিজাজ, তুরস্কতোড়া, ইরাখ

ইত্যাদি। মেল ও ঠাট দুটো শব্দই ইনি উল্লেখ করেছেন। পরিচ্ছেদ-গুলোর নাম দিয়েছেন বিবেক। চতুর্থ বিবেকে রাগগুলোকে উত্তম, মধ্যম ও অধম রাগে ভাগ করেছেন। সোমনাথ বলেছেন, কেউ কেউ রাগ-রাগিণী প্রকরণে লিঙ্গভেদের কথা বলেন। কিন্তু সোমনাথের কাছে রাগ-রাগিণী সমপর্যায়ভুক্ত। অনেকের মতে রাগের ধ্যানমূর্তির প্রথম নিদর্শন 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে আছে। সোমনাথ বেলাবলী, ভূপালী, ললিতা, বসন্ত, হিন্দোলক বা হিন্দোল, জৈতাশ্রী, ভৈরব প্রভৃতি রাগের ধ্যানমূর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া রাগরাগিণীদের কথায় শংকর বা শিবের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পার্বতীর নামোল্লেখ নেই। কোথাও কোথাও রাগ-রাগিণীদের উল্লেখে দার্শনিক প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন।

পণ্ডিত বেঙ্কটমখী: চতুর্দণ্ডী-প্রকাশিকা—বিজয়নগরের রাজা রঘুনাথ নায়কের মন্ত্রী গোবিন্দ দীক্ষিতের পুত্র—বেঙ্কটেশ দীক্ষিত বিজয়নগরের রাজসভার গায়ক, ১৬৩০-৪০ নাগাদ গ্রন্থটি রচনা করেন। কর্ণাটক সংগীতে তিনি বারোটি স্বর-ব্যবহার নির্দিষ্ট করেন, এবং ৭২টি মেলকর্তার বিশ্লেষণ করে রাগ-পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট করেন। স্বরমেল-কলানিধি ও রাগ-বিবোধে ৫টিরও অধিক বিকৃত স্বর বর্ণিত। তিনি শ্রুতির ভাগ ৪+৩+২+৪+৪+৩+২কে ভিত্তি করে নিয়েছেন এবং বিকৃত স্বর-গুলোকে বলেছেন: ১) সাধারণ-গা, ২) অন্তর-গ, ৩) বড়ালী ম, ৪) কৈশিক-ন এবং ৫) কাকলী-ন। বড়ালী-ম, সোমনাথের মৃদু-প বা পঞ্চমের তৃতীয় শ্রুতি। শুদ্ধ-র এবং শুদ্ধ-ধ তাদের তিন শ্রুতির লক্ষণ পরিবর্তন করে না, তাই অন্য নামে তাদের অভিহিত করা সঙ্গত নয়। শুদ্ধ গান্ধার সর্বদাই দ্বিশ্রুতিক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শুদ্ধ গান্ধার পঞ্চশ্রুতি ঋষভে এবং নি পঞ্চশ্রুতি ধৈবতে পরিণত হয়। স্বর ব্যবহারের আরো বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর মেল বর্ণনায় বাদী সম্বাদীর কথা বলেছেন। বিবাদীকেও উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার। ৭২টি মেল প্রচলন করা হয়েছে—শুদ্ধ মধ্যমের অবলম্বনে ৩৬টি, এবং প্রতিমধ্যমের অবলম্বনে ৩৬টি বিন্যাস করে। বারোটি স্বরের ৭টি একবার পূর্বার্ধের শুদ্ধ ম, এবং আর একবার উত্তরার্ধের প্রতিমধ্যম (তীব্র হ্ম) অবলম্বন করে—তিনি একবার ৩৬টিতে নিয়েছেন **স ঋ র জ্ঞ গ (ম) প দ ধ ণ ন**; অন্যবারে ৩৬টির জন্যে নিয়েছেন **স ঋ র জ্ঞ গ (হ্ম) প দ ধ ণ ন**। বেঙ্কটমখীর ১২টি স্বরনাম হল:

সা রে রি/গা রু/গি গু মা মি পা ধা ধি/নি ধু/নি নু সা
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

এক একটি স্বর রু এবং গ কখনো পাঁচ শ্রুতি অবলম্বন করেছে। স্বরনাম-গুলো থেকে বোঝা যায় একের সঙ্গে অন্য স্বর মিশেছে। ৭২টি মেল স্বীকার করে নিলেও বেঙ্কটমখী শুধু ১৯টি মেলকর্তার প্রচলন স্বীকার করেছেন। এই ১৯টির মধ্যে 'সিংহরব'টি লক্ষণীয়। হিন্দুস্থানী রীতিতে সাধারণত কোমল (জ্ঞ) এবং কোমল নিষাদ একসঙ্গে কড়ি মধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঠাট সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। বেঙ্কটমখী লক্ষ্য কবেছিলেন ২২টি শ্রুতির অতিরিক্ত দুটো শ্রুতির অস্তিত্ব। সেই সূত্রে কর্ণাটক সংগীতে গোবিন্দাচার্যের নাম সংশ্লিষ্ট। অকলঙ্ক এবং গোবিন্দাচার্য এ দুটো নামই একসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। গোবিন্দাচার্য বেঙ্কটমখীর ৭২টি মেল প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও এখানে কিছু তারতম্য আছে। গ্রন্থটির নাম **সংগ্রহচূড়ামণি**। এই সংগেই ২৪টি শ্রুতির প্রসঙ্গও সুপ্রতিষ্ঠিত। কর্ণাটক সংগীতের শ্রুতিনাম এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের তুলনামূলক ১২টি স্বরনাম এইরূপ :

১ ষড়জ—**স**, ২ শুদ্ধ ঋষভ—**ঋ**, ৩ চতুঃশ্রুতি ঋষভ/শুদ্ধ গান্ধার—**র**, ৪ ষট্শ্রুতি ঋষভ/সাধারণ গান্ধার—**জ্ঞ**, ৫ অন্তব গান্ধাব—**গ**, ৬ শুদ্ধ মধ্যম—**ম**, ৭ প্রতিমধ্যম—**হ্ম**, ৮ পঞ্চম—**প**, ৯ শুদ্ধ ধৈবত—**দ**, ১০ চতুঃশ্রুতি ধৈবত/শুদ্ধ নিষাদ—**ধ**, ১১ ষট্শ্রুতি ধৈবত/কৈশিক…**ণ**, ১২ কাকলী নিষাদ…**ন**।

শ্রীকণ্ঠ : রসকৌমুদী—গুজরাটে ষোড়শ শতকের শেষভাগে নব-নগরের জাম সাহেবের কাছে কাজ করতেন শ্রীকণ্ঠ। তিনি দক্ষিণী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত : সংগীত ও সাহিত্য। প্রথমে স্বরাধ্যায়ে নারদী শিক্ষার বিশ্লেষণ। শ্রীকণ্ঠ ৭টি শুদ্ধ ও ৭টি বিকৃত স্বর গ্রহণ করেন—**গ**, সাধারণ **গ**, অন্তর **গ**, উপাত্য বা পত **ম**, শুদ্ধ **ম**, উপাত্য বা পত **প**, **স**, শুদ্ধ **র**, শুদ্ধ শুদ্ধ **প**, শুদ্ধ **ধ**, শুদ্ধ **ম**, কৈশিক **ন**, কাকলী **ন**, উপাত্য বা পত **স** (এই স্বরগুলো হিন্দুস্থানী রীতিতে যথাক্রমে বলা যায় শুদ্ধ **স**, **ঋ**, **র**, **জ্ঞ**, তীব্র **গ**, তীব্রতম **গ**, **ম**, **হ্ম**, শুদ্ধ **প**, **দ**, **ধ**, **ণ**, তীব্র **ন**, তীব্রতম **ন**)। শ্রীকণ্ঠ একটি গ্রামের কথা বলেছেন…ষড়জ গ্রাম। মূর্ছনা, তাল, অলঙ্কার, প্রস্তার সম্বন্ধে বক্তব্য নেই। রাগ-অধ্যায় ১২টি স্তবে বর্ণিত। বীণার ওপর নির্ভর করে শ্রীকণ্ঠের স্বরবিভাগ। তিনি স্বরমেল-কলানিধি এবং রাগবিবোধের

পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। "প্রতিনিধি তত্ত্ব" বা পত-ম, পত স (পত=চ্যুত) প্রকৃতপক্ষে অন্তর এবং কাকলীরই রূপ। শ্রীকণ্ঠের শুদ্ধ ঠাট মুখারীর অনুরূপ, নাম দিয়েছেন 'চিত্তরাজক'। রাগের দেবতাত্মক রূপ লক্ষ্য করবার মতো। রাগ ত্রিবিধ—শুদ্ধ-ছায়ালগ-সংকীর্ণ। শ্রীকণ্ঠ দক্ষিণী রীতির সংগে উত্তর ভারতে প্রচলিত রীতির মিলিত রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এবিষয়ে শ্রীকণ্ঠ রামমাত্যকে অনুসরণ করেছেন।

[খ]

পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল : সদ্‌রাগচন্দ্রোদয়, রাগমঞ্জরী, রাগমালা, নর্তন নির্ণয় (১৫৫৬ ১৬০৫)—জন্ম খান্দেশে, ফারুকী সুলতানদের কাছে প্রথমে চাকরি। **সদ্‌রাগচন্দ্রোদয়** গ্রন্থটি খান্দেশেই রচিত। মানসিংহের ভ্রাতা মাধব সিংহের সভায় রচনা—**রাগমঞ্জরী**, আকবরের সভায় চাকরি কালে রচিত হয় **রাগমালা** ও **নর্তন নির্ণয়**। সদ্‌রাগচন্দ্রোদয় কর্ণাটক সংগীত ভিত্তিক। শুদ্ধ মেল—মুখারী বা কনকাঙ্গী। কিন্তু বর্ণিত রাগগুলি উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করে। কাব্যরসসিক্ত রচনাও আছে। যে শুদ্ধ ঠাট বিট্‌ঠল বর্ণনা করেছেন তাকে স ঋ র-(গ) ম প দ ধ-(ন) র্স বলা যায়। আলোচনা প্রসংগে প্রথমে ২২ শ্রুতি, মন্দ্র-মধ্য-তার স্থান বর্ণনা এবং স্বরস্থান নির্দেশ করেছেন। প্রচলিত হিসেবে শ্রুতির ভাগে প্রত্যেকটির শেষে স্বর নির্ধারিত করেছেন। সে অনুসারে স্বরের আরোহী অবরোহী রূপ কাফি ঠাটের রূপে দাঁড়ায়। সাতটি শুদ্ধ স্বরের পর বিকৃত স্বরের কথা আসে (পাশাপাশি হিন্দুস্থানী স্বর দেওয়া গেল) : লঘু ষড়জ (ন), লঘু মধ্যম (গ), লঘু পঞ্চম (ক্ষ) সাধারণ গান্ধার (জ্ঞ), অন্তর গান্ধার (গ), কৈশিক নিষাদ (ণ) এবং কাকলী নিষাদ (ন)। আমাদের বর্তমান হিন্দুস্থানী কোমল-জ্ঞ এবং কোমল-ণ লোচন-হৃদয়-অহোবল-শ্রীনিবাসের শুদ্ধ-(গ) এবং শুদ্ধ (ন)। পুণ্ডরীক ১৯টি ঠাটের উল্লেখ করেছেন। এই ঠাট থেকে জন্য-রাগগুলি উদ্ভূত। এই রাগগুলির মধ্যে অনেক উত্তর ভারতীয় রাগ দেখা যায়। এর মধ্যে হিজেজ পারসী প্রভাবের ফল।

রাগমালা—এই গ্রন্থে যদিও উত্তর ভারতীয় সংগীত নিয়েছেন, কিন্তু শুদ্ধ স্বরের কর্ণাটকরীতিই বজায় আছে। হনুমন্ত মতের অনুসারে পুরুষ, স্ত্রী,

ও পুত্র শ্রেণীতে রাগগুলো বিভক্ত। এরপর স্থান ও স্বরবর্ণনা করে শুধু ষড়জগ্রামের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুদ্ধ স্বরস্থানকে "স্থিতি" এবং বিকৃতগুলোকে যথাক্রমে "গতি" বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি গান্ধার ত্রিশ্রুতি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় তাকে ত্রিগতিক বলা যায়। কি ধরণের গতি ব্যবহার হবে তা বাগের ওপর নির্ভব করে। এগুলো গ এবং ন শ্রুতি সম্পর্কিত। কতকগুলো শ্রুতি তো একেবারে ব্যবহাব হয় না। এসব বর্ণনার পর বাদী, সংবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, গ্রহ, অংশ, ন্যাস আলোচনা গ্রন্থের বিশেষত্ব। রাগ-মালাব বাগ-অধ্যায়ে ছ'টি পুরুষ বাগের পাঁচটি কবে রাগ ভার্যা এবং পাঁচটি কবে পুত্র বর্ণনা করেছেন। এই রাগেব নামগুলো বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতীয় সংগীতে রাগের সময় নির্ধারণও সংগীতকে একটি বিশিষ্ট লক্ষণে ভূষিত কবে। তাছাড়া রাগেব স্বর বর্ণনায় বিট্‌ঠল দেবতাত্মক রূপেরও সন্ধান দিয়েছেন।

রাগমঞ্জরী—অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে 'পারসীকেয় রাগাঃ' এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। রাগগুলো—পরদ, কাশর, নিশাবর, মাহুরো, রমন, সর্পর্দা, হিজেজ, জংগুলা, বারা, মহ্লবি, ইরাম্বিকা, জিজাবৎ, রাখবেজ ইত্যাদি।

লোচন পণ্ডিত : রাগ-তরঙ্গিণী (১৬৫০ (?)-৭৫)—গ্রন্থ-সংগীতের উত্তর ভারতীয় সংগীত-ধারায় লোচন পণ্ডিত এ যুগের বিশিষ্ট নাম। গ্রন্থটি মিথিলায় রচিত। বৈশিষ্ট্য: বিদ্যাপতির রচিত গীতের উল্লেখ। হনুমন্ত মতানুসারে রাগের নাম করেছেন—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, শ্রী, মেঘ ও দীপক। কিন্তু দীপক অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন এবং পাঁচটি রাগের পাঁচটি করে স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। কতকগুলো নাম পূর্বাঞ্চলের রাগরূপের পরিচায়ক—ভাটিয়াল, দরবারী, জোগিয়া, মালব, সন্তোগিনী, দণ্ডক-আসাবরী, দণ্ডককোড়া। এছাড়া রাগ-ধ্যানের কথা বলেছেন। লোচন কবি মেল বা ঠাটের নাম দিয়েছেন সংস্থান বা সংস্থিতি। কারণ স্বরগুলো বীণাতে স্থাপিত বা স্থিত। কাজেই স্বরসন্দর্ভে স্থিতি মানে সংস্থান। কিন্তু এই স্বরসন্দর্ভের বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যায় লোচন ভরতের ২২ শ্রুতিই গ্রহণ করেছেন। শ্রুতি ভাগে শুদ্ধ স্বরগুলো শ্রুতি সংখ্যা অনুসাবে ৪, ৭, ৯, ১০, ১৩, ২০, ২২। কিন্তু বিকৃত স্বরেব ক্ষেত্রে শ্রুতি সংখ্যা কোমল রে (৬), তীব্র গ (১০), তীব্রতর গ (১১), তীব্রতম গ (১২), অতি তীব্রতম গ (১৩), তীব্রতর ম (১৫), কোমল ধ (২০)

তীব্র ন (১) তীব্রতর ন বা কাকলী (২), তীব্রতম ন (৩)। মোটামুটি দেখা যায়, লোচন পণ্ডিত বর্তমান কাফি ঠাটই তখনকার শুদ্ধ ঠাট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এরপর ১২টি ঠাট নির্দিষ্ট করে তা থেকে জন্য-রাগের শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

ঠাটগুলো: (১) ভৈরবী (২) তোড়ী, (৩) গৌরী (৪) কর্ণাটক (৫) কেদার (৬) ইমন (৭) সারং (৮) মেঘ (৯) ধনাশ্রী (১০) পূর্বা (১১) মুখারী (১২) দীপক। ঠাট বর্ণনা করতে লোচন বিকৃত ও কোমল স্বরের শ্রুতিস্থান নির্দেশ করেছেন। যথা, ইমন সংস্থান বলতে কি বোঝায়? কেদার ঠাটের মধ্যমে যদি ২ শ্রুতি যোগ করা যায় তবে তা হয় ইমন। কেদার ঠাটটি বিলাবল ঠাটের রূপে বর্ণিত। দীপক সম্বন্ধে বলেছেন, সকলে মিলে রূপ নির্ধারণ করা কর্তব্য। যে সব জন্য-রাগ লোচন শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, সেগুলো কয়েকশত বৎসরে পরিবর্তিত হয়েও হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এখনো বজায় আছে। লোচন পণ্ডিতের আর একটি বিশেষ কাজ রাগ গানের সময় নির্ধারণ। তাছাড়া রাগ-সংমিশ্রণেরও একটি ছোট প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে আছে।

অহোবল: সংগীত-পারিজাত (১৫৬০ (?))—প্রকৃত সময় নির্ধারণ করতে পারা যায় না। সোমনাথের (১৬১০) লেখার সংগে পরিচিত ছিলেন। ভাবভট্ট ১৭২০ নাগাৎ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং ১৭২৪এ পারসীতে অনূদিত হয়েছে। অতএব সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে সময় নির্ধারণ করা যায়। অহোবল আসলে দক্ষিণী পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সংগীত-পারিজাত উত্তর ভারতীয় সংগীতের গ্রন্থ। ২২ শ্রুতি গ্রহণ করে কাফি ঠাটের মতোই শুদ্ধ স্বরের স্থান নির্ধারণ করেছেন। বিকৃত স্বর বর্ণনার বিশেষ একটি পন্থা আছে। প্রথম শ্রুতি উত্থানে তীব্র, দ্বিতীয় শ্রুতিতে তীব্রতর, তৃতীয় শ্রুতিতে তীব্রতম, আর চতুর্থ শ্রুতিতে উত্থান হলে অতি তীব্রতম। তেমনি অবরোহণে এক শ্রুতিতে কোমল, দুই শ্রুতিতে পূর্ব। আহোবল বলেছেন শ্রুতি স্বরের মতোই শ্রাব্য। সাতটি শুদ্ধ স্বর ছাড়া আরোহী পর্যায়ে বিকৃত স্বরস্থান তীব্র ন, তীব্রতর ন, তীব্রতম ন, তীব্র গ, তীব্রতম গ, অতি তীব্রতম-গ, তীব্র ম, তীব্রতম ম, অতি তীব্রতম-ম, তীব্র-ধ, তীব্রতর-ধ। অন্যদিকে অবরোহী ক্রমে কোমল-ন, পূর্ব-ন কোমল-ধ, পূর্ব-ধ, কোমল-গ, পূর্ব-গ, কোমল-র, পূর্ব-র ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। ২৯টি স্বরনাম উত্থানে পতনে ব্যবহার করলেও অহোবল ১২টি স্বরই ব্যবহার

করেছেন। প্রায় ১২২টি রাগ বর্ণনা আছে, সেই সঙ্গে আরোহ-অবরোহ, আছে গ্রহ-অংশ, ন্যাস। মূর্ছনা তানের স্বর-প্রকরণ রূপে ব্যবহৃত। হনুমন্ত মতের কোন উল্লেখ নেই, যদিও অহোবল স্ত্রী-পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। রাগ-গুলোকে বিশেষ কোন ঠাটে বিভাগ করেন নি। অবশ্য কোন কোন রাগ বর্ণনায় কিছু কিছু প্রচলিত ঠাটনাম ব্যবহার করেছেন।

হৃদয়নারায়ণ দেব: হৃদয়-কৌতুক, হৃদয়-প্রকাশ (১৬৬০)— শাহজাহানের সময় হৃদয়নারায়ণ গড়া-বাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বেশিদিন রাজত্ব করেন নি। কিন্তু মূল্যবান দুটো গ্রন্থ রেখে গেছেন তিনি। এই দুটো গ্রন্থেব বৈশিষ্ট্য শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয়ের ব্যাপাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেন, হৃদয় অহোবল পণ্ডিত থেকে নিয়েছেন অথবা অহোবল হৃদয় থেকে নিয়েছেন। হৃদয়-কৌতুকেব স্বর-প্রকবণে অহোবল থেকে উদ্ধৃতি আছে। তিনি হৃদয়-বমা নামে একটি বাগও চালু কবতে চেষ্টা কবেন। এই সম্পর্কে 'স্থিতিস্থাতু ত্রয়োদশী' বা তৃতীয় একটি ঠাটেব উল্লেখ কবেছেন। বাগতরঙ্গিণী থেকে ১২টি ঠাটই গ্রহণ কবেছেন। রাগগুলোকে আলোচনা কালে একবাব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি শ্রেণীতেও ফেলেছেন। কিন্তু বাগ-বর্ণনায় হৃদয় যে পদ্ধতি অবলম্বন কবেছেন (যথা, পধৌ নিসৌ চ সম্পূর্ণা প্রোক্তা বেলাবলী বুধৈঃ।) পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁব বাগ বর্ণনায় সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন।

হৃদয়-প্রকাশ গ্রন্থটিতে হৃদয়নারাযণ শুদ্ধ ও বিকৃত স্ববগুলোকে বীণার তারে স্বরসৃষ্টিব দৈর্ঘ্য অনুসাবে বর্ণনা করেছেন। এই পদ্ধতি তিনি অহোবল পণ্ডিত থেকে গ্রহণ কবেছেন মনে কবা হয়। পারিজাত আরো বড় রকমের গ্রন্থ। একথা বলা হয় যে, হৃদয়নাবায়ণ বীণাব তাবেব মাপ অনুসাবে যে ভাবে ভাগ করে শুদ্ধ ঠাটকে ব্যাখ্যা কবেছেন এমনটি আব পূর্বে কেউ কবেন নি। রাগ-তবঙ্গিণী অবলম্বন কবে ১২টি ঠাট ব্যাখ্যার পব তিনি জন্য-রাগগুলোকে বিকৃত স্বব অনুসারে শ্রেণী বিভাগ কবেছেন। হৃদয়-নারায়ণের গ্রন্থে শুদ্ধকল্যাণ, শুদ্ধ নট, শ্রী, বাগেশ্বরী প্রভৃতি কতকগুলো রাগ পবিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ পবিগ্রহ কবছে এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাস পণ্ডিত (১৭০০):—উত্তর ভারতীয় সংগীতের লক্ষণ এই গ্রন্থে বিধৃত। শ্রীনিবাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থ অহোবলের অনেকটাই অনুকরণ। অন্যদিকে ভাবভট্ট এই গ্রন্থ থেকে আহরণ করেছেন।

অহোবলের মতোই বীণার সাহায্যে শুদ্ধ বিকৃত স্বর নিরূপণ করেছেন। মেলকে বলেছেন রাগ উৎপন্ন করবার মতো স্বরসমষ্টি। রাগের সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন, বিকৃত স্বরও মেলের মধ্যে যুক্ত হয়। এরপর মূর্ছনা। মূর্ছনা এখানে প্রাচীন রীতি থেকে স্বতন্ত্র। মূর্ছনার নামগুলো ঠিকই আছে কিন্তু শুধু ষড়জগ্রামের মূর্ছনাই প্রচলিত। আরোহ অবরোহের কথা বলেন নি—যথা সৈন্ধবীর বিভিন্ন লক্ষণের পর বলা হয়েছে এর মূর্ছনা ধৈবত। মূর্ছনা এখানে আরোহী অবরোহী বর্ণনার জন্যেই যেন ব্যবহৃত। উত্তর ভারতে ঠাট পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে মূর্ছনার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু কর্ণাটক সংগীতে এখনো মূর্ছনা আরোহী অবরোহী বোঝার জন্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন মুসলমান গায়ককে মূর্ছনাকে গমকের স্থানে ব্যবহার করতে দেখা যায়। শ্রুতি নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীনিবাস একমত হলেও মোটামুটি ১২টি স্বরই ব্যবহার করেছেন। শ্রীনিবাস ধাতুর নামের মধ্যে কয়েকটির নতুন করে ব্যবহার করেছেন—উদগ্রাহ, স্থায়ী, সঞ্চারী ও মুক্তায়ী বা সমাপ্তি। শ্রীনিবাস কতকগুলি গমকের নামও করেছেন, যথা তাপহত, তারাহত, হতহত ইত্যাদি।

ভাবভট্ট: অনূপ-সংগীত-বিলাস, অনূপ-রত্নাকর, অনূপ-অঙ্কুশ (১৬৭৪-১৭০৯) আওরঙ্গজেবের সময়ে রাজপুত অনূপসিংহ বিকানীরের রাজা। ভাবভট্ট ছিলেন তাঁর সভায়। পিতা জনার্দন ভট্ট শাহজাহানের অধীনে কাজ করতেন। এ সময়ের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনূপ-বিলাসের স্বরাধ্যায়ে সংগীত-রত্নাকরের অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভাব ভট্টের কোন মৌলিক দান নেই। কল্লিনাথ থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নিয়েছেন। শ্রুতি, স্বর বর্ণনায় পারিজাতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রাম, মূর্ছনা, জাতি, বর্ণ, শুদ্ধতান, কূটতান, অলঙ্কার সবই রত্নাকর থেকে নেওয়া। শার্ঙ্গদেবের চ্যুত শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়নি। অহোবল ২৯টি স্বরনাম উল্লেখ করেছেন। ভাবভট্ট ৪২টি স্বরনাম উল্লেখ করেছেন, ব্যাখ্যা করেন নি। শার্ঙ্গদেবের অনুসরণে ২৩৪টি রাগের কথা বলেন। উপাঙ্গ-রাগ বিলাবল, কেদার, গৌরী, পুরিয়া ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেছেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় দুটি পদ্যে কানাড়ার প্রকার সম্বন্ধে বলেছেন। রত্নাকরের ৩০টি মেলকে আশ্রয় করে ৭০টি রাগের বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণ খুব পরিচ্ছন্ন নয়। তিনি উদ্ধৃতিতে ব্যবহার করেছেন: (১) রাগতরঙ্গিণী (২)

সংগীত-পারিজাত (৩) সংগীত-দর্পণ (৪) সংকীর্ণ-রাগাধ্যায় (৫) নর্তন নির্ণয় (৬) হৃদয় প্রকাশ (৭) রাগমঞ্জরী (৮) রাগতত্ত্ব বিবোধ (৯) সদ্‌রাগচন্দ্রোদয় এবং (১০) রাগবিবোধ।

এ যুগের আরো অনেক গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। দামোদরের **সংগীতদর্পণ** রচিত হয়েছিল সম্ভবত মহারাষ্ট্রে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে। গ্রন্থটির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বিশেষ করে সংগীত সম্পর্কিত আলোচনায় এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী লেখকদের সংকলনই বলা চলে। গানের কয়েকটি শ্রেণীর কথা (গীত, রূপক, বস্তু, প্রবন্ধ, গেয়) এবং তাল সম্পর্কিত ৩২টি শ্রেণীর মর্ঠ বর্ণনা এই গ্রন্থে উল্লেখ্য। নৃত্যরীতির বৈশিষ্ট্য যে ভাবে লিখেছেন, তাতে মনে হয় নৃত্যও পরিবর্তনের পথে চলেছিল। যতি বাদ্যাক্ষরের (তিরকিট, থৈ, তাথি, থৈ থৈ ইত্যাদি) দক্ষিণী আঙ্গিক, দামোদরের আলোচনার মাধ্যমে বোঝা সহজ হয়েছে।

বাংলাদেশে কীর্তন সম্পর্কিত কতকগুলো গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। একটি **হস্তমুক্তাবলী** এবং অন্যটি **সংগীত দামোদর** শুভংকরের রচনা। খোলের তালের বিবরণ দেখে মনে হয় ইনি বাংলাদেশের পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। দাশ-পাহিড়া, দশকোশী, দোজ, জ্যোতি, গুঞ্জন প্রভৃতি তালগুলোই এর প্রমাণ। নাট্যপ্রসঙ্গ এ গ্রন্থে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। প্রাচীন গ্রন্থের নামও উল্লেখিত। সংগীত-দামোদরে রাসক-প্রবন্ধকে বলেছেন ছুটিকৈলা এবং নিঃসারুক-প্রবন্ধকে বলা হয়েছে রূপক। এই উল্লেখের মূলে যাই থাক, সংগীত চিন্তাধারাকে বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ করেছে। একথা সত্য, দামোদরের গ্রন্থে যেমন যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, তেমনি অন্যান্য গ্রন্থও এ গ্রন্থ অনুপ্রবেশ করেছে। বিশেষ করে **পঞ্চমসার-সংহিতা** নামক ১৭শ শতকের একটি গ্রন্থের কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতক : খেয়াল ॥ টপ্পা ॥ কর্ণাটক সংগীত ॥ বাংলা শাক্ত সংগীত ॥ ওড়িয়া সংগীত ॥ অন্যান্য

এ পর্যন্ত খেয়ালের প্রচলন সম্বন্ধে যে সব বিচ্ছিন্ন তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে : (১) আমীর খুসরৌ 'খেয়াল' নামকরণ করেন —সে গান হয়ত রূপান্তরিত কোন প্রাচীন প্রবন্ধ গান। কোন কোন আধুনিক মতানুসারে আমীর খুসরৌর সৃষ্ট কওয়াল গান খেয়ালে পরিণত হয়। পরবর্তী যুগে কওয়াল গায়কেরা খেয়াল গান করতেন। (২) জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী খাঁ চুটকলা গান ভেঙে খেয়াল সৃষ্টি করেন। (৩) আকবরের সময়ে দিল্লীর চারদিকে যে সকল গান প্রচলিত ছিল তার মধ্যে প্রত্যেকটিই বিভিন্ন শ্রেণীর গান, যথা—খেয়াল, চুটকলা, কওয়াল, তারানা ইত্যাদি। খেয়াল ও কওয়াল স্বতন্ত্র ছিল।

আকবরের সময় থেকে নিম্নলিখিত গায়কেরা খেয়াল গান করতেন—অনুমান করা হয় :

(ক) বাজবাহাদুর।

(খ) চাঁদখাঁ ও সুরজখাঁ—তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী—পাঞ্জাবের খয়রাবাদ জেলার ভাষায় ধ্রুপদমিশ্রিত খয়রাবাদী খেয়াল গান করতেন।

(গ) পাঞ্জাবের চঞ্চলসেন আকবরের সময়ে খেয়াল গান করতেন।

(ঘ) জাহাঙ্গীরের সময়ে ওয়াজীর খাঁ নৌহার নাকি ভাল খেয়াল গান করতেন।

(ঙ) সেখ সাধক বাহাউদ্দীন বরনেওয়া জাহাঙ্গীরের সময়ে গীত, ধ্রুপদ ও খেয়াল রচনা করেন। খেয়াল নামে একটি যন্ত্রও তৈরী করেছিলেন।

(চ) ফকিরুল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিহার-খড়্গপুরের শাসনকর্তা অতুলনীয় রচয়িতা গায়ক দৌলত সিং (দৌলত আফজুল)—খেয়াল ও তারানা রচনা করেন। এর অধিকাংশ খবরই অবশ্য অনুমান-নির্ভর। মোঘল যুগের লেখকদের উল্লেখে এই প্রসঙ্গগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রচারিত। ক্যাপ্টেন উইলার্ড বোধহয়

'তোহ্ফাতুল হিন্দের' মতই প্রচার করেছিলেন—সুলতান হুসেন শর্কী খাঁ চুটকলা গানকে খেয়ালে পরিণত করেন। মোঘল যুগের লেখকেরা প্রায় সকলেই অন্যান্য গানের সংগে স্বতন্ত্র ভাবেই খেয়ালের অস্তিত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। আমীর খুসরোর কবাল ও তারানা এবং শর্কীর খেয়াল রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা উল্লেখ করেছেন তাঁরা কেউ সমসাময়িক নন—তাঁদের মধ্যে কয়েক শতকের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। কাজেই শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করা চলে না। আকবরের যুগ থেকে চুটকলা, পাঞ্জাবী ডপা (টপ্পা), তারানা, কওয়াল, প্রভৃতি নানা গানের সঙ্গে নানা স্থানে খেয়াল প্রচারিত হতে থাকে। খেয়াল তাই স্বতন্ত্র ভাবে বিবর্তিত হতে থাকে। আমরা পূর্বেই বলেছি কোন প্রচলিত প্রবন্ধ গান খেয়ালে রূপান্তবিত হয়েছিল, আঞ্চলিক ভাষাব গান সরাসরি বাইরে থেকে আসা সম্ভব নয়।

সে যুগে কিভাবে খেয়াল গাওয়া হত এবং সেই সঙ্গে কি যন্ত্র বাজানো হত আমরা একথা আজ জানতে পারি না। প্রচলিত রাগে ব্রজবুলি-মিশ্রিত এবং পাঞ্জাব অঞ্চলের লৌকিক ভাষামিশ্রিত রচনায় ধ্রুপদের অলঙ্কার মিশিয়ে কতকটা হাল্কা ভাবে গান করা হত, এ কথা নিশ্চিত। মোঘল যুগের লেখকেরা বহু আনদ্ধ-যন্ত্র বা তালবাদ্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোথাও তবলা-বাঁয়ার উল্লেখ বা বাদকের নাম নেই, যদিও সেবা পাখবাজ-বাদকের নাম এবং অন্যান্য যন্ত্রের প্রসঙ্গ বেশ জানা যায়। কাজেই, তবলা কখন থেকে খেয়ালের সঙ্গে বাজে তা অজ্ঞাত। সেকালের সংগীত সমাজে খেয়ালের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ধ্রুপদ-ধামার যখন প্রধান এবং একমাত্র সভা-সংগীত খেয়াল তখন গায়ক-সমাজে নিভৃতে সৌখিন চর্চার বিষয়। মানসিংহ তোমরের পরের যুগে গোয়ালিয়রের ধ্রুপদী ঐতিহ্য আকবরের সময় থেকেই লোপ পেতে থাকে এবং গোয়ালিয়র পরবর্তীকালে খেয়াল অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আউরঙ্গজেবের পর থেকে বিশিষ্ট কলাবন্ত ব্যক্তিদের স্থান পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্যে চর্চাকেন্দ্রগুলি ঘরাণায় বিকশিত হয়।

বর্তমানের প্রচলিত খেয়াল অবলম্বন করে আমরা মোঘল যুগের ঔরঙ্গজীবের প্রপৌত্র মহম্মদশার সময়ের অ্যামৎ খাঁ বা শাহ্ সদারঙ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। গানে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নামের উল্লেখ থাকলেই সে গান খুসরোর সময়ের বা অন্যান্য মোঘল সম্রাটের নামের উল্লেখ থাকলে গান সেই সময়ের একথা বলা

চলে না। মোটামুটি খেয়াল গান লক্ষ্য করে সদারঙ্গের পূর্ব যুগে যাবার দরকার হয় না। সেনী-ঘরাণা-সংগীতের মাধ্যমে ধ্রুপদের সম্মান যতই অবিচলিত থাক তানসেনের কন্যাবংশীয় ঐতিহ্যের দিক থেকে স্রষ্টা বা বাগ্‌গেয়কার সদারঙ্গের নাম অগ্রগণ্য, সদারঙ্গী খেয়াল গান আজও প্রাণবন্ত। অর্থাৎ আজও সদারঙ্গের খেয়াল নতুন করে গান করবার চেষ্টা করা হয়, কারণ খেয়াল এখনো নতুনত্ব-সন্ধানী সংগীত-রীতি, শুধুমাত্র ক্লাসিক বা পুরাতন-রীতিসর্বস্ব নয়। ন্যামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) জন্মেছিলেন আউরঙ্গজেবের সময়ে এবং মহম্মদ শাহ্‌র রাজত্ব পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। সদারঙ্গ (ন্যামৎ খাঁ) আউরঙ্গজেবের সমসাময়িক খুশ্‌হাল খাঁর পৌত্র, লাল খাঁ সানীর পুত্র। এই সময়ের পূর্বে এবং পরে আরো দু'জন ন্যামৎ খাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। খুশ্‌হাল খাঁ বিলাসখাঁর জামাই, লাল খাঁর পুত্র, গুণসমুদ্র উপাধি পেয়েছিলেন। আসলে মহম্মদ শাহ্‌র সভায় ন্যামৎ খাঁ রবাবী ও বীণকার, পরবর্তীকালে সদারঙ্গ নামে খেয়াল রচনা করেন। ন্যামৎ খাঁ রাজসভায় মতান্তরের জন্যে মহম্মদ শাহ্‌র বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। এ সম্বন্ধে নানা কাহিনীই প্রচলিত। ন্যামৎ খাঁ তানসেনের পুত্রবংশীয় গোলাব খাঁর গানের সংগে বীণা বাজাতেন রাজদরবারে। এ জন্যে তাঁর আসন গায়কের পেছনে পড়ত। এ ব্যাপারটা অপমানজনক মনে করে তিনি বাদশার সভা বর্জন করেন। সদারঙ্গ নাম গ্রহণ করে গান রচনা এবং কবাল-বংশীয় দুজন ভিক্ষুক বালককে সঙ্গীত শিক্ষাদান করতে আরম্ভ করেন। কিছু-কাল পরে এই বালকদের সুকণ্ঠে অভিনব রীতির খেয়াল গান শুনে মহম্মদ শাহ্‌ ন্যামৎ খাঁকে দরবারে ফিরিয়ে নেন এবং বিশিষ্ট সম্মানে তাঁকে সভায় স্থান দেন। সেই থেকে নাম হয় শাহ্‌ সদারঙ্গ। এ ভাবেই কণ্ঠসংগীতে খেয়ালের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সদারঙ্গের বিশেষ কৃতিত্ব ধমার গান রচনায়। ধ্রুপদ এবং ধমার রচনার মধ্যে সদারঙ্গের ধমার গেয়ে পরবর্তীকালে গায়কেরা ধমারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ধমারের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিও সদারঙ্গের বিশেষ অবদান। কিন্তু খেয়ালের রচনায় সদারঙ্গ যুগান্তর এনে দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী খেয়াল সংগীত রীতি হিসেবে অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির থাকাই সম্ভব, একথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব রূপ নির্ধারণ অনুমানের ওপর নির্ভর-শীল। সদারঙ্গের পূর্বের গান সাধারণত কয়েকটি তুকে রচিত হত। ধ্রুপদের অলংকার আংশিক ভাবে গ্রহণ করার পর খেয়ালে তান উপাদান সংমিশ্রিত হয়। সম্ভবত চুটকলা গান বা পাঞ্জাবের টপা (টপ্পা) থেকে তান এসে

মিশে যায়। সদারঙ্গের সময়ে এরূপ সাংগীতিক বিকাশের ফলে গানগুলোর দুটো অঙ্গই প্রতিষ্ঠিত হয়। সদারঙ্গের স্থায়ী ও অন্তরা রচনায় সে চিহ্ন বর্তমান। তিনি সংক্ষিপ্ত স্থায়ী-অন্তরার মধ্যে প্রতি গানে এক একটি বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করেছেন। সহজ মানবিক প্রেম নায়ক-নায়িকা ভাব অবলম্বন করে এই রচনা দাঁড়িয়েছে। সংগে সংগে গানে এসেছে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ঋতু-বর্ণনা, মানবিক গুণ বর্ণনা, কোথাও একটুখানি জীবনচিত্র, কোথাও ভক্তি ভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সহজ সমুজ্জ্বল দিক। ধর্মীয় বিষয় অত্যন্ত সংবদ্ধ ভাষায় রচিত। কথা গানের সুরকে কোথাও ভারাক্রান্ত করেনি। একথা স্বীকার করা দরকার যে সদারঙ্গ খেয়ালকে শুধু বিশিষ্ট রূপদানই করেন নি, এমন একটি ভাষা ও কার্যকরী রীতি সৃষ্টি করেছেন যে আজও অভিজাত খেয়াল বলতে সদারঙ্গী খেয়াল এই দুই দিক থেকেই বিশিষ্ট। সদারঙ্গের খেয়ালের ভাষা খেয়াল-আঙ্গিকের বিশিষ্ট 'ফর্ম' (form) রূপে ব্যবহৃত। পরবর্তী খেয়াল রচয়িতাগণ এই বিশিষ্ট ছকেই গান রচনা করেছেন। এই ভাষা কোনো সাহিত্যিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন কাব্যিক ভাষা নয়। ব্রজ-ভাষা এবং অন্যান্য ভাষার কিছু লৌকিক বুলি নিয়ে এ ভাষা রচিত। মিশ্র প্রকৃতির নানা সীমিত সংখ্যক শব্দের সমষ্টি এই খেয়ালের ভাষা। ভাষা কাব্যিকও নয়, ধর্মীয়ও নয়, আসলে শব্দগুলো গমক, তান, বিস্তার, বোল প্রভৃতির বাহন হবার মতো কার্যকরী। ভাব অত্যন্ত তথাকথিত রূপে বিন্যস্ত ; ভাব—সংগীতের মধ্যেই প্রকাশ্য, গানের কথা রচনায় নয়। মোটামুটি কথাগুলি সংগীত সংস্কারে সুসিদ্ধ। রুচি ও রসবোধের সীমানা অতিক্রম না করলেই তা যেন গ্রাহ্য। গানের মধ্যে সদারঙ্গ মহম্মদ শাহের নামোল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে এটা চাটুকারিতা। গুণী সমাজে এজন্যে সদারঙ্গের প্রতি বিদ্বেষও ছিল। কিন্তু এও শুধু নৈর্ব্যক্তিক আইডিয়া রূপে গ্রাহ্য হয়েছে বলে আজও এ গান বিনা দ্বিধায় গাওয়া হয়। সদারঙ্গী খেয়ালে অলঙ্কার এমন ভাবে সম্পৃক্ত যে অস্থায়ী অন্তরা সুরবিন্যাসের কায়দায়ই মনোহারী। ক্ষুদ্র খণ্ড মীড়, নানারূপ তান, আঁশ, অন্য অলঙ্কার ইত্যাদির ব্যবহার গানকে মনোহারী করেছে বলেই এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বই কমে নি। সদারঙ্গের নিজের রচিত গানের সংগে গায়ন কর্মের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কিনা জানা যায় না। শিষ্য ও বংশাবলীর জন্যেই গান বিশেষ প্রচার লাভ করে।

যে দুটি বালককে সংগীত শিক্ষা দিয়ে সদারঙ্গ সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক করেছিলেন

এঁরা সুপ্রসিদ্ধ কাওয়ালী বংশের জান রসুল ও গোলাম রসুল। গোলাম রসুলই পরবর্তী যুগে সদারঙ্গের খেয়ালের পূর্ণ প্রচার করেন। গানকে মাধুর্য-মণ্ডিত করবার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন গোলাম রসুল। শক্কর, মখ্খন খেয়াল প্রচার আরো বাড়িয়ে দেন। রসুল ভ্রাতৃদ্বয় পাঞ্জাবের অধিবাসী কিন্তু গোলাম রসুল অযোধ্যার নবাব শুজা-উদ্দৌলার সভা-গায়ক হয়েছিলেন। গোলাম রসুলের পুত্রই মিঞা শোরী বা গোলাম নবী। সদারঙ্গের দুই পুত্র অদারঙ্গ ও মহারঙ্গ, দু'জনই প্রখ্যাত বীণকার ছিলেন। অদারঙ্গের কিছু খেয়াল ও ধমার প্রমাণ করে তিনি খেয়াল অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু গানের মধ্যে নানা সংশয়মূলক প্রসংগ থাকায় কারও মতে অদারঙ্গ (ফিরোজ খাঁ) সদারঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র। অদারঙ্গের রচনায় ফিরোজ-খানী তোড়া পরবর্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সদারঙ্গের পুত্র মহারঙ্গ বা ভূপৎ খাঁ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। ইনি যেমন কুশলী বীণাবাদক ছিলেন তেমনি জীবনখাঁ ও প্যার খাঁ নামে দুজন সুদক্ষ বীণবাদক শিষ্য তৈরি করেছিলেন, এঁদের মধ্যে জীবন খাঁ সুপ্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের আরো একজন ধ্রুপদ ও খেয়াল রচয়িতা—মনরঙ্গ। জয়পুরে ইনি খেয়াল ঘরাণার সূত্রপাত করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। প্যার খাঁ এবং পরে জীবন খাঁ—দু'জনেই মহম্মদ শাহের দরবারের—শেষ বীণকার।

খেয়ালের ধারাটি আজ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার পেছনে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক লক্ষ্য করে বহু বিচিত্র ব্যক্তি ও ঘটনার কথা বলা হয়ে থাকে। মোঘল যুগের পরে খেয়াল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিচিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭তে মহম্মদ করম ইমামের লেখা 'মাদ্নুল মুসীকী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ থেকে বহু গায়কের পরিচয় মেলে, বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে হোরী ধামা'র গায়ক এবং খেয়াল গায়কের উল্লেখে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের সেরা সৃষ্টিকর্মের ফলে সংগীত দিল্লীর বাইরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোলাম রসুলের কৃতিত্বের কথা আমরা জানি। শক্কর খাঁ, মখ্খন খাঁ নাম দুটিও উল্লেখযোগ্য। শক্কর খাঁর পুত্র মহম্মদ খাঁর মতো শুদ্ধ খেয়াল গায়ক সেকালে ছিল না। ইনি গোয়ালিয়রে রাজদরবারে ছিলেন। ইনি গান শিক্ষাদানে কৃপণ ছিলেন। গোয়ালিয়র রাজার উৎসাহে হদ্দু খাঁ ও হসসু খাঁ নামে দুই যুবক মহম্মদ খাঁর কৃপণ স্বভাবকে আঘাত দেয়—চুরি করে গান শুনে এবং তানপদ্ধতি নকল করে। মহম্মদ খাঁ সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী এখনো শোনা যায়। মোটামুটি গোয়ালিয়রের

গায়কেরা মহম্মদ খাঁর অনুকরণ করে তান করতে ভালবাসতেন। সেই থেকে গোয়ালিয়রের খেয়ালী ঘরাণার প্রচার হয়েছে। তাছাড়া বিশিষ্ট গুণীদের অবস্থানের জন্যে এই সময় থেকে লক্ষ্ণৌতেও সংগীতের ঐতিহ্য দৃঢ় হয়। শক্কর খাঁ লক্ষ্ণৌতেও থাকতেন।

টপ্পা—অষ্টাদশ শতকে ও পরে: অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই দেখা যায় টপ্পা গান চারিদিকে প্রচারিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলার গায়কেরা টপ্পার রীতি সংগ্রহ করে বাংলাদেশে ফিরেছেন। এর মানে এই যে অষ্টাদশ শতকের পূর্বেই টপ্পা গান উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ' 'গ্রন্থে আছে "পাঞ্জাবে প্রচলিত গীতকে ডপা বলে।" ফকিরুল্লাহও বলেছেন—"ডপা পাঞ্জাবেই বেশীর ভাগ গাওয়া হয়। ওই দেশের ভাষাতেই এটি রচিত হয়। দুই থেকে চারটি কলিতে নিবদ্ধ। এর বেশীও হতে পারে। তবে দুটি দুটি কলির পদান্ত ভিন্ন ভিন্ন মিলযুক্ত হয়। এটি প্রেম-সংগীত। মৃত্যু কামনা বা আত্মোৎসর্গও (প্রেমের জন্য) এর বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। রাধামোহন সেন বাংলাদেশের সুখ্যাত টপ্পা-গায়ক ও সংগীত-জ্ঞানী। ১৮৩২ সালে 'সংগীত-তরঙ্গ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"পাঞ্জাব হইতে হৈল টপ্পার জনম। চোৎকলা তাহারে বলেন কোন কোন জন।" ক্যাপ্টেন উইলার্ড বলেছেন, টপ্পা গোড়ায় পাঞ্জাবের উষ্ট্র-চালকদের লোকগীতি সুরের গান ছিল। এই সঙ্গে মাদনুল মুসীকী-র নিম্নলিখিত খবরটি লক্ষ্য করলে অসংগতি দেখা যায়: "টপ্পা গায়ক শোরীর সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কিংবদন্তী শোনা যায়। টপ্পা গানের প্রচলন প্রথমত এদেশে ছিল না। পাঞ্জাবী ভাষা এই গানের অনুকূল হবে বুঝতে পেরে শোরী (গোলাম নবী) পাঞ্জাবে গিয়ে বাস করতে লাগলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার ভাষা শিখে ফেললেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসে প্রত্যেক রাগেই তিনি একটি করে টপ্পা রচনা করে ফেললেন। প্রকৃত সাধকের ন্যায়ই তিনি এ বিষয়টির সাধনা করেছিলেন। ...শোরীর কোন ঔরসজাত পুত্র নাই। গম্মু নামে তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য ছিল মাত্র, গম্মুর পুত্রের নাম সাদী খাঁ। সাদত খাঁ বেনারসের রাজা উদিতনারায়ণের কাছে থাকতেন। ...লক্ষ্ণৌতে বড় দরের টপ্পা গাইয়ে বললে মুন্নী খাঁ ও ছজ্জু খাঁকেই বোঝা যায়। কিন্তু পূর্ববর্তী গায়কদের সঙ্গে তাঁদের কোন ক্রমেই তুলনা চলতে পারে না ইত্যাদি।"

উপরি-উক্ত তথ্যগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় গোলাম রসুলের পুত্র

গোলাম নবীর বহু পূর্ব থেকেই টপ্পা গান প্রচলিত হচ্ছিল। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পাঞ্জাবের লৌকিব ভাষায় রচিত শোরী ভণিতার টপ্পা গানগুলো কি গোলাম নবী রচনা করেছেন ?

এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হতে পারে পাঞ্জাবে, কোন শোরী ছিলেন পূর্বেই, গোলাম নবী দ্বিতীয় শোরী হতে কোন বাধা নেই। গোলাম নবীকে যদি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে পাঞ্জাবে শোরী নামের গান প্রচলিত ছিল স্বীকার করতেই হবে। শুধু শোরী নয়, টপ্পার আরো কয়েকজন রচয়িতার নাম ভণিতায় পাওয়া যায়, অর্থাৎ এ রকম কিছু সংখ্যক গান গোলাম নবী পাঞ্জাব থেকে নিয়ে এসেছেন এবং প্রচার করেছেন। পাঞ্জাবী গানের ছকে পাঞ্জাব থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষার পর কিছু গান রচনা করেছেন একথাও স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে পাওয়া খবরে দেখা যাচ্ছে গোলাম নবী (শোরী মিঞা) কিছুকাল পাঞ্জাবে থেকে এসে লক্ষৌতে বসে গান রচনা করেন। কিংবদন্তীতে এমন বহু খবর মোঘল যুগের গানের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সারাসার, হমদম ভণিতার টপ্পাগুলোও বিশেষ লোকপ্রিয় হয়েছিল। প্রাচীন গায়কদের কাছে টপ্পার যে জমজমা তান শোনা যেত সেগুলো সাধাবণত টপ্পার বোল মিশ্রিত পাঞ্জাবী ভাষার বোলতান। জম্‌জমা তান মানে সুরগুচ্ছের সাজানো স্তর। লৌকিক সংগীত থেকে টপ্পা গান উচ্চ স্তরে ওঠার সময়ের মধ্যে বহু ব্যবধান ছিল। কাবণ, গানেব দ্রুত জম্‌জমা তানের পল্টা যে ভাবে গাওয়া হত মধ্য-বিলম্বিত পাঞ্জাবী তালে তাতে স্পষ্টই ক্রমবিকাশ প্রমাণিত হয়। পাঁচমাত্রা থেকে নিয়ে গানের মুখ সমে ফেলে নিয়ত স্তরে স্তরে বোলতান করে বিশেষ ভঙ্গিতে গাওয়ার রীতি সামান্য শিক্ষার ব্যাপার নয়। আমরা চুটকলা গানেব বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। বিভিন্ন লোকের লেখা থেকে শুধু শব্দটি ছাড়া আর বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। নানা দিক বিবেচনায় মনে হয়, লক্ষৌর গোলাম নবীকে পাঞ্জাব থেকে নিয়ে আসা গানের প্রচারক এবং শোরী ভণিতার কিছু সংখ্যক গানের রচয়িতা বলা চলে। সেদিক থেকে গোলাম নবী শোরী নাম নিয়ে শিষ্যমণ্ডলী সৃষ্টি করেন এবং ঘরাণারও পত্তন করেন। বর্তমানে কেউ শোরী মিঞার ঘরাণার দাবী করেন কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতক থেকেই খেয়াল গানে টপ্পার তান এবং উনবিংশ শতক থেকে ঠুমরী গানে টপ্পার তান ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রাচীন খেয়াল গায়কদের

মধ্যে টপ্পা তানের সাধনা করা একটি বিশেষ শিক্ষণ-রীতিরূপে প্রচলিত ছিল। বাংলা টপ্পা গানে যে তানের প্রয়োগ দেখা যায় তাকে গিট্‌কারী বলা হয়। এর প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত ধীরগতি এবং সুরসংযোজনা অনেকটা সহজ সরল আরোহী অবরোহী ক্রমে গঠিত। টপ্পার তান সাধারণত খণ্ড ও ক্ষুদ্র অংশে ব্যবহৃত হয় না। বাংলা টপ্পা গানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ বাংলা টপ্পা গানে তানগুলো ক্ষুদ্র ও খণ্ড এবং আধুনিক কালে ঠুমরী ভঙ্গি সংমিশ্রিত দেখা যায়।

কর্ণাটক সংগীতের স্বর্ণযুগ

বিভিন্ন সময়ে কর্ণাটক সংগীতের প্রাথমিক স্তর আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। পুরন্দর দাস, কনক দাস, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতির ধর্মীয় সংগীত রচনার মাধ্যমে যেমন সংগীত-বিকাশ সম্ভব হয়েছিল তেমনি হরিপাল, মাধব বিদ্যারণ্য থেকে আরম্ভ করে রামমাত্য, সোমনাথ, বেঙ্কটমখী প্রভৃতি সংগীতশাস্ত্রীগণের পথনির্দেশও লক্ষ্য করা হয়েছে। বেঙ্কটমখীর ৭২ মেল পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান সংগীতধাবার অভ্যুত্থান হয়। আমরা জানি গোড়ায় বিজয়নগর রাজ্যই ছিল দক্ষিণের সংগীতরীতি উদ্‌ঘাটনের বিশেষ কেন্দ্র।

উত্তর ভারতীয় সংগীতে আমরা যেমন ব্যাপক ভাবে ঘরাণা কথাটি ব্যবহার করে থাকি, কর্ণাটক সংগীতে আয়ো বিশেষার্থে সাধারণভাবে **সম্প্রদায়** কথাটি ব্যবহার করা হয়। **সম্প্রদায়** অর্থে যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও তত্ত্বজ্ঞানের ধাবা সূচিত হয়। এই ধারা বর্ণম, চিট্টৈ, তানম, কীর্তন প্রভৃতি সৃষ্টির কথা বলে। অন্যদিকে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের **মনো-ধর্মের** কথাও জ্ঞাপন করে এবং সে অর্থে **আলাপন, নেরবল, পল্লবী, স্বরম্‌** প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহৃত। সম্প্রদায় বা বাণীর সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়েছে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে। সম্প্রদায়ের লক্ষণ দেখা যায় বিশেষ ধরণের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে, যথা, কল্যাণী রাগে পূর্ব যুগের বিশেষ গান্ধারের প্রয়োগই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এবং পরবর্তী যুগে অন্যভাবে গান্ধারের প্রয়োগে ব্যতিক্রম সৃষ্টি অসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রমও শেষে গ্রাহ্য হয়ে যায়। এরূপ পরিবর্তন সত্ত্বেও কর্ণাটক সংগীতের রূপে বিশিষ্ট **কৃতি** বা **কীর্তন, তানম, পল্লবী, রাগমালিকা** ইত্যাদি সমভাবেই প্রকাশিত হয়।

এগুলো তাল, তালমালিকা, থেরম্. তিরুভাগুকম্, সিন্দু, বর্ণম্ ইত্যাদির সংগে সংশ্লিষ্ট। সম্প্রদায় বা বাণীর পথ মার্গ নামে পরিচিত। এই সূত্রে রাগের কথা আসে। বহু হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগের নাম দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে পাওয়া যায়, যদিও উচ্চারণে তারতম্য থাকা সম্ভব। হিন্দুস্থানী সংগীতে যেমন রাগরূপের কিছু কিছু তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়, কর্ণাটক সংগীতে কিন্তু রাগের নিয়ম-প্রণালী এক এবং দৃঢ়বদ্ধ। এই সম্পর্কে বলে রাখা দরকার কর্ণাটক সংগীতের প্রকাশ স্পষ্টত নির্ভর করে গমকশুদ্ধ প্রয়োগে। সম্প্রদায় বা বাণীর প্রকাশ গমক ও অনুস্বরের অবলম্বনে বোঝা যায়, গমকের মাধ্যমেই রাগম্ স্বরম্ ও তানম্-এর সৃষ্টি চলে। সুতরাং কর্ণাটক সংগীতে গমকশুদ্ধ প্রকৃতিই বিশিষ্ট এবং অবিচল। এরপর আসে রাগ আলাপনের নিয়ম-প্রণালী এবং লয়ের কথা। উত্তর ভারতীয় সংগীতে দ্রুত বা বিলম্বিত লয় যেমন স্বতন্ত্র এবং খণ্ডভাবে প্রয়োগ করা হয়, কর্ণাটক সংগীতে চৌক, মধ্য ও দ্রুত লয়ের একটা সংমিশ্রিত রূপ আছে। মধ্যম-কালই কর্ণাটক সংগীতে বিশেষ ব্যবহৃত।

কর্ণাটক সংগীতে রাগের স্বর-ব্যবহারের জন্যে স্থান, গমক এবং শ্রুতি এসবের তারতম্য হয়। একটি রাগেই হয়ত গান্ধার প্রয়োগ নানা ভাবে হতে পারে। এজন্যে বাঁধা পর্দাওয়ালা যন্ত্র (হারমোনিয়াম, পিয়ানো) ব্যবহার সম্ভব নয়। বিশেষ করে এক একটি রাগের বিশেষ বিশেষ গানে স্বরের রূপও স্বতন্ত্র হতে পারে। যথা, ত্যাগরাজের ২৬টি গান তোড়ী রাগে, ২০টি কল্যাণী রাগে, ২৪টি কামবর্ধনী রাগে, ১৩টি বড়ালী রাগে ; প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি থেকে (স্বর ব্যবহারে) এরূপ স্বতন্ত্র যে গীতভঙ্গি শত শত রাগের অভ্যাস ও সাধনা এই মনোধর্ম তৈরি করে। কর্ণাটক সংগীতে রাগম্, তানম্, পল্লবী—বিশেষ অংশ। রাগমালিকা বাঁধাবাঁধি থেকে মুক্ত। বিরুত্তম্ এবং শ্লোক গানে সাহিত্যাংশে জোর দেওয়া হয়। মোটামুটি, সংগীত কর্মে স্তরে স্তরে গান বা বাজনায় বর্ণম্→আলাপনম্→নেরাভল→পল্লবী→পল্লবীর আবর্ত→জাবালী→তিল্লানা→ইত্যাদি স্তরে স্তরে বিকশিত হয়। মাঝে মাঝেই রাগ ও তালের বিশিষ্ট অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। এবারে সংগীতের স্বর্ণযুগের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রথমে বাগ্গেয়কার বা সংগীত-রচয়িতা ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৭)। ত্যাগরাজ তেলেগুভাষী রামব্রাহ্মণের পুত্র, তিরুবরূ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাকী জীবনের অনেকটাই কাটে তিরুবিয়াগ গ্রামে। প্রথম জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় বিদ্যাশিক্ষা, মাতৃপ্রভাবে ভক্তি সাধন এবং সংগীত সাধনার আধ্যাত্মিক পরিবেশে, বিশেষ করে কৃষ্ণানন্দ নামে জনৈক ঋষি-প্রতিম সংগীতশাস্ত্রীর প্রভাবে সংগীত সাধনায়। ত্যাগরাজের জীবনে ও প্রতিভায় শাস্ত্রীয় সাধনা এবং প্রত্যক্ষ সংগীত উভয়ের বিচিত্র সমন্বয় হয়েছিল। ত্যাগরাজ সম্বন্ধে বলা হয়, জীবনের এমন কোন অবস্থা বা ঘটনা-পর্যায় নেই যে জন্যে ত্যাগরাজ গান রচনা করেন নি। এজন্যে ত্যাগরাজের রচনার বহু বৈচিত্র্য এবং বহুমুখী ব্যক্তিত্বও সর্বজনস্বীকৃত। বেঙ্কটমখীর ৭২ মেলের অনুযায়ী প্রায় ৪৫টি মেল ত্যাগরাজ ব্যবহার করেন। ত্যাগরাজ নিজে ২৫০টির বেশি রাগ রচনা করেছেন। বিখ্যাত কৃতিগুলো নিবদ্ধ কয়েকটি প্রচলিত রাগে—খরহরপ্রিয়া, থোড়ী, শঙ্করাভরণম্, কল্যাণী, কাম্ভোজী ইত্যাদিতে। ত্যাগরাজের পূর্বযুগে গান ছিল আবৃত্তিধর্মী। নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু স্বাধীন সাংগীতিক সত্তার বিকাশই ত্যাগরাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। সবচেয়ে অল্প কথায় সুরের প্রাচুর্য সৃষ্টি তাঁর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কথাগুলো শুধু শব্দমাত্র নয়। কৃতিগুলোর এইরূপ নামকরণ করা হয়—পল্লবী, অনুপল্লবী এবং চরণম্। দ্রুতলয়ের পঞ্চরত্ন রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, "নিন্নুবিণা নমদেন্দু"। গমক এবং রাগ-প্রয়োগের কৃতি 'কোলুভই' (ভৈরবীতে) প্রায় বর্ণমের পর্যায়ে পড়ে। ত্যাগরাজ কর্ণাটক সংগীতে পরমাশ্চর্য। বাগ্‌গেয়কার হিসেবে সংগীত ও সাহিত্যের সমন্বয়ই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। তেলেগু ভাষার সুর-ঐশ্বর্যকে ভাব ও আবেগের সূক্ষ্ম কারিগরীর বাহন করেছেন তিনি। জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তিও লক্ষণীয়। দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, নীতিবোধ ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছে গানের রচনায়। সংগীতের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভে ত্যাগরাজ বিশ্বাসী (মোক্ষ মুগলদা। সংগীথ জ্ঞানমু। স্বরগসুধারস) । নাদ উপাসনার উদাহরণও গানে পাওয়া যায়: নাদথানুমণীসম। নাদোপসনা। নাদলোলুদাই। নাদ সুধারসম্বিলমু ইত্যাদি। রামচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন ত্যাগরাজ। রামের প্রতিমা উপাসনা করতেন ("রামসেবা কৃতি")। রামকে প্রত্যক্ষে উপস্থিত কল্পনা করে তাঁর প্রতি আসক্তি, ক্রন্দন এমন কি ভর্ৎসনার প্রকাশ বা শৃঙ্গারের অভিব্যক্তিও রূপলাভ করেছে তাঁর রচনায়। এছাড়া বহু বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে কর্মযোগী ও ভক্তিমার্গী ত্যাগরাজের রচনা বৈচিত্র্যময় হয়েছে। প্রায় দু'হাজারেরও অধিকসংখ্যক কৃতি

তিনি শিষ্যদের মধ্য দিয়ে প্রচারিত করে যান। প্রবল আধ্যাত্মিকতা ও অমিত সংযমের জন্যে কথা ও সুর এমন সৌন্দর্যপূর্ণ সমন্বয় লাভ করেছে যে আজ পর্যন্তও এর সমকক্ষ রচনা সৃষ্টি হয়নি। কখনো রাজা বা রাজপুরুষের স্তুতি তিনি করেন নি। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁর কৃতিগুলো বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে আছে, গায়কেরা তাঁদের সম্প্রদায়গত মনোধর্ম অনুসারে গান করেন।

পঞ্চরত্নকীর্তনম্, প্রহ্লাদভক্তবিজয়ম্ এবং নৌকাচরিতম্ প্রভৃতি কয়েকটি রচনাও উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি কর্ণাটক সংগীত ত্যাগরাজের এক আশ্চর্য সাহিত্য সংগীত, ছন্দ, তাল, সরলতা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের বাহন। ত্যাগরাজের প্রত্যেকটি রচনার সংগতি ও ঐক্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

বাগ্‌গেয়কার **শ্যামশাস্ত্রী** (১৭৬০--১৮৩৭)-র রচনা এক স্বতন্ত্র ধারার মৌলিক রচনা। গানের রচনার মধ্যে ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গানের সাহিত্যাংশ সরল ও প্রাঞ্জল। পুরন্দর দাসের রচনার মতো গভীর দার্শনিক আধ্যাত্মিকতা শ্যামশাস্ত্রীর রচনায় নেই, ক্ষেত্রজ্ঞের মতো শৃঙ্গারকলাও নেই, ত্যাগরাজের রচনার মতো গীতি-প্রবণতাও নেই, দীক্ষিতারের রচনার মতো বুদ্ধিগ্রাহ্য গুহ্যতাও নেই; তাঁর রচনার মধ্যে আছে করুণতা, কোমলতা এবং শিশুসুলভ স্বাভাবিক আর্তি। যদি দৃঢ়ভাবে কাব্য ও সাহিত্যের বিচার করা যায় তা হলে রাগসংগীতের বহু কথাই (গান) উচ্চস্তরের বলে ধরা যায় না। সেরা গান অনেক সময়েই শ্রেষ্ঠ কথা রচনা নয়। শ্যামশাস্ত্রীর রচনা এই দিক থেকে লক্ষ্য করা দরকার। এই বিচারে "Syama Sastri ranks far superior to many composers and stands next to Ksetrajna. Indeed his compositions are marvels of svara varna samyoga." সাংগীতিক রূপে শ্যামশাস্ত্রীর মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তাঁর রচনা তথাকথিত প্রাচীনপন্থীয় বন্ধন থেকে মুক্ত। 'বর্ণ-মেত্তু'গুলো স্বরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এবং রাগের রচনার অংশে আশ্চর্য আবেগ প্রকাশ ও সৌন্দর্যানুভূতির স্পর্শ আছে। শ্যামশাস্ত্রীর রচনায় ছন্দ বা তাল-বৈশিষ্ট্য পূর্ণ স্ফূর্তিলাভ করেছে।

মুথুস্বামী দীক্ষিতার (১৭৭৫-১৮১৫) সংগীত অবলম্বনে বিশিষ্ট দান করেছেন সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে। আসলে তিনি পুরাতন-রীতিপন্থী। তিনি প্রাচীন প্রয়োগরীতি এবং রাগের অপ্রচলিত কারুকর্মকে সঞ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বেঙ্কটমখী যে ক্ষেত্রে কাজ করে গিয়েছিলেন,

পরবর্তীকালে ত্যাগরাজের রচনায় তার অভিনব স্ফূর্তি হয়। দীক্ষিতার পূর্বাচার্যদের সুদক্ষ ও সুকৌশল শিল্পসৃষ্টিকে নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। কাজেই দীক্ষিতারের রচনা রাগের প্রাচীন অঙ্গ, আশ, বর্ণ ইত্যাদির বিন্যাসে সমৃদ্ধ। তাঁর 'থায়' এবং 'প্রবন্ধ'-রচনা এর প্রমাণ। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে প্রাচীনত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও নতুনত্বের বিস্তারে এবং অনুসন্ধানে দীক্ষিতার পশ্চাৎপদ ছিলেন না। খুব সামান্য রাগলক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি রাগকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। দীক্ষিতারের মৌলিকতা সংগীত রচনার মধ্যে সুপরিস্ফুট। তথাকথিত কীর্তন নিয়ে তিনি নিজের মতো করে ধাতু তৈরি করেছেন অর্থাৎ পল্লবী অনুপল্লবী সৃষ্টি করেছেন, যদিও কখনো বা তাঁকে প্রাচীনপন্থী মনে হতে পারে। রাগের বিকাশ করতেও তিনি অগ্রগামী। দীক্ষিতারের গায়ন রীতিকে বৈদিক রীতি বলা চলে- প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য পুরুষোচিত ও সবল অঙ্গ-সম্পন্ন। গমক এতে প্রধান ; স্বরের প্রকাশ-সৌন্দর্য সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। দীক্ষিতারের সাহিত্যাংশ অনেকটাই গীতের জন্যেই রচিত—ত্যাগরাজের মতো মানবিক আবেদন-সম্পন্ন এবং সুসমৃদ্ধ নয়। তবু এ রচনারও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যদিও দীক্ষিতার রাগের বিশিষ্ট দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, কিন্তু তাঁর রচনা-কৌশল আবেগানুভূতিতে বা বাক্যাংশের বিশেষ প্রয়োগে বিধৃত। তবুও দীক্ষিতারের রাগস্ফূর্তিতে বর্ণোজ্জ্বল রীতি স্বীকার করা দরকার।

কর্ণাটক সংগীতে স্বর্ণযুগের স্রষ্টা-ত্রয়ীর সঙ্গে আরো নাম আজকাল উচ্চারিত হয়। এর মধ্যে কেরলের মহারাজা স্বাতী তিরুনাল (জন্ম ১৮১৩, রাজত্বকাল : ১৮ বৎসর) বিশিষ্ট সংগীত-রচয়িতা। তাঁর বিশিষ্ট রচনা কৃতি থেকে উপাখ্যান, পদ-বর্ণম্ থেকে তিল্লানা এবং স্তোত্র থেকে যাবালী – গুণী শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। হিন্দুস্থানী রীতিতে তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা রচনাও করেছিলেন। এ যুগের বিশিষ্ট সংগীত-গ্রন্থ সংগীত-স্বরামৃত (১৮৮৩) তাঞ্জোরের মহারাজা তুলজীরাও ভোঁসলের রচনা। তুলজীরাও মহারাষ্ট্রের শিবাজীর বংশধর, কিন্তু তাঁর রচনা কর্ণাটক পদ্ধতির। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সংগীত-রসামৃতেরও বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থের প্রথমাংশে শার্ঙ্গদেবের রচনা অনুসৃত, পরে ৭২ মেলের ব্যাখ্যা করেছেন।

॥ বাংলা শাক্তসংগীত বা শ্যামাসংগীত ঃ রামপ্রসাদ সেন ॥

অনেকের মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে আরম্ভ করে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলো পুরাণ রচিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণকে তৃতীয় শতকের রচনা ধরে নিলে মোটামুটি জনসাধারণের মধ্যে শাক্ত ধর্মের প্রচার ও প্রসার এই সময় থেকে বলা যায়। ৭ম থেকে ১১শ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের পরিবেশে যে প্রবল শাক্ত প্রভাব মগধাঞ্চলে ছড়ায়, তার সাংগীতিক প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি পরবর্তী রচনা চর্যাগীতি ও সিদ্ধাচার্যদের গানে। ভারতের পূর্বাঞ্চলেই শাক্তধর্মের বিশেষ প্রচার। এরপরে যখন দেশময় প্রবল বৈষ্ণব প্রভাব ছড়াতে আরম্ভ করে তখনও শাক্ত গানের অস্তিত্ব পূর্বভারতের নানা স্থানেই ছিল। চৈতন্য-ভাগবতকার স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে জনসমাজ মঙ্গলচণ্ডীর গীতে আর বিষহরির (মনসা মঙ্গল) গানে রাত্রি জাগরণ করত। অর্থাৎ, যে সময়ে কীর্তন গানের প্রভাব এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদ প্রবলভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল, সেই সময়ে লোকদৃষ্টির অন্তরালে শাক্ত সংগীতও রূপান্তরিত হচ্ছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। শাক্ত ধর্মীয় পরিবেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল এই সংগীতের ফল্গুধারায়। সে সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাব স্তিমিত বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথে, কিন্তু যোগতান্ত্রিক সাধনা কিছু পরিমাণে গুহ্যভাবে বজায়ও ছিল সে যুগে। একটি স্তরের মানুষ সহজেই এই সাধনায় ব্রতী ছিল একথা নিশ্চিত।

এই সঙ্গে যুক্ত হয় বাঙালীর শক্তিপূজার প্রথা। একটি মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সপ্তদশ শতকে প্রত্যক্ষ ভাবেই শক্তিপূজার প্রবর্তন করেন। কেউ বলেন, আগমবাগীশ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। যাই হোক, শাক্ত সংগীত আকস্মিক ভাবে জন্মলাভ করে নি। রামপ্রসাদ নতুন করে সহজ বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তির সঙ্গে শাক্ত তান্ত্রিক সাধনার সংমিশ্রণ করেন। সন্তানের সহজ আবেদন, অকৃত্রিম মাতৃপ্রীতি এবং জীবন সমস্যার অত্যন্ত সরল ও সহজ রূপ গানের কথায় যুক্ত না হলে শ্যামাসংগীত এরূপ প্রাণবন্ত হয়ে আজও একটি বিশিষ্ট সংগীতরূপে বেঁচে থাকত না। রামপ্রসাদের গীত রচনা সহজ মানবিক আবেদন ও মায়ের প্রতি অত্যন্ত অকৃত্রিম সরল বালকোচিত ভাবের প্রকাশ নিয়ে শ্যামাসংগীত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। নানা সমস্যার কথা এই গানের মধ্যে মিশে গানগুলোকে জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। দুঃস্থ

জীবন, ক্রূর লোক-সমালোচনা থেকে মুক্তি, তান্ত্রিক সহজ সাধনা এবং সংগে জীবনের নানা পার্শ্বিকের মধ্যে পরমার্থের উপলব্ধির আকুলতা গানগুলোতে মানব মনকে বাস্তবের কাছাকাছি টেনে এনেছে। অর্থাৎ, সাধারণ জীবনের গ্রামীণ চিত্র, কৃষি, মাতা-পিতা-কন্যার সম্পর্ক, বিবাহ ও কন্যা-বিদায় ইত্যাদি সাধারণ জীবনের বর্ণনাও স্পষ্টতা লাভ করেছে, যদিও সংসারের অনিত্যতাই স্পষ্ট। জীবনের সাধারণ নীতিবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, রীতি-নীতির উল্লেখও গানের মধ্যে বর্তমান। সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে সহজ ভাব-প্রতীকপূর্ণ সাংগীতিক ভাষা যা রামপ্রসাদের গানকে মহত্ত্ব দান করেছে। আমরা ভক্তি ও ধর্মীয় দিকটাকে বিচ্ছিন্ন করছি না, কিন্তু একথা সত্য যে মানবিক ভাবের সহজ স্ফুরণের ঐশ্বর্য তাঁর সংগীত রচনাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

সংগীত রীতিতে মোটামুটি যে রূপ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাকে তথাকথিত কীর্তন সংগীতের প্রভাব-মুক্ত বলা যায়। প্রথমে, রামপ্রসাদের বিশিষ্ট সুর উদ্ভাবনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি লৌকিক সুরের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে পরিস্ফুট। প্রত্যক্ষে কীর্তনের প্রভাব নেই কিন্তু কীর্তনের সহজ ভাবাবেগ-জনিত সুর-প্রকাশের ভঙ্গি পরোক্ষ ভাবে এই শ্রেণীর গানকে প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় স্তরে রাগে নিবদ্ধ গানগুলোর কথা বলা যায়। রামপ্রসাদের অনেক গানই রাগে রচিত। রামপ্রসাদ যে সময়ে গান রচনা করেছেন সে সময়ে সদারঙ্গী খেয়াল দিল্লীতে রূপ লাভ করেছে মাত্র, ধ্রুপদ গান উত্তর ভারতের চারদিকে ছড়িয়েছে, টপ্পা গান তখনো সম্পূর্ণরূপে পরিচিত নয়, অন্য দিকে বাংলায় কীর্তনের বিকাশ বিশেষ ভাবেই হয়েছে। রাগে গান রচনা তখন অনেকটাই স্বাভাবিক। সে গান কোন বিশিষ্ট রীতির গান নয়, যথা, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি। কিন্তু বহু গানে রাগ ব্যবহৃত হয়েছিল লক্ষ্য করা যেতে পারে, যথা, গারা-ভৈরবী, মুলতানী, খম্বাজ, গৌরী, পিলু, ললিত, বেহাগ, বিভাস, ঝিঁঝিট, ছায়ানট, জৌনপুরী, কালেংড়া ইত্যাদি। একথাও বলা দরকার যে বর্তমানে যে টপ্পা পদ্ধতি রামপ্রসাদী গানে দেখা যায় তা উনবিংশ শতকের প্রয়োগ। তৃতীয় পর্যায়ের গানগুলো, আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি, সে সব গান কতকটা লৌকিক বা সাধারণ প্রচলিত সুরে গাওয়া হত। রামপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত ভক্তির প্রাবল্যে তাঁর নিজস্ব প্রসাদী সুরকেই ব্যাপকভাবে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাগ-প্রযুক্ত গানগুলো রামপ্রসাদের সংগীত অভিজ্ঞতার ফসল বলা যায়।

১৭১৮-২৩এর মধ্যে রামপ্রসাদের জন্ম এবং ১৭৭৫ (?)-এ লোকান্তর প্রাপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় তখন ভারতচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টির প্রভাব চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে। রামপ্রসাদ বোধহয় সেই প্রভাবে বিদ্যাসুন্দর এবং কৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। এরূপ কৃত্রিম রচনা রামপ্রসাদের প্রতিভা-সংগত ছিল না, যদিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রামপ্রসাদের যে অনবদ্য রচনা সকলের মনোহরণ করে তা হলে কন্যারূপী উমার মানবিক চিত্র, বাঙালী জীবনের মা ও মেয়ের নিবিড় সম্পর্কের মধুরতম প্রকাশ—"গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।" এ রচনার প্রভাব এত মধুর যে এ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, এই পদের সরলতা ও সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে পারে এমন কোনও বর্ণনা সম্ভব নয়। আমরা সাহিত্যাংশের মূল্যায়ন ছেড়ে যখন এই গান আজও আগমনী গানের রূপে শুনি, তখন সহজেই বাঙালীর জীবন-অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট স্তরে পৌঁছে যাই। কবি ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' প্রকাশ করেন ১৮৩৩ সালে। রচনার সাহিত্যিক সৌন্দর্য সে সময় থেকেই স্পষ্ট ও স্বীকৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল সাংগীতিক দিক থেকে রামপ্রসাদের সৃষ্টি কিরূপে অভিনব বলে চিন্তা করা যায়? অর্থাৎ, সংগীতরূপে কেন এই রামপ্রসাদের সৃজিত গানের ধারা আজও তাজা সংগীতরূপে প্রচলিত? শ্যামাসংগীত যখন রচিত হচ্ছে, বাংলায় তখন পরিবর্তনের যুগ। পলাশীর যুদ্ধ তখন দেশকে বিশিষ্ট দিকে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান নিয়ে গীতিনাট্যের পরিবেশ, বাঙালী জীবনে নানা রুচি-বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু রামপ্রসাদের রচনায় বিষয়বস্তুতে একদিকে যেমন বাৎসল্য ভাবের নানা সম্পর্ক-বৈচিত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে কালী সাধনার যৌগিক ও নানান দিকগুলোও গানের মধ্যে স্ফূর্তি লাভ করেছে। উনবিংশ শতকে, অর্থাৎ একশত বৎসরের মধ্যে রামপ্রসাদের সৃজিত গানগুলো কবি ও টপ্পাওয়ালাদের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। অনুকরণ ও অনুশীলন হল প্রচুর। সাধক কমলাকান্ত থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী আরো গান-রচয়িতা এগিয়ে এলেন। কিছু গান টপ্পারূপে গাওয়া হতে লাগল। রামপ্রসাদী সুরটিও স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি লাভ করল। এর পরের একশত বৎসরের মধ্যে প্রথমে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মাতৃসাধনার মধ্য দিয়ে নতুন ভাবে শ্যামাসংগীত সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এবং এ-গানের নতুন তাৎপর্য ধরা পড়েছিল। প্রচুর গানও রচিত

হয়েছিল। কিন্তু, এর পরের যুগে স্বদেশী আন্দোলনের মূল ভাব "দেশমাতৃকার প্রীতি''—সহজ ভাবে শ্যামাসংগীতের মধ্যে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। সেই থেকে শ্যামাসংগীত হয়ে দাঁড়ায়. ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবপ্রকাশের বাহন। এ অবস্থায় পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত রচনাও চালু হয় (নজরুলের রচনা)।

সংগীতের দিক থেকে গায়ক সমাজে গায়নকর্মের বাঁধাবাঁধি যেখানে বেশি, সেখানেই গায়কের স্বাধীনতা খর্ব হবার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমান শ্যামা-সংগীতে সেদিক থেকে কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখার সুবিধে আছে। কাজেই এই গানের প্রতি গায়কের সম্প্রীতি থাকার সুসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। মোটামুটি, রামপ্রসাদের সুর পরিমার্জিত ও বিবর্তিত রূপে যেমনই প্রচলিত আছে তেমনি রাগভিত্তিক এবং লৌকিক রীতির এই ধর্মীয় আবেগ-প্রবণ গান বর্তমানে বিশেষ প্রচলিতও আছে।

নরহরি চক্রবর্তী বা **ঘনশ্যামদাস**—অষ্টাদশ শতকের একটি বিশেষ গ্রন্থ **নরহরি চক্রবর্তীর সংগীত-সার-সংগ্রহ**। গ্রন্থটির ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন, এই নামে আরো দুটো গ্রন্থ আছে, কিন্তু সংগীত-সার-সংগ্রহ রচনাটি এ সময়কার বিশিষ্ট ও মূল্যবান তত্ত্বের সংগ্রহ বলা চলে। রাঢ়ের নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস বাংলার পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৃন্দাবনেই শিক্ষা ও সাধনায় জীবন কাটিয়েছেন। সেখানেই রাগ-সংগীতের সাধনাও করেছেন। প্রায় চারটি গ্রন্থ রচনা ও কয়েকটি সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করেন। দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন অঞ্চলেই ঘনশ্যামের সংগীত-শিক্ষা। এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষণ সেকালের কিছু কিছু সমসাময়িক সংগীতের ভাসা ভাসা উল্লেখ। সংগীতসার-সংগ্রহ ছয়টি প্রকরণে বিভক্ত—বাদ্য, নৃত্যনাট্য, আঙ্গিকাভিনয়, ভাষাদি, ছন্দ ইত্যাদি। এই সম্পর্কে ঘনশ্যামদাস প্রায় ১৮টি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেন। প্রাচীন রীতি অনুসারে শ্রুতি, মূর্ছনা, জাতি, রাগ, অলঙ্কার এবং প্রবন্ধগান বর্ণনা করেন। তাল বর্ণনার মধ্যে দু-একটি নাম আধুনিক ধরণের—আদি, বাস, যতি, শুদ্ধ, অড্ড ত্রিপুটা, রূপক, ঝম্পক, মঠক ইত্যাদি। গানের ভাগে "ক্ষুদ্রগীত" পর্যায়টি উল্লেখযোগ্য। এর চারটি ভাগ—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা এবং পাঞ্চালী। এখানে ধ্রুবপদা ও পাঁচালীর রূপের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ধ্রুবপদার বর্ণনা সম্পর্কে ছুটিকৈল বা চুটকলার উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আবুল ফজলের শ্রেণী-

বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া স্বামীজী বলেন, রাগ ও রূপের আলোচনায় ঘনশ্যামদাস সম্ভবত সংগীত-দামোদর, সংগীত-পারিজাত এবং রাগ-তরঙ্গিণী অবলম্বন করেছেন। মনে হয় কাফি ঠাটই তাঁর মতে শুদ্ধ ঠাট। অন্যদিকে নরহরি চক্রবর্তী শাস্ত্র অনুসরণ করে পঞ্চধাতুযুক্ত কীর্তনপদ রচনা করছেন। পদ রচনায় ব্রজবুলিরও ব্যবহার করেছেন। খেতুরি উৎসব এবং কীর্তনের পরবর্তী ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করবার জন্যে নরহরি চক্রবর্তীর রচনা বিশেষ অবলম্বন, একথা বলা যায়।

॥ ওড়িশি সংগীত ॥

উড়িষ্যার সংগীতরীতির স্বর্ণযুগ অষ্টাদশ শতক—এই সময়ে **কবিসূর্য বলদেব রথ কিশোর-চন্দ্রানন-চম্পূ** রচনা করে ওড়িশি সংগীতকে বিশিষ্ট রূপ দান করেন। ওড়িশি সংগীতের ইতিহাস অনুধাবন করতে হলে প্রাচীন আঞ্চলিক সংস্কৃতি লক্ষ্য করা দরকার। প্রাচীন স্তরে ভাষা ও সংগীতের নিগূঢ় সম্পর্ক চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দের সংগে সুপ্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে লুইপা, কাহ্নুপা, শবরীপা, দারীপা এবং ঢেঙ্কীপাদের সংগে ওড়িয়া সংস্কৃতির বিশিষ্ট যোগের কথা বলা হয়ে থাকে। স্বভাবতই চর্যা-গানেব প্রচার ছিল উড়িষ্যার নানান্ মহাযানী বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্দিরগুলোতে, যে সব স্থান-গুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে বর্তমানে সংরক্ষিত। বিশিষ্ট সংগীতরূপে গীতগোবিন্দ পুরীতে প্রচারিত ছিল। চৈতন্যদেব রায়-রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর ও অন্যান্যের সংগে এই সংগীতরস উপভোগ করতেন। ১৫শ-১৬শ শতকে 'পঞ্চসখা' নামক পাঁচজন ওড়িয়া বৈষ্ণব গ্রন্থকার বিশেষ বৈষ্ণব ভাব-ধারার সৃষ্টি করেন। তখন পুরীকে কেন্দ্র করে নানা ভাবেই সংগীতের বিকাশ হচ্ছিল। চৈতন্যদেব এখানেই পদকীর্তনের রূপদান করেন। শংকরদেব দু'বার পুরীতে আসেন। ভক্ত কবীরের জীবনের সংগেও পুরী বিশেষ সম্পর্কিত বলে জানা যায়। ষোড়শ শতকে আইন-ই-আকবরীর উল্লেখ অনুসারে জানা যায়, মহাপাত্র নামক জনৈক বিশিষ্ট সংগীত-কলাবন্তকে আকবর উড়িষ্যায় রাজদূত হিসেবে নিয়োগ করেন। তাছাড়া মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ সংগীত-যন্ত্র, নৃত্য ইত্যাদির উদাহরণ থেকে মনে হয় পুরীতে শুধুই প্রার্থনামূলক সংগীতের অস্তিত্ব ছিল না, ভারতীয় রাগ-সংগীতের প্রভাবও বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ জগন্নাথ দেবকে কেন্দ্র করে নানা সংগীত এখানে রূপায়িত

হয়। এ সম্পর্কে প্রথমে উল্লেখ করা দরকার ছান্দ, চৌতিশা এবং জনান নামক গীতশ্রেণীর কথা। সুর ও ছন্দের দিক থেকে এই গানগুলোর প্রায় সবই লোকসংগীত শ্রেণীর অন্তর্গত। কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়ক প্রাচীন ছান্দ ও চৌতিশাকে পাঞ্চালী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এর মধ্যে ছান্দ ওড়িয়া সংগীতের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক রূপ। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই সংগীতের কথা-রচনায় বিশিষ্ট ধরনের রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জের (১৬৭০—১৭২০) রচনাগুলো যেমন একদিক থেকে রস অনুসারে রাগের নাম বহন করে অন্য দিক থেকে তালও সুশৃঙ্খল ভাবে প্রযুক্ত। পট্টনায়ক এ-গুলোকে অধ্রুবা পাঞ্চালীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। কিন্তু গায়ন পদ্ধতির প্রচলন অনুসারে সাহিত্য-সমৃদ্ধ কাব্যিক ছান্দ-রচনাকেও লোকসংগীতরীতির বাইরে স্থান দেওয়া যায় না। সংগীত শুনলে এ সত্যই উপলব্ধি হয়, বিশেষ করে নিমাইচরণ হরিচন্দনের গান থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'আটতালি' বা 'অষ্টতালি' তালটি উত্তর ও পুর্ব উড়িষ্যার একটি বিশিষ্ট ছন্দ যা এই গানে অদ্ভুতভাবে ব্যবহৃত। চৌতিশা বর্তমানে অপ্রচলিত। ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক সংগীতের মধ্যে জনানের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রভু জগন্নাথের কাছে আবেদনমূলক এই গান ব্যথিত জনের দুঃখ ও আবেগপুর্ণ ভাবগভীর ভাষায় সমৃদ্ধ। ভক্ত বা সাধারণজন প্রবল আকুতি নিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে প্রভুকে ভক্তি জ্ঞাপন করেন এবং অভিযোগ জানান। এই গানে প্রার্থনামূলক লৌকিক সংগীতরীতি থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট সুর-রচনাও হতে দেখা যায়। বিখ্যাত ওড়িশি রচয়িতাদের প্রায় সকলেই জনপ্রিয় জনান রচনা করেছেন। কিন্তু এ সকল গানের সংগীত-প্রকৃতি বুঝতে হলে ওড়িশি সংগীতের সংগে পরিচিত হওয়া দরকার। এ সম্পর্কে কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়কের মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চল দীর্ঘকাল দক্ষিণ দেশীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সেজন্য কর্ণাটক সংগীত ওড়িয়া সংগীতকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। বিংশ শতকের প্রথমে ওড়িয়াতে যে সংগীত-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে ওড়িয়া-গানে কর্ণাটক পদ্ধতির রাগ-প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। মধ্য যুগের ওড়িশি গানের রচনার সংগে কর্ণাটক সংগীতের নিবিড় সম্পর্কের কথা এভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্পষ্ট বোঝা যায়।

কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়কের মতে ওড়িশি সংগীতের ভিত্তি একটি স্বতন্ত্র

ঠাট বা মেল পদ্ধতিতে স্থাপিত। এই পদ্ধতি অনুসারে দেখা যায় ওড়িয়া রাগসংগীতে কর্ণাটক রীতির মতো শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের ব্যবহার কোন ঠাটেই হয় না। এই ওড়িশি মেল অহোবলের সংগীত-পারিজাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওড়িশি মেল এইরূপে বর্ণনা করা যায় (হিন্দুস্থানী নাম সংগে দেওয়া হল):

১। নট—**সরগমপধন** (বিলাবল), ২। ধনাশ্রী—**সরজ্ঞমপধণ** (কাফি), ৩। ভৈরবী—**সঋজ্ঞমপদণ** (ভৈরবী), ৪। কল্যাণ—**সরগহ্মপধন** (কল্যাণ), ৫। শ্রী—**সরগমপধণ** (খমাজ), ৬। কর্ণাট—**সরজ্ঞমপদণ** (আসাবরী), ৭। শোক-বড়ারী—**সঋজ্ঞহ্মপদণ** (*), ৮। গৌরী—**সঋগমপদন** (ভৈরব), ৯। বড়ারী—**সঋগহ্মপদন** (পূরবী), ১০। পঞ্চম—**সঋগহ্মপধন** (মারবা)।

যদিও ৭নং মেল ছাড়া আর সবই বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী ঠাট পদ্ধতির সংগে তুলনীয়, তবু বিশ্লেষণ করে শ্রীপট্টনায়ক দেখিয়েছেন যে এই ঠাট ষড়জ-পঞ্চম সংগতি রক্ষা করে ও (কর্ণাটক রীতিতে) শুদ্ধ-মধ্যম ও তীব্র-মধ্যম বিভাগ অনুসারে রাগগুলোকে শ্রেণী বিভাগ করে নেওয়া যায়। ওড়িশি গানে যে সকল স্থানে দক্ষিণী রাগ ব্যবহৃত হয়েছে সে সকলই এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা চলে। তিনি মনে করেন, ওড়িশি গানে কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই এই চিন্তার প্রয়োজন আছে। এদিকে লক্ষ্য করা যায় যে ওড়িশি গান উত্তর এবং দক্ষিণ উড়িষ্যায় স্পষ্টভাবে দুটো স্বতন্ত্র পদ্ধতিতেই গাওয়া হয়। দক্ষিণের গান কর্ণাটক রাগে গমকশুদ্ধ প্রয়োগে উত্তরাঞ্চলের গায়ন কায়দা থেকে স্বতন্ত্র শোনায়। কারণ, উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে গায়ন রীতি হিন্দুস্থানী রীতির মতো, সাধারণত গমকী ভঙ্গি বর্জিত। মোটামুটি রাগগুলো কর্ণাটক রীতির হলেও গায়কী অনেক ক্ষেত্রে সরল সহজ তান সংযুক্ত। তালের গতি মধ্যম ধীর। তালগুলো মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় বর্ণনার অন্তর্গত নিঃসারী, নন্দক এবং একতালীর রূপান্তর বলা চলে। গানের রচনা প্রবন্ধের অন্তর্গত ক্ষুদ্রগীত প্রকৃতির। ক্ষুদ্রগীতের তিনটি ধাতু—উদগ্রহ, ধ্রুব এবং আভোগ। ক্ষুদ্রগীতের চারটি প্রকার—চিত্রপদা (প্রেম ও করুণতা সমন্বিত কাব্যিক রীতিতে রচিত), চিত্রকলা (তিন থেকে আট তুকে রচিত গান—গীতগোবিন্দ তুলনীয়), ধ্রুবপদা এবং পাঞ্চালী। ওড়িশি গানের সম্পর্কে চিত্রপদা ও চিত্রকলা লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটি, ওড়িশি সংগীতকে বিকশিত

করবার জন্যে বর্তমান প্রচেষ্টা অনেকটাই বিশেষ প্রয়োগ-কৌশল ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। ওড়িশি নৃত্য বর্তমান যুগে যেমন বিশিষ্ট রীতিতে প্রচারিত হচ্ছে, গানের ক্ষেত্রে সেরূপ স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট নয়, যদিও মধ্যযুগের সংগীতে ওড়িশি গানই বিশেষ বর্ণোজ্জ্বল। কবিসূর্য বলদেব রথ কিশোর-চন্দ্রানন-চম্পু গ্রন্থটি দ্বারা সমগ্র ওড়িশি সংগীত-রীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা জানি চম্পু কাব্য থেকেই আঞ্চলিক ভাষায় চম্পু রচনা হয়েছে। কবিসূর্য দক্ষিণ উড়িষ্যার অষ্টাদশ শতকের কবি। পূর্ব থেকেই ওড়িশির সাংগীতিক প্রকাশ হয়েছে—মিশ্রিত সংগীত পদ্ধতিতে। যাঁদের গান বর্তমান ওড়িশি সংগীত রূপে নিবদ্ধ হয়ে আজ বিশেষ প্রচারিত, এঁরা হলেন—কবিসম্রাট **উপেন্দ্র ভঞ্জ, কবিসূর্য, গৌরহরি পরীচ্ছা, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী, দীনকৃষ্ণ** প্রভৃতি।

এখানে বলা দরকার, ওড়িশি সংগীতের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সংগে সংশ্লিষ্ট **নারায়ণ দেবের** গ্রন্থ **সংগীত নারায়ণ**। নারায়ণ দেব অষ্টাদশ শতকে উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলে খেমুণ্ডির রাজা ছিলেন। এঁর আর একখানি গ্রন্থ অলংকার-চন্দ্রিকা। কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়ক বলেছেন, "এহি পার্লাখে-মণ্ডিরে নারায়ণ গজপতি দেব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগরে সংগীত নারায়ণ গ্রন্থ রচনা করিথিলে…যাহা ওড়িশি সংগীতর এক প্রমাণিক গ্রন্থ।" এই শতকের শেষ ভাগে পুরুষোত্তম মিশ্রের পুত্র নারায়ণ মিশ্র রচনা করেন **সংগীত-সরণি**। সংগীত-সরণির সংগেও ওড়িশি সংগীতের তাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধ বিশ্লেষণে তিনি নতুন নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন জানা যায়।

॥ কথকতা ॥

ডাঃ সুকুমার সেন বলেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কথকতা যুগপৎ মনোরঞ্জনের এবং জনশিক্ষার এক বিশেষ উপায়ে পরিণত হইয়াছিল।" কথকঠাকুরের কাজ যদিও পুরাণ পাঠ, শ্লোক আওড়ান, ধর্মকথা বিশ্লেষণ করা এবং তাও বিশেষ নাটকীয় রূপে, এর আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ বিশেষ স্থানে গান করা এবং সে গানও নিছক লোকগীতি নয় বরং বিশিষ্ট লোকপ্রচলিত রীতিতে গান। উনবিংশ শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কথক ও গায়ক কতকটা অভিন্ন, অর্থাৎ বিশিষ্ট কথককে গায়ক হতেই হয়। প্রাচীন যুগের গাথা গান, মধ্যযুগের রাজাদের সভায় রামায়ণ,

মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ, চৈতন্যের সময় থেকে আসর জমিয়ে ভাগবত পাঠ ইত্যাদির সংগে যে শুধু গ্রন্থ পাঠই যুক্ত ছিল এমন কথা বলা যায় না। সর্বত্রই প্রচুর সংগীতের মিশ্রণ ছিল। মিথিলায় চতুর্দশ শতকে কবি পণ্ডিতদের মধ্যে গায়ন, বংশগায়ন, বীণাগায়ন, নট্ট, নর্তক ইত্যাদির সংগে কথকও যুক্ত ছিল। মারাঠী ভাষায় কথকের প্রাচীন পৌরাণিক বিষয়ের পুথির কথা ডাঃ সেন উল্লেখ করেছেন। সংগীত-সংমিশ্রিত কথকতা পাঁচালী শ্রেণীর গানও নয় আবার শুধু কথাও নয়। সেজন্যে বাংলা উনবিংশ শতকের কথককে কখনো গায়কে এবং কখনো কথকে পরিণত হতে দেখা গেছে। এ সম্পর্কে বাংলার কথকতা, ওড়িয়ার পালা, মারাঠী ভাষায় সন্ত-তুকারামের অভঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। **সন্ত তুকারামের** (১৬০৮-১৬৪৯) অভঙ্গ রীতির রচনা গাথা নামেও বিশেষ প্রচারিত। অল্প বয়সে পিতা, মাতা, প্রথমা স্ত্রী ও পুত্র হারান তুকারাম। কথিত আছে নামদেব বিঠোবার সংগে মিলে তুকারামকে কবিতা লেখায় অনুপ্রাণিত করেন। তুকারাম ছেলেবেলা থেকেই ভক্তিভাবে নিমগ্ন থাকতেন। তুকারামের রচনা লোকপ্রিয় হতে আরম্ভ হলে তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিগৃহীত হন। দেবমাহাত্ম্য স্মরণে জাতিভেদের ভাব দূর হয়—এই ধারণাই এঁর রচনায় প্রবল ছিল। গানের রীতিটিই বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো—প্রথমে কথকতার রীতিতে জীবনের কথা সহজে বলে যাওয়া, সেই সংগে পুরাণের একটি কাহিনী সুর করে বা আবৃত্তি করে বলা; এই সংগেই তৃতীয় স্তরে তুকারামের গান যোগ করা। তুকারামের অভঙ্গ এ-জাতীয় কথকতা সংমিশ্রিত গানের লক্ষণ। এ গান মহারাষ্ট্রের সাধারণ জীবনকে স্পর্শ করে। উড়িষ্যার পালাগান যদিও লোক-সংগীতের অন্তর্গত আখ্যায়িকামূলক গান, তবু এই পালাগানই ওড়িয়া জনসাধারণের সংগে শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ওড়িয়া পালাগানের বৈশিষ্ট্য -গানে গায়ক, বায়ক ও পালিয়াদের সহযোগে অনুষ্ঠান। ওড়িশি সংগীত সহজেই পালাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

।। মণিপুরী সংগীত ।

ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতিতে মণিপুরী একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে ; অবশ্য সংগীত বলতে আমরা প্রাচীন রীতি অনুসারে নৃত্যকেও এর সংগে ধরে নিয়েছি। কারণ, মণিপুরে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ

সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায়। কীর্তনের বিশিষ্ট প্রকৃতির সংগে গোষ্ঠীয় নৃত্যের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পরে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়। মণিপুরের লোকসমাজ মৈতেয়ী নামে পরিচিত। তিব্বতীয় ব্রহ্ম বা ভোটব্রহ্ম গোষ্ঠীর ভাষাভাষী এবা কুকীচীন শ্রেণীর সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রগতিশীল জাতি— অত্যন্ত সহজেই যারা আসাম, বাংলা ও উত্তরভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু বৈশিষ্ট্য স্বাঙ্গীকরণ কবেছে এবং সংগে সংগে সংগীতকেও নিজস্ব করে নিয়েছে। মণিপুর মালভূমিতে মৈতেয়ীদের বাস হলেও চারদিকের স্থির দেওয়ালের মত পাহাড় শ্রেণীতে বহু মঙ্গোলীয় মানব-গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে মণিপুরেব চেহারাটা একটি বাটিব মতো। মণিপুরের পৌরাণিক যুগেব শুরু আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী নাগাৎ হলেও প্রথম জাতীয় উজ্জীবন হয় অষ্টাদশ শতকে যখন গরীব-নেওয়াজ পামহেইবা সবচেয়ে পরাক্রান্ত নবপতি। তিনি রামানন্দী বৈষ্ণব ভাবধারায় দেশকে অনুপ্রাণিত করেন এবং নতুন সংস্কৃতিব সূত্রপাত করেন। পামহেইবার পৌত্র রাজা জয়সিং ১৭৬৪তে রাজা হবাব পব থেকে মণিপুব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। জয়সিং চৈতন্যদেবেব পূর্বপুরুষের ভিটে শ্রীহট্টেব 'ঢাকাদক্ষিণ' গ্রাম থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেব সর্বরূপ উপাদান নিয়ে মণিপুরে কীর্তন ও নৃত্য সঞ্জীবিত করেন। নিজে 'ভাগ্যচন্দ্র' নাম নিয়ে এই পথে ব্রতী হন এবং কন্যা রাজকুমাবী সিজা-লাইরোবীকে আধ্যাত্মিকতায় জীবন সমর্পণ করতে অনুপ্রেরণা দেন। সেই সূত্রেই ভাগ্যচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দচন্দ্রের মন্দিরে সিজা-লাইরোবী বাসনৃত্য বিকাশে প্রবৃত্ত হন। ভাগ্যচন্দ্রই রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা কবেন এবং নিজে কীর্তন রচনা করেছিলেন। পদাবলী-কীর্তন গানের সর্বপ্রকাব পদ্ধতি মণিপুরে এ ভাবেই প্রথম প্রযুক্ত হয়। মণিপুরের কীর্তন-সংস্কৃতির বিস্তৃত বিকাশ এর পববর্তী স্তর। নৃত্য ও নটপ্রবৃত্তিতে স্বকীয় ক্ষমতা থাকার দরুণ মণিপুবীদেব মধ্যে ছন্দ ও নৃত্য বিশেষ বিকাশ লাভ করে। রাস-নৃত্য ছাড়া মৈতেয়ীদেব নিজস্ব পৌবাণিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নৃত্য 'লাইহরবা', দোল উৎসবের সংগে সংযুক্ত 'থাবলচোংবা' এবং জাতীয় গাথা কাহিনী 'খাম্বা-থৈবী' প্রভৃতি নৃত্যগুলি আনুষঙ্গিক সংগীত-সহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবম পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতকের সংগীতধারা

॥ প্রাচীন বাংলা গান ॥

উপরিউক্ত নাম অথবা 'পুরাতনী' আজকাল ১৯ শতকের বিশেষ ধরণের গানের রীতি লক্ষ্য করেই ব্যবহৃত হয়। এই প্রাচীনত্বের উপাদান ব্যাখ্যা করলে মোটামুটি দাঁড়ায়—টপ্পা প্রকৃতির গান, সে-যুগের নাটক ও যাত্রার গান এবং অন্যান্য লোকপ্রচলিত গানের একাংশ। বিগত শতাব্দীতে ধর্মীয় গান ও কাব্যসংগীতের স্থান স্বতন্ত্র, অন্ততঃ, আজও সে গানগুলো চালু আছে। অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট রীতির গান লক্ষ্য করেই যেন কথাটি ব্যবহৃত। এই গানের রীতি বলতে বোঝায় অলঙ্কারমুক্ত সহজ ভঙ্গিতে রাগ-ভিত্তিক গান, কণ্ঠ প্রকৃতি ও উচ্চারণে খোলা এবং দৃঢ়বদ্ধ রূপ, সুর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য—সুর যেখানে সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য বিহীন এবং তাল যেখানে আড়ম্বরপূর্ণ। অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রচুর গানের (আজকাল যা প্রকাশিত হয়েছে) মাথায় সুর ও তালের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সবই প্রচলিত রাগে গাওয়া হত। রাগে গান গাওয়া হলেই তা ধ্রুপদ খেয়াল বা অন্য কোন পর্যায়ে পড়ে না। সহজ ভাবে রাগ প্রয়োগ করে প্রচলিত তালের এই সব গানে স্বতঃপ্রণোদিত অলঙ্কার প্রয়োগ করা হত। গানের তুকের তেমন কোন বিধিবদ্ধ মাপ ছিল না। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ ৪।৫।৬।৭।৮ তুক কিংবা তারও বেশি প্রয়োজন অনুসারেই রচনা করেছেন। কাজেই দীর্ঘ গানগুলোতে সুরের বৈচিত্র্য তেমন ছিল না, যদিও রাগের ছকেই গান বাঁধা হত। উনবিংশ শতক পর্যন্ত তালের প্রয়োগে প্রাধান্য ছিল। নেহাত লৌকিক গানের সুর ছাড়া সকল গানেই তালের গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রাচীন গানগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায়, যৎ, কাওয়ালী, মধ্যমান, একতালা, তেতালা, ঝাঁপতাল, পোস্তা, আড়খেমটা, আড়া, তেওট, খেমটা, ঠুমরী (খোলের) ইত্যাদি তাল ব্যবহৃত হত। গানের সেকালীন রচনা (যার মধ্যে শব্দ চয়নের কোন বিশিষ্ট নিয়ম প্রণালী ছিল না, ত্রিপদী-চৌপদী ইত্যাদিতে যে সব গান

রচিত হত) প্রচলিত রাগে এবং নির্ধারিত তালে গাইবার ফলে যে 'রূপ' উৎপন্ন হত তাকে কোন বিশিষ্ট কলা-সৌন্দর্যের স্তরে স্থান দেওয়া যায় না। অনেকক্ষেত্রে গান কীর্তন-প্রভাবিত ছিল। ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্তবর্ণ দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ, মুক্ত কণ্ঠের অনমনীয় সূক্ষ্মতাবিহীন প্রকৃতিই এ গানের প্রাচীনত্বের লক্ষণ। এ গানের মধ্যে যে emotion বা আবেগের প্রকাশ হত না এমন কথা বলা যায় না। গান আনন্দবোধকই ছিল। এ গানের রচনা-নৈপুণ্য অপ্রধান, সাধারণত কাব্য অনুপস্থিত : গানের সুরেও তথাকথিত রীতি বা ভঙ্গি প্রচলিত। তালের প্রবলতা এ গানের রসাস্বাদনে বাধা স্বরূপ হয়ে পড়ত। এ ক্ষেত্রে নিধুবাবু নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। অতিরিক্ত তুক ব্যবহার বর্জিত হল। গানের কথা রচনায় প্রাঞ্জলতা আকর্ষণীয় হল, সুরের খেলা সহজ হল, টপ্পার গিটকারী দ্বারা নতুন রস সৃষ্টি করে বাংলা গানকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করে দিলেন নিধুবাবু। পরবর্তীকালের গান সবই অল্পবিস্তর নিধুবাবুর টপ্পা রীতিতে প্রভাবিত।

প্রাচীন বাংলা গান আজকাল যা গাওয়া উচিত তা হচ্ছে বাংলা টপ্পা প্রকৃতির গান অথবা সে-যুগের নাটক ও যাত্রার গান এবং অন্যান্য ধর্মীয় বা আনুষ্ঠানিক গান যা সুর ও তালের এইরূপ প্রাচীন রীতিতে দৃঢ়বদ্ধ ; তাই এ গান সে যুগের উচ্চারণের মাধ্যমে গাওয়া যেতে পারে। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বর্তমান গানের কায়দা প্রাচীন রীতিকে কয়েক ধাপ পেছনে ফেলে এসেছে। আজকাল উচ্চারণ নমনীয় হয়েছে, মুক্ত কণ্ঠ ব্যবহার হয় না—কণ্ঠ সুসংস্কৃত ও মৃদু লয়ে হয়েছে। আগেকার মতো তালের সংযোজনা নেই। গায়ন ভঙ্গির এই সব পরিবর্তনের ফলে স্বভাবতই প্রাচীন বাংলা গানকে যথাযথরূপে উপস্থাপিত করা যায় কিনা সন্দেহ। তবু প্রাচীন রীতি যাঁদের জানা আছে, তাঁদের পক্ষে তৎকালীন সুর, তাল, ভঙ্গি ও উচ্চারণ কোনটাই বর্জনীয় নয়।

নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) : নিধুবাবু নামটির সঙ্গে বাংলায় টপ্পা গান প্রবর্তনের ইতিহাস জড়িত। সেই সূত্রে বর্তমান যুগের প্রথম কম্পোজার বা সুরকারও নিধুবাবু। ১৭৪১-এ মাতুলালয়ে ত্রিবেণী অঞ্চলে চাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাদ্রীর নিকটে ইংরেজি শিক্ষা করেন এবং ১৭৭৬ খৃঃ ছাপরায় কোম্পানীর অধীনে চাকরি নিয়ে যান। ছাপরায় জনৈক ওস্তাদের কাছে টপ্পা শিখতে সুরু করেন। ওস্তাদের শিক্ষাদানের কৃপণতায় বিরক্ত

হয়ে মুল পাঞ্জাবী ভাষার টপ্পা গানের ছকে বাংলা ভাষায় টপ্পা রচনা করতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ খৃঃএ কলকাতা কুমারটুলীতে ফিরে আসেন। সে সময় থেকে বাংলা ভাষায় গান রচনা করা এবং তাতে টপ্পার অলঙ্কার প্রয়োগ করে মুক্ত রচনার শুরু। স্বাভাবিক গুণে সমৃদ্ধ কণ্ঠের জন্যে এই রচনা। মূল টপ্পা থেকে অনেক সহজতর এই গান। টপ্পা গানে তিনি কণ্ঠের স্বাভাবিক গিটকারীকে তানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। ১৮০৪ সনে সংগীত-সমাজ স্থাপন করেন। তখনকার কলকাতায় আদিরসাত্মক আখড়াই গানের প্রচার ছিল। কুলুইচন্দ্র সেন এর প্রবর্তক। নিধুবাবু এ-গানকে সুসংস্কৃত করেন। তিনি লোকপ্রীতিকর প্রেমের গানকে পৌরাণিক কাহিনী ও তত্ত্ব থেকে মুক্ত করেন। সহজ শব্দ-চয়নের বৈশিষ্ট্যে, মার্জিত রচনা-কৌশলে এবং বুদ্ধিদীপ্ততায় নিধু বাবুর গানকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই সঙ্গে সংগীতের নতুন টপ্পারীতির প্রয়োগের দরুণ নিধুবাবু বর্তমান যুগের প্রথম কবি-গায়ক বা কম্পোজার। কাব্যের দিক থেকে নিধুবাবুর প্রথম স্বদেশী ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতার কথাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে—"নানান দেশে নানান ভাষা। বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?"

নিধুবাবুর টপ্পারীতি ঊনবিংশ শতকের আঞ্চলিক সংগীতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। অন্যান্য বহু রাগেও নিধুবাবু গান রচনা করেছিলেন, যেগুলো টপ্পারীতিতে গাওয়া হত না; কিন্তু বর্তমানে গানের সে সব সুরগুলো অজ্ঞাত। টপ্পারীতির অভিনবত্বের জন্যে বিভিন্ন গান যেমন অনুকরণ করা হয়েছে, তেমনি বহু গান (শ্যামাসংগীত) টপ্পারীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিধুবাবুর গান মূল পাঞ্জাবী টপ্পার সরল প্রকরণ। বাঙালী গায়কের নিজস্ব কণ্ঠের গিটকারীর ঐশ্বর্যকে টপ্পা তানের ভঙ্গিতে তিনি রূপদান করেন। তানের প্রয়োগও অনেকটা সহজ করা হয়েছিল। হিন্দুস্থানী সংগীতের ভঙ্গিতে বাংলা ভাষায় প্রেমের গান রচনা করে তাতে স্বকীয় রূপে সুর সংযোজন নিধুবাবুর বৈশিষ্ট্য। সবশেষে বলা দরকার টপ্পা গানের যে বিশিষ্ট সাংগীতিক রূপ হিন্দুস্থানী সংগীতে আছে, নিধুবাবু তাঁর রচনায় বাংলাতে এর একটা স্বতন্ত্র এবং সহজ সরল পথ তৈরি করে দেন। নিধুবাবুর রচিত এই পদ্ধতি পরে যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের মধ্যে দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক এবং তৎকালীন অন্যান্য কবিওয়ালারা ও শ্যামাসংগীত ও আগমনী গান রচয়িতারা উল্লেখযোগ্য। কালী মীর্জার রচনা এই শ্রেণীর নয় বলেই মনে হয়। নিধুবাবুর গান

প্রচারের সঙ্গে যাঁর নাম বিশেষ সংশ্লিষ্ট তিনি হলেন সুকণ্ঠ গায়ক মোহনচাঁদ বসু।

কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০)— নিধুবাবুর সমসাময়িক কালী মীর্জা টপ্পা গান প্রচারক ও রচয়িতা হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (মতান্তরে মুখোপাধ্যায়) হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় জন্ম-গ্রহণ করেন। বেদান্ত অধ্যয়ন করেন কাশীতে এবং সংগীত শিক্ষা করেন কাশী লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি স্থানে। পরে বর্ধমানের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। বনেদী শিক্ষার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক ছিলেন কালী মীর্জা। বাংলায় টপ্পা গান চর্চার রীতি নিধুবাবুর পূর্বেই প্রচারিত করেন কিনা জানা যায় না তবে অভিজ্ঞ গায়ক হিসেবে নিধুবাবুর পূর্বেই মূল টপ্পা প্রচার করেন বোঝা যায়। কালী মীর্জা জনসাধারণ থেকে অনেকটা দূরে গানের আভিজাত্য রক্ষা করতেন, সেজন্যে কালী মীর্জার প্রচার তেমন ভাবে হয়নি। সংগীতকুশলীদের মধ্যে তাঁর স্থান অগ্রগণ্য। মীর্জার বাংলা রচনা যে সুসংবদ্ধ এমন কথা বলা যায় না। কালী মীর্জা রামমোহন রায়কে সংগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। দু-একটি গান রাগ-সংগীতের কাঠামোতে আজকালও প্রচারিত (ভীষ্মজননী ভাগীরথী তার গঙ্গে (মা)—কাফী-আড়া)। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রচিত 'সংগীত-রাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে এবং 'গীতলহরী' (১৯০৪) গ্রন্থে কালীমীর্জার গান সংকলিত। গানের কথা, সুর ও ছন্দ দৃষ্টে মনে হয় গানগুলোর সংগীতরীতি সহজ-আয়ত্তের সীমানার মধ্যে ছিল না এবং তিনি নিধুবাবু থেকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকৃত হিন্দুস্থানী রীতি অবলম্বন করেছিলেন।

রাম বসু (১৭৮৭-১৮২৯)—পাঁচালী-যাত্রাওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত রামমোহন বসু প্রাচীনতম পর্যায়ের রচয়িতা। হাওড়া জেলার শালিখা অঞ্চলের বাসিন্দা রাম বসু সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাম বসুর গান রবীন্দ্রনাথের জীবন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 'মনে রইল সই মনের বেদনা' গানটি রবীন্দ্রনাথ গাইতেন, ইন্দিরাদেবীর উক্তিতে জানা যায়। রাম বসু অল্প বয়সে কবির দলে যোগদান করেন। পরে পেশাদারী দলও গঠন করেন। কিন্তু গান রচনায়ই ছিল রাম বসুর দক্ষতা। তিনি ভবানী বেনে, নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতির জন্যে বহু গান রচনা করেন। সখী-সংবাদ, প্রেম-বিরহের গান ও আগমনী গানও বিশেষ পরিচিত।

দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭)—পাঁচালী শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে দাশরথি রায়ের রচনার সংগে ব্যবহৃত। প্রথমে কবির দলের সংগে লড়াইয়ে প্রধান হয়ে অবতীর্ণ হতেন। কিন্তু পরে কবির দল ত্যাগ করেন। ১৮৩৬-এ পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন এবং ছড়া, চাপান-উতোর ইত্যাদি রচনা করে একটা মৌলিক ভাষাগত রূপের সৃষ্টি করেন। এ রচনা নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হয়, দাশরথিও সুপ্রতিষ্ঠিত হন। গানের সংগে সংগে ৬৮টি পালা রচনা করেন। গান ও পাঁচালী শ্রেণীর রচনা কবির দলে ব্যবহৃত হলেও এগুলো রাগ-ভিত্তিক গানের সাক্ষ্য দেয়। পাঁচালী অর্থে যে লৌকিক আবৃত্তিমূলক রচনা বোঝায় দাশরথি রায়ের গান সেরূপ নয়। "ননদিনী বোলো নাগরে সবারে।" অথবা "ওগো সজনী রাই অঙ্গ সাজাবে।" ইত্যাদি গানই এর প্রমাণ। তাছাড়া গানগুলোতে যে সব সুর ও তাল ব্যবহৃত হত সেই-গুলোই একথা প্রমাণিত করে। খট্টভৈরবী-যৎ, টোড়ী-ঝাঁপতাল, পরজ-আড়া, খমাজ-যৎ, সিন্ধু ভৈরব-আড়া, সুরট-যৎ, ঝিঁঝিট-যৎ, ললিত-কাওয়ালী, ভৈরবী-মধ্যমান, সরফরদা-কাওয়ালী, বরোয়াঁ-তেতালী প্রভৃতি। দাশরথি রায়ের মধ্যে স্বভাবজাত কবিপ্রতিভার স্ফূরণ হয়েছিল। সেই সংগে সংগীত-প্রতিভা সংমিশ্রিত বলেই "দাশুরায়" উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত নাম। কিন্তু আজকাল কৃত্রিম পাঁচালীরূপে গান প্রচারিত করা হচ্ছে বলে গানের প্রকৃত মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীধর কথক (৮১৫—?)—হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবতে বুৎপত্তি লাভ করে তিনি পাঁচালীতে ও কথকতায় ব্রতী হন। এর পরে মুর্শিদাবাদে ব্যবসায়িক জীবন সুরু করেন। কিন্তু অবশেষে কথকতায়ই ফিরে আসেন। শ্রীধর সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। গান রচনায় নিধুবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি প্রেমসংগীত, আগমনী, বিজয়া ও অন্যান্য শ্রেণীর গান রচনা করেছিলেন। শ্রীধর কথকের কয়েকটি গান বিশেষ পরিচিত ও সর্বজন-সমাদৃত, দু'একটি গান অনেক সময় নিধুবাবুর নামেও প্রচারিত হয়েছে: 'যাবৎ জীবন রবে কারেও ভালবাসিব না', 'এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না', 'হায় কি লাঞ্ছনা গঞ্জনা', 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে', 'কী যাতনা যতনে মনে মনে মনই জানে'।

উনবিংশ শতকের গান রচনার সংগে বহু নামই সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের গ্রন্থে কতকগুলো রচয়িতার নাম একসংগে পাওয়া যায়—মহারাজ রাজকৃষ্ণ, আনন্দনারায়ণ ঘোষ, আশুতোষ দেব, শিবচন্দ্র দাশ সরকার, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র রায়, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন রায়, দয়ালচন্দ্র মিত্র, কালী মীর্জা, নিধুবাবু প্রভৃতি। এই সঙ্গে পাঁচালী ইত্যাদি সম্পর্কিত রামবসু, রসিক রায় এবং আরো নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া তৎকালীন ও পরবর্তী যাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেকের মধ্যে কয়েকটি নামও বলা যায়—মদন মাস্টার, মোহনচাঁদ বসু, গোপাল ওড়িয়া এবং পরবর্তী যাত্রা-রচয়িতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি। যাত্রা-গানের প্রভাব যে জনসমাজে বিস্তৃত ছিল এ কথার ব্যাখ্যা এখানে দরকার নেই। প্রথমে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে গানগুলো সাধারণত কীর্তন ও পাঁচালী শ্রেণীর আবৃত্তিমূলক হত। এ সময়ে যাঁদের নাম পাওয়া যায় এঁরা হলেন শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাস, সুবল, পরমানন্দ প্রভৃতি। উনবিংশ শতকে যারা যাত্রার নতুন ধারা সৃষ্টি করেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদন মাস্টার—জুড়ি গান, মোহনচাঁদ বসু—টপ্পা রীতি এবং গোপাল ওড়িয়া—গানের সঙ্গে নৃত্য প্রয়োগ করেন। উচ্চ সমাজে এ গান প্রায় এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক নাগাদ নিন্দনীয় ছিল। গোপাল ওড়িয়ার প্রভাব জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে বিস্তৃত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গোপালের উদাহরণে থিয়েটার রচনার কথা ভেবেছিলেন।

গোপাল ওড়িয়া (১৮৩০-৭০ ?)—কটক জেলার জাজপুরের চাষী পরিবারের সন্তান। কলকাতায় ফল বিক্রি করে জীবন ধারণ করতেন। তরুণ বয়সেই সুকণ্ঠের জন্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দলে যোগদান করেন। পরে ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করেন এবং বাংলা রচনা করতে শেখেন। রাধা-মোহন সরকারের দলের মাধ্যমে সুপরিচিত হন। পরে নিজে দল গঠন করেন। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে এবং পরে ঠাকুর বাড়িতেও যাত্রা অভিনয় করেন। ৪০ বৎসর জীবনকালের মধ্যে বেশ কতকগুলো গানের সংগ্রহ রেখে গিয়েছেন। সেকালের কয়েকটি বিখ্যাত গানের মধ্যে ছিল তাঁর "ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া।"

বিষয়বস্তু ও রুচির দিক থেকে যিনি যাত্রা গানকে প্রথমেই কতকটা বিশিষ্ট করে রেখেছিলেন, তিনি কথক ও কীর্তন গায়ক **গোবিন্দ অধিকারী**

(১৮০০?-৭২)। নদীয়া জেলায় বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। ছেলেবেলায় কীর্তন শিক্ষা করেন এবং জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা দলে ছেলেবেলায়ই যোগদান করেন। প্রথমে কীর্তনের দল গঠন করে শ্রোতৃ সমাজকে আকর্ষণ করেছিলেন। পরে যাত্রা দল তৈরী করে অভিনয়ে অবতীর্ণ হতেন। "শুক-সারীর পালা" ও "চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব" যাত্রাপালা দুটো অভিনয়ে ও সংগীতে মনোহরণকারী হয়েছিল।

যাত্রাগানকে যাঁরা পরে সুসংস্কৃত রূপদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণ-কমল গোস্বামী, মনোমোহন বসু, হরিশ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটারী গানে রূপ দেন। এর পর জুড়ি গানের সৃষ্টি হয়। এ যুগের প্রথমদিকেও জুড়ি গান চলেছিল, কিন্তু পরে বিবেকের গানে রূপান্তরিত হয়। মোটামুটি যাত্রার প্রথম যুগে ছিল ধর্মীয় গানের রীতি এবং কোথাও কোথাও লোকগীতির রূপ। বিকাশের সঙ্গে প্রচলিত (টপ্পা) রীতি গ্রহণ করে। পরে সুরকার বৃত্তি যাত্রায়ও যুক্ত হয়। গানের প্রকৃতিতে নানা সংমিশ্রণ আসে। অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষ থেকে সংগীত বিবেচনায় যাত্রা গানকে লোকগীতি পর্যায়ের মনে করা যায় না।

প্রাচীন বাংলা গান বলতে থিয়েটারের গানগুলো বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়—যে সব গান উনবিংশ শতকের গায়ন শৈলীতে বিশেষ ভাবে রচিত এবং গীত। এই শ্রেণীর গানের ধরাবাঁধা কোন বিশিষ্ট রূপ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। থিয়েটার উদ্ভবের সঙ্গে এ গানের সম্পর্ক। থিয়েটারের অবলম্বনেই বেশ কয়েকটি ধারার গানের বিশেষ রূপদান করা হয়েছিল। এর মধ্যে পেট্রিয়টিক বা জাতীয় ভাব সম্পর্কিত বীরত্বব্যঞ্জক অথবা স্বদেশী গান প্রধান। দ্বিতীয় স্তরে আনন্দবোধক হাসির গান, শ্লেষাত্মক গান, নৈতিক প্রবণতার গান এবং ভাঙা ভাঙা ধর্মীয় তত্ত্বের গান রূপ লাভ করেছিল। তা-ছাড়া ক্ষুদ্র খণ্ড প্রেমের ও নৃত্যের গানেরও উল্লেখ করা দরকার। থিয়েটার সংগীত-ক্ষেত্রে যে কাজ করেছে তা আধুনিক গানের প্রবর্তনের সহায়ক। অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রে রচয়িতা রচনা করেছেন, অভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞ ও সুরকার সুর দিয়েছেন ও প্রযোজনা করেছেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়ায় নাট্যাভিনয়ে সুরকার ছিলেন। নাটকে তিনিই প্রথম অরকেস্ট্রা সংযোজন করেছিলেন। অনেক নাট্যকার ও লেখকদের গানের প্রচার হয় নাটকের সুরকারের সহযোগিতায়। এই যুগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রযোজনায়

ববীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যধর্মীয় নাট্যগীতির স্থান স্বতন্ত্র পর্যায়ে। বাংলা নাটকের গানে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের গান প্রাচীন নাট্যসংগীত হিসেবেই বিচার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের গান কাব্য-সংগীত পর্যায়ে এখনো প্রচলিত গীতরীতি।

গিরিশচন্দ্রের প্রভাব শুধু নাট্য-সংগীতে নয়—সাধারণ বাংলা গানেও বিস্তার লাভ করেছিল। বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলেই এই প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। প্রায় ৮০ খানি নাটকেব জন্য দেড় হাজাবের কিছু কম সংখ্যক গান তিনি রচনা কবেছিলেন। গান সম্বন্ধে বা গানের কথা রচনা সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল বলেই সংগীতকাবেব সুর প্রয়োগের কাজ খুবই সহজ ছিল। গিবিশচন্দ্রেব গানে প্রয়োজন-উপযোগী সুর ব্যবহার হয়েছিল। সুবকার হিসেবে অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু), সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু), নবেন্দ্রনাথ সবকাব, জিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুবী, প্রভৃতিব নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রেব গানেব সুবগুলোর অধিকাংশ স্বরলিপি কবে রেখেছেন দেবকণ্ঠ বাগচি। গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক প্রবণতাব জন্যে নাটকের মধ্যে কথকতা, শ্যামার গান, উমার গান প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য কবা যায়। কিন্তু অনেক বচনা কাব্যিক বৈশিষ্ট্যেও সুসমৃদ্ধ। প্রচলিত রাগের প্রয়োগ—খাম্বাজ, কাফি, ভৈরবী ইত্যাদিব বহু প্রকাবেব ও মিশ্র রূপ-গানেব স্বরকে আকর্ষণীয় কবেছিল। তাল সম্পর্কে সহজ ও আন্দোলিত বা নৃত্যলয় ব্যবহাবের পক্ষপাতী ছিলেন গিরিশচন্দ্র—এজন্যে গানে প্রসাদগুণের সৃষ্টি হয়েছে। পববর্তীকালে কিছু কিছু গান গায়ক সমাজের ব্যবহাবেব সামগ্রী হয়েছিল; যথা, বাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো, প্রেমে সই মানা কি মানে ইত্যাদি।

ঢপ কীর্তন: রূপচাঁদ পক্ষী—মধু কান: ষোড়শ শতকের শেষার্ধে খেতুরী উৎসবে ঠাকুব নবোত্তম পদাবলী কীর্তনের পদ্ধতি ও রীতি ব্যাখ্যা করে রূপ নির্ধবণ করে দেন। সেই থেকে পদাবলী কীর্তন বিকশিত হতে থাকে। পদাবলী কীর্তন গোড়ায় ছিল নিবদ্ধ তারাবলী এবং সমধ্রুবা প্রবন্ধ গান। বৃন্দাবনে ধ্রুপদী ভঙ্গির সংগীত শিক্ষা ঠাকুর নরোত্তমের নতুন সংযোজনে সাহায্যকারী হয়েছিল। সংগীতের এই রীতিতে যুক্ত হয় নানা উপাঙ্গ, কথা, দোহা, আখর, তুক, ছুট ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ সংগীত দ্বাদশ তত্ত্ব অবলম্বন করে নায়ক-নায়িকা ভাবের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা অভি-

ব্যক্তিতে বিকশিত হতে থাকে। ঠাকুর নরোত্তমের পর থেকে নানাভাবে কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক সুর বা বিশিষ্ট অঞ্চলে উদ্ভাবিত রূপও সংমিশ্রিত হতে থাকে ঃ গরানহাটি, রেণেটি, ঝাড়খণ্ডী, মন্দারিণী ইত্যাদিই এর প্রমাণ। এভাবে কিছুকাল কাটবার পর পদাবলী কীর্তনে আরো নানা ঢংএর উদ্ভাবন হয়, অর্থাৎ পদাবলী কীর্তন সর্বশুদ্ধ সম্মিলিত বা Synthetic রূপ লাভ করতে থাকে। এভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আসবার পর পদাবলী কীর্তন, জনসাধারণের সংগে সংযোগের জন্যে হোক অথবা তাদের পরোক্ষ দাবীতেই হোক, নতুন রূপ লাভ করে। ঢপ-কীর্তন সেই শ্রেণীরই একটি। ঢপ-কীর্তন সম্বন্ধে নানা মতামত চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে স্বীকৃত মতগুলি এইরূপ ঃ

১। পদাবলী কীর্তনের সংগে পাঁচালার সংযোগ, ২। বাউল পদ্ধতির লৌকিক গানের সংযোগ, ৩। নট-ভঙ্গি ও বিশেষ ক্ষেত্রে নৃত্যের প্রয়োগ, ৪। সংগীতকুশলী নারী কীর্তনীয়ার আসরের গান এবং ৫। বিশিষ্ট পদাবলী কীর্তনীয়া যখন আখরে সাধারণ জীবন-কাহিনীর সংগে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং লোকমনোরঞ্জনার্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে সুরে, কথায় রীতি বহির্ভূত বিষয় যোগ করেন তাকেও ঢপ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ, ঢপ বিশিষ্ট শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের ওপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি প্রচলিত পদ্ধতির বাইরের কথা ও সংগীত প্রয়োগের সংগেও সংশ্লিষ্ট। এই গান নট-ভঙ্গিযুক্ত বাউল, পাঁচালী, রাগসংগীত। বিশিষ্ট হাল্কা ঢংএ গীত যে কোন একটি বা দুটি লক্ষণযুক্ত এ গান অনেকটা প্রচলিত জলসার গানের সামিল। বিগত যুগে বহু বিশিষ্ট গায়িকা ঢপ গানের আসর জমিয়েছেন জানা যায়। এমন কি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পূর্বেও যারা ঝুলন, দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবে আখড়ায় বা নাটমন্দিরাদিতে ঢপকীর্তন শুনেছেন তাঁরা জানেন ঢপ কীর্তন বিশিষ্ট সাংগীতিক রূপেরই প্রতিফলন। মধুকানের রচনা ভাষা বা পদ-বিশ্লেষণ করে তা বোঝা যায় না। ঢপ প্রকৃতই সাংগীতিক রীতি বিশেষ।

জনশ্রুতি আছে **মধুসূদন কিন্নর (মধু কান)** ঢপ কীর্তন প্রবর্তন করেন। কিন্তু আসলে **রূপচাঁদ পক্ষী** নামক জনৈক বিখ্যাত লৌকিক গানের গায়ক বাউল ও পাঁচালীর সংগে পদকীর্তন সংমিশ্রিত করে ঢপ গানের প্রবর্তন করেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে এর উল্লেখ লক্ষ্য করা যেতে পারে। রূপচাঁদ সুকণ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে বৃত্তি ছিল কথকতা। পরে তিনি কথকতা ত্যাগ

করে কীর্তনের দল গঠন করেন এবং ঢপ গানের প্রচলন করেন। এই গানে তিনি সম্পূর্ণ রাঢ় দেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন। ডুবকি নিয়ে গান করা এবং হাল্কা সুর প্রয়োগ করা—এই দুটো বিশেষত্ব রূপচাঁদের ঢপ গানে ছিল। গানের ভঙ্গি এবং গানের পরিবেশই তাঁর লক্ষ্য ছিল, আখর ইত্যাদি নয়। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। রূপচাঁদের পর ঢপ গানের গায়ক বলে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যামদাস বাউল ও যশোহর গোপালনগরের মোহনদাস বৈরাগী। রূপচাঁদ অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসের সংগে সম্পর্কিত। বেঁচে ছিলেন প্রায় আশি বছর।

মধুসূদন কিন্নর আনুমানিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যশোরের উলসী গ্রামে কীন্নর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বেত্রবতী নদীর তীরে তাঁদের বাস ছিল। কিন্নর গোষ্ঠী ছিল নট-সম্প্রদায়। পটুয়াদের মতো গান ও নৃত্য এঁদের ব্যবসায়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান বলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি; ছেলেবেলায় গান রচনা করতেন, যাত্রার দলেও যোগ দিয়েছিলেন। স্বভাবজাত সাংগীতিক কুশলতার ফলে যৌবনে ঢাকায় বিশিষ্ট ওস্তাদের কাছে রাগ-সংগীত শেখেন। পরবর্তী শিক্ষা যশোহরের রাধামোহন বাউলের কাছে এই দুই ধারার শিক্ষা সংযোগ হয়েছিল মধুসূদনের কীর্তন গানে। একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় মধুসূদনের গানে পাঁচালী ও বাউল গানের বা লৌকিক সুরেরও ছন্দের পটুত্ব যেমন ছিল তেমনি অন্য দিকে রাগ-সংগীতের কৌশলও ছিল যাতে মধুসূদন নিজে ঢাকায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কাজেই তিনি ঢপ গানে রাগ-সংগীতেরও প্রয়োগ করেন। ঢপ-কীর্তন এভাবেই বিশিষ্ট আসরের গানে পরিণত হয়। অর্থাৎ 'ঢপ' গানে মধুকানের দ্বারা নবরূপায়ণ হয়েছিল। গানের ভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মধুসূদন সাদাসিধা কীর্তনের দল করেন নি, মেয়ে গায়ক নিয়ে পেশাদারী দল সৃষ্টি করেন। উপযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত রচনারও আরম্ভ এই সূত্রে। সাংগীতিক বিচারে মধুকান ঢপ কীর্তনের নব প্রতিষ্ঠা করেন, পাঁচালী রীতির গান থেকে ঢপকে উপরি স্তরে ন্যস্ত করেন। অর্থাৎ রাগসংগীতের আমেজ লাগিয়ে ঢপ গানকে পূর্ণ সংগীত-আসরের বা জলসার গানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাংগীতিক কুশলতায় মধুকানের পূর্বপুরুষের যে ঐতিহ্য ছিল তার সংগে যুক্ত হয় তাঁর নিজের দক্ষতা এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীদের কুশলতা। মধুকানের পরিবার

বর্গ সংগীতের দলভুক্ত ছিল। রচনা রীতির ভাষা ও ভাব বিশ্লেষণের আগে আমাদের বিচারে মধু কানের বৈশিষ্ট্য সংগীতের ঢং-এ নিবদ্ধ। কারণ তিনি নিছক পাঁচালীর পরিবেশ থেকে ঢপ-কীর্তনকে সাংগীতিক সৌকুমার্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই ভঙ্গিটি পরে ঊনবিংশ শতকেই সংগীতশিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিংশ শতকের গোড়ায় ঢপ কীর্তনীয়ার তালিকায় ছিল বিশেষ কৌশলী সংগীতজ্ঞ গায়িকাদের নাম। আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, পদাবলী কীর্তনের পদ্ধতিমূলক রীতি বহির্ভূত যে ভাঙা কীর্তনের প্রচলন আজকাল দেখা যায়, তার ইতিহাসের সংগে ঢপ কীর্তনকে যুক্ত করা না গেলেও ঢপ কীর্তনই এই রূপের পথ-প্রদর্শক বলা চলে। বিশিষ্ট পদাবলীকারগণ ঢপ কীর্তনীয়াকে সুনজরে দেখেন নি, বরং যে পদাবলী-গায়ক রীতি-বহির্ভূত অংশের সংযোজন করতেন তাদের ঢপ-শ্রেণীর বলেই শ্লেষ করা করা হত। কিন্তু 'ঢপ' প্রকৃতপক্ষে নতুন রীতি সৃষ্টির জন্য একটি নাম। মধুকান এই রীতির পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। মধু কান প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল বেঁচে ছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ বিষ্ণুপুর ঘরাণা ও অন্যান্য ॥

ঘরাণা ও বিষ্ণুপুরী—ঘর শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে সংগতি-সম্পন্ন অথবা সুখ্যাত পরিবার বা বংশ বোঝায়। সংগীতে ঘরাণা শব্দটি খানিকটা সেই অর্থেই ব্যবহৃত। কথাটির মূলে ধারাবাহিকতার ভাবও যুক্ত, অর্থাৎ কেউ ইচ্ছে করে কোন ঘরাণার সৃষ্টি করেন নি। ঘরাণা শব্দে কয়েকটি সাংগীতিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রে যাঁরা ঘরাণা বজায় রাখেন তাঁরা মূল নতুন সৃষ্টির কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখেন এবং বিশিষ্ট মৌলিক সংগীত রীতির—১ বংশগত চর্চার অধিকারী, ২ কোন স্থানীয় চর্চার অধিকারী ও ৩ পরম্পরাগত চর্চার অধিকারী এই ঘরাণেদার। যাঁরা এই-রূপ অধিকারী (ঘরাণেদার) রূপে পরিচিত হন তাঁদের সংগীতে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় এবং এই লক্ষণগুলিই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণ বা ঘরাণার চিহ্নগুলি বস্তু, অঙ্গ, অংশ, রীতি বা ভঙ্গি এবং গায়ন-কৌশল প্রভৃতির নব-রূপায়ণের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি পরস্পর নির্ভরশীল বলেই একসঙ্গে সকল গুণের কথা আসে, কিন্তু বিশেষ ঘরাণা একটি কিংবা

গুটি লক্ষণের জন্যেও খ্যাতি অর্জন করতে পারে। আমরা গায়ক এবং বাদক ঘরাণেদারদের বংশজ নামে বা স্থানীয় নামেই চিনে নিতে পারি। গায়ক ঘরাণার বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এখানে ধ্রুপদী রীতির কথা আসে। ডাঃ বিমল রায় 'ঘরাণা' নামক বিশিষ্ট প্রবন্ধে (সুরচ্ছন্দা : বর্ষ ১৯ ॥ সংখ্যা ৯ ॥ আশ্বিন '৮০ ॥) ধ্রুপদ ঘরাণার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার উল্লেখ করা যায় : ১ সেনী, ২ গ্বালিয়র, ৩ তিলমণ্ডী ৪ অত্রৌলী, ৫ জয়পুর, ৫ আগ্রা ৭ উদয়পুর ৮ বেতিয়া ৯ বনারস ১০ বিষ্ণুপুর। বলা বাহুল্য, সেনী ছাড়া সকলেই স্থানীয় নামে পরিচিত। "সেনী ঘরাণার সৃষ্টি তানসেন থেকে। তাঁর পুত্র ও জামাতার প্রভাবে নতুন ভাবে গ্বালিয়র, রবাবী ও বীণকার ঘর তৈরি হয়। ··বিষ্ণুপুর ঘরাণাকে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন আজ আর কেউ তাকে সেভাবে রাখবার চেষ্টা করছেন না।" অন্যদিকে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বলেছেন, "মোগল রাজত্বের পর দিল্লীর গুণীমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারতের দুই অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। তানসেনের নিজ বংশধরগণ পূর্বদিকে চলে এলেন (তাঁদের নাম পুরবীয়া) ও তাঁর শিষ্য-বংশীয় রবাবীগণ ও দৌহিত্র বংশীয় বীণকারগণ পূর্বভারতে এসে বনারস-ধামে ভদ্রাসন স্থাপন করে নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমান রাজা ও নবাবদের সম্মানিত পূজা উপচার লাভ করলেন।· ·বিষ্ণুপুরের মহারাজা রবাবী ছজ্জু খাঁর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ও ধ্রুপদী জীবন খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন ও তাঁকে যথোচিত সম্মান ও সমাদরের সহিত রেখেছিলেন। বাহাদুর খাঁ কয়েকজন উত্তম বাঙালী শিষ্য তৈরি করে গিয়েছেন। পরলোকগত বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী যদুভট্ট বাহাদুর খাঁরই শিষ্য-বংশীয় ছিলেন। যদুভট্টের ন্যায় গায়ক ভারতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নি।" শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর এই উক্তি কিংবদন্তী-নির্ভর। বিষ্ণুপুর ঘরাণা সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থে এরূপ উক্তি থাকার জন্যে বিষ্ণুপুর-ঘরাণা সেনী ঘরাণেদার বলে উল্লিখিত হয়। আসলে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদভঙ্গির উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণসূচক তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮শ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯শ শতক বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ পদ্ধতি একটি বিশিষ্ট ধারা সৃষ্টি করেছে। সংগীত প্রবাহ উত্তর ভারতীয় সাংগীতিক ভঙ্গির দিক থেকে তেমন মৌলিক নয়, তা সত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলে সংগীত পরিবেশ সৃষ্টি ও বাংলা গান রচনার পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছিলেন বিষ্ণুপুরের সংগীত-কুশলীরা। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতক থেকে কলকাতায়ও

কয়েকটি সংগীত ঘরাণার আমদানী হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য কলকাতার বহুমুখী সংগীত-সঞ্চয়-কেন্দ্র থেকে বেশি প্রাচীন নয়। মোটামুটি ধ্রুপদের প্রসার ও প্রচারে এবং নানা ক্ষেত্রে ধ্রুপদের প্রয়োগে বিষ্ণুপুরী সংগীতশিল্পী-গোষ্ঠীর বিশেষ অবদান অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর নানাভাবে ভারতের সংগীত-ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, পূর্বাঞ্চলে পরিপুষ্টি দান করেছে।

মল্লভূমির ইতিহাস অতি প্রাচীন। সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা রাজাদের স্বভাবজাতই ছিল। প্রাচীন যুগ থেকে উত্তর ভারতে তীর্থযাত্রীরা পুরী-তীর্থে যাবার পথে বিষ্ণুপুর হয়ে যাতায়াত করতেন। সেই কারণে বিষ্ণুপুরে উত্তর ভারতীয় সংগীত-কুশলীদের সমাগম হত। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের সংগীত-শিক্ষা এমনই একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব সংগীতজ্ঞ বা ধ্রুপদীয়া থেকে হয়েছিল, এরূপ মতও বর্তমান। বাহাদুর খাঁর বিষ্ণুপুরে আসা ও অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতানৈক্য আছে। প্রথমত বলা হয় দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সময়ে তানসেন-পুত্র বিলাস খাঁর অধস্তন ৭ম বা ৮ম বংশধর ধ্রুপদী বাহাদুর খাঁকে ৫০০ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করা হয়, সেই সঙ্গে আসেন পাখবাজী পীরবক্স। আসলে বাহাদুর খাঁ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। রঘুনাথ সিংহ মারা যান ১৭১২ খৃঃ নাগাৎ। কাজেই বাহাদুর খাঁ নিশ্চয়ই পরে এসে থাকবেন। এরপর বলা হয়ে থাকে বাহাদুর খাঁ শিক্ষা দান করেন গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই নাজির এবং বৃন্দাবন নাজিরকে। গদাধর চক্রবর্তী কৃষ্ণমোহন গোস্বামী ও রামশঙ্করকে শিক্ষা দেন। এসব বক্তব্যের পেছনে ঐতিহাসিক তথ্য নেই। গদাধর চক্রবর্তী সম্বন্ধে পরবর্তীকালের অনুমান ছাড়া আর বিশিষ্ট কোন তথ্যগত পরিচয় মিলে না। দ্বিতীয়ত, সেনী ঘরাণার ধ্রুপদ রীতির সঙ্গে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ রীতির সামঞ্জস্যও স্বীকৃত নয়। নানা কারণে গদাধর চক্রবর্তীর সংগীত ধারার সঙ্গে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের সংগীত-ধারার সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না। গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর নানা বিচারে সমসাময়িক হয়ে পড়েন।

বাহাদুর খাঁর পিতামহ গোলাব খাঁ ছিলেন সদারঙ্গের সমসাময়িক, কাজেই তিনি হয়ত অষ্টাদশ শতকের অষ্টম দশকে বিষ্ণুপুরে এসে থাকবেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন চৈতন্য সিংহ। এ সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বাহাদুর

খাঁ কতকাল বিষ্ণুপুরে ছিলেন—তাও সমস্যা। নানাদিক থেকে চিন্তা করলে রামশঙ্করের শিক্ষা ও সংগীত ক্ষেত্রে অবদান লক্ষ্য করলেই এই বিচিত্র ঐতিহাসিক জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে রামশঙ্করই বিষ্ণুপুরের সংগীত ধারার মূলে—একথা সকলেই বলেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য—পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্যের পুত্র রামশঙ্কর আনুমানিক ১৭৬১ তে জন্মগ্রহণ করেন। রামশঙ্কর পিতার কাছ থেকে ছেলেবেলায় সংস্কৃতে পারদর্শী হন এবং পাণ্ডিত্যের জন্যে বাচস্পতি উপাধি লাভ করেন। সংগীত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ২০।২২ বৎসর বয়সে। পরিণত বয়সেই তিনি রাজার সংগীত সভায় এসেছিলেন। রামশঙ্কর কার কাছে শিখেছিলেন স্পষ্ট ভাবে জানা যায় না। গদাধর চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষার প্রসঙ্গ অসঙ্গতিপূর্ণ। তাছাড়া রামশঙ্করের যে সংগীত ধারা শিষ্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়ে এসেছে তার সঙ্গে সেনী রচনার ধ্রুপদ সুসমঞ্জস নয়। কিন্তু যেখান থেকেই গান সংগ্রহ করুন বা শিখে থাকুন, কণ্ঠের ঐশ্বর্যেও রাগালাপের বৈশিষ্ট্যে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। রামশঙ্করের অবদান দুইটি দিকে প্রসারিত। একটি, সংগীত রচনার কৌশলে অর্থাৎ গান রচনায় তিনি বিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়ত বহু স্বনামধন্য কৃতী শিষ্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের শিক্ষা এবং সংগ্রহের দ্বারা বিষ্ণুপুর ঘরাণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। রামশঙ্করের বিশেষ শিষ্যবর্গ ঊনবিংশ শতকের রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী এবং অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যদুভট্ট প্রথম অবস্থায় অল্পকাল রামশঙ্করের কাছে শেখেন, কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষা হয় স্বতন্ত্র স্থলে। তাঁর গানে বিষ্ণুপুরী ঢংএর ছোঁয়া লাগে নি।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—রামশঙ্করের প্রধান শিষ্য যিনি তাঁর সুর-ভাণ্ডারের বিশিষ্ট অধিকারী ছিলেন। রামশঙ্করের পর বিষ্ণুপুরের রাজসভায় প্রধান এবং সংগীত-শিক্ষাদাতা রূপে একমাত্র সার্থক আচার্য হয়েছিলেন। তিনি পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রতি আসক্ত হন। রামশঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেকে সংগীত-শিল্পী হিসেবে সার্থক করে তোলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা গোড়া থেকেই অনন্তলালকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছিলেন। মহারাজ গোপাল তাঁকে সংগীত-কেশরী নামে অভিহিত করেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহের সময়ে বিষ্ণুপুরে সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, অনন্তলালকে কেন্দ্র করে শিষ্য-মণ্ডলী গড়ে ওঠে। অনন্তলালের

পুত্রদের মধ্যে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ, সুরবাহার ও মৃদঙ্গে পারদর্শী ছিলেন, বিশিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। রামপ্রসন্নের সংগীত শিক্ষা অনেকটাই কলকাতায়। অনন্তলালের শ্রেষ্ঠ শিষ্য পুত্র গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীতের ক্ষেত্রে জীবিত কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রধান ধারক হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রূপে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি গ্রন্থ এখনো বর্তমান। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রবীন্দ্র-প্রথমজীবনের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরের গায়ক, কিছুকাল অনন্তলালের কাছে শিখেছিলেন কিন্তু তিনি বিষ্ণুপুর ঘরাণা পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। এই দিক থেকে তিনিও প্রখ্যাত গায়ক যদুভট্টের মতো স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেন। অনন্তলালের অন্যান্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

যদুভট্ট—সে যুগের ধ্রুপদ গানের একটি উজ্জ্বলতম সংগীত প্রতিভা। যদুভট্ট তাঁর সংগীত প্রতিভার জন্যেই ঠাকুর পরিবারের সংগে যুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীতাচার্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সংগীত শিক্ষক হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সংগীত শিক্ষা দান করেন। শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রও যদুভট্টের নিকটে সংগীতের অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং বন্দেমাতরম গানটির আদিসুরকার তিনিই ছিলেন। যদুভট্টের বাংলা ও হিন্দী গানের সংকলন রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংগীত মঞ্জরী" গ্রন্থে পাওয়া যায় যদুভট্টের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, 'তাঁর ছিল প্রতিভা', অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করতো। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। যদুভট্টের মতো সংগীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ'। যদুভট্ট খাণ্ডারবাণী রীতির গানে বিখ্যাত ছিলেন।

যদুভট্ট ১৮৪০-এ বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা কাটে বিষ্ণুপুরে, সে সময়ে স্বল্পকালের জন্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে প্রথম শিক্ষা। কৈশোর অতিক্রম না করতেই কলকাতায় আসেন। এখানে সুখ্যাত ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে প্রায় ১০ বৎসর ধ্রুপদ শেখেন। এর পরের কিছুকালের শিক্ষা দিল্লী, গোয়ালিয়র, জংপুর প্রভৃতি স্থানে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজসভার সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন (পঞ্চকোট, ত্রিপুরা ইত্যাদি)। প্রায় ৪৩ বছর বয়সে ১৮৮৩ নাগাৎ তিনি লোকান্তরিত হন।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী—যদুভট্টের পরবর্তী বিষ্ণুপুরের কৃতী সন্তান। পিতা জগৎচাঁদ গোস্বামী বিখ্যাত পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন। জন্ম বিষ্ণুপুরে ১৮৬০ খৃঃএ। প্রথম জীবনে বিষ্ণুপুরেই শিক্ষা যদুভট্ট ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ১৫ বছর বয়স নাগাৎ সংগীত শিক্ষার জন্যে কলকাতায় আসেন। প্রথমে কিছুকাল গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষার পর রাধিকাপ্রসাদের দীর্ঘকাল শিক্ষা চলে কলকাতায় বেতিয়া ঘরাণার শিবনারায়ণ মিত্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে। যদুভট্টের শিক্ষা তিনি স্মরণ করতেন। রাধিকাপ্রসাদের সময় তাঁর সমকক্ষ সংগীতজ্ঞ কলকাতায় ছিল না। উত্তর ভারতীয় সংগীতে, বিশেষ করে ধ্রুপদে, তিনি বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছিলেন যদিও ধ্রুপদ ও খেয়াল দু'ই গান করতেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রাধিকাপ্রসাদের সংগীত-ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহের জন্যে আগ্রহান্বিত ছিলেন। সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে তাঁর সংগীত-প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছিল।

রাধিকাপ্রসাদকে কেন্দ্র করে বাংলা গানের নবরূপায়ণ হয়েছিল। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ রাধিকাপ্রসাদকে আদি-ব্রাহ্ম সমাজের সংগীতাচার্য করতে সক্ষম হন। সেই সূত্রে বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রেখে যান। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর সংযোগ দিলীপ কুমার রায় ১৯৩৮-এ সাংগীতিকীতে এ কথাটি সুন্দর করে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ গোঁসাইজির সহযোগে দুইটি স্মরণীয় কাজ করেন বাংলা গানের চাষ-আবাদেঃ প্রথমে বাংলা গানের বীজ বপন করে ধ্রুপদী সুরের মাটিতে—গোঁসাইজির নানান হিন্দি ধ্রুপদ ভেঙ্গে অবিকল সেই সুর তালের কাঠামোয় বাংলা গানের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন, দ্বিতীয় নিজের অনেক মৌলিক বাংলা গান এবং ব্রহ্ম সংগীত তাঁকে দিয়ে সুর সংযোগ করান। এর ফলে রাগভঙ্গিম বাংলা গানের ফসল যে সে যুগে বেশ একটু সমৃদ্ধ হয়েছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।' শেষ জীবনে কিছুকাল পাথুরিয়াঘাটায়, পরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ব্যবস্থাপনায় বহরমপুরে সংগীত শিক্ষাদান ইত্যাদিতে কাটিয়ে শেষ জীবন বিষ্ণুপুরে অতিবাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় রচনার জন্যে যেমন তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তেমনি গোঁসাইজীকে সম্মানও করতেন। তিনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনেও ছিলেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে যাঁরা বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী,

জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি সুখ্যাত। দিলীপ কুমার রায়ও কিছুকাল শিখেছিলেন। ১৯২৪ সালে গোঁসাইজীর দেহান্ত হয়। জীবনের এই শেষ বছরেই তিনি লক্ষ্নৌ সংগীত সম্মেলনে তাঁর বিশিষ্ট সংগীত কলার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখে আসেন।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী—উনবিংশ শতকের সংগীত ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। একাধারে দুইজন বিশিষ্ট সংগীত জ্ঞানীর এবং বিশিষ্ট শিল্পীর গুরু, অন্যদিকে সংগীত চিন্তায় ও গ্রন্থ রচনায় অগ্রগামী ছিলেন। ১৮১৩ (মতান্তরে ১৮২৩) খ্রী-এ মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ক্ষেত্রমোহনকে বালক বয়সেই রামশঙ্করের কাছে সংগীত শিক্ষার জন্যে রেখে আসেন। রামশঙ্করের কাছে কয়েক বছরে শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় আসেন এবং এখানেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর শিষ্য। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে ন্যাসতরঙ্গ-বাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত।

সংগীত বৃত্তিরূপে গ্রহণ করবার সংগে সংগে তিনি নিজে শিক্ষা থেকে বিরত হন নি। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারে নিযুক্ত বারাণসীর বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র তাঁর দ্বিতীয় সংগীতগুরু, এই শিক্ষায় ধ্রুপদ ও যন্ত্র সংগীত উভয়েই পারদর্শিতা লাভ করেন। ক্ষেত্রমোহন সর্বপ্রথম বাদ্যবৃন্দ বা অরকেস্ট্রা প্রবর্তক। বেলগাছিয়ায় বাংলার আদি নাট্যশালায় রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ে বাদ্যবৃন্দ তিনি প্রথম রচনা ও প্রযোজনা করেন। সেই সংগে দণ্ডমাত্রিক স্বর-লিপিও ক্ষেত্রমোহনের প্রথম উদ্ভাবনা। 'সংগীত সমালোচনী' নামে একটি সংগীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকাও তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। পদ্ধতি বিষয়ক রচনায় (আশুরঞ্জনী তত্ত্ব, এস্রাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত) প্রথম পথ দেখান তিনি। সৌরীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক নামে দুইটি প্রতিষ্ঠানেই ক্ষেত্র-মোহন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত সংগীতসার (১৮৬৯) গ্রন্থটি ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিকে প্রণালীবদ্ধ করবার চেষ্টারূপে গণ্য করা যায়। বাংলায় গীতগোবিন্দের স্বরলিপি (১৮৭১) প্রথম প্রকাশ করেন ক্ষেত্রমোহন এবং এই সংগীতে সুরের সংগে রামশঙ্করের শিক্ষার স্মৃতি বিজড়িত। শৌরীন্দ্র মোহনের যন্ত্র-ক্ষেত্রদীপিকায় অধিক সংখ্যক স্বরলিপি ক্ষেত্রমোহনের।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০ ১৯১৪) -পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের সন্তান। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন যিনি না হলে ভারতীয় সংগীতের গৌরব ও ঐশ্বর্য পৃথিবীতে বিভিন্নদেশে সহজে সে যুগে প্রচারিত হত কি না সন্দেহ। তিনি সাহিত্যসেবী ও সংগীতশাস্ত্রী দুইই ছিলেন। কিন্তু এইটুকু বললে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। শুধ অর্থব্যয় ও সংগীত শিক্ষা দ্বারা সংগীত ক্ষেত্রে শৌরীন্দ্রমোহনের মত কাজ করা যায় না। সংগীতকে ইংরেজী ভাষায় প্রচারের পথে বহু আঙ্গিকগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করে গেছেন যেগুলো আজও দেশে-বিদেশে সংগীতালোচনায় ব্যবহৃত হয়। রচনাগুলো :

The Six Principal Ragas of the Hindus (1870). The Eight Principal Ragas of the Hindus (1880). Music by Various Authors (1882)—Western Authors : Capt. N. A. Willard, Sir William Jones, Sir William Osley, F Fowke, J. D. Paterson. F. Goldwin. The Musical Scales of the Hindus (1884) Seven Principal Notes of the Hindus (189), Universal History of Music (1896).

তাছাড়া 'সংগীত-সার-সংগ্রহ' (১৮৭১) গ্রন্থে ছয়টি অধ্যায়ে স্বর, রাগ, তাল, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, রাগ-রাগিণীর ধ্যান সহকারে দেওয়া হয়েছে। শৌরীন্দ্রমোহনের চিন্তা অতি-প্রাচীন বিশিষ্ট গ্রন্থগুলোর সংগে সম্পর্কিত নয়, যতটা ছিল মধ্যযুগের গ্রন্থের সংগে। এ কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এজন্যে যে উত্তর ভারতে প্রচারিত হনুমন্ত মত ও রাগ-রাগিণীর ধ্যানকে তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছেন যা আজকালের সংগীত-চিন্তা এবং ব্যবহারে বা রাগ-শ্রেণী বিভাগে অনেকটাই অবাস্তর হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্যরূপে শৌরীন্দ্রমোহন ধ্রুপদে সুদক্ষ ছিলেন। তা ছাড়া সেতারে তাঁর ছিল অসাধারণ অধিকার। একাধিক বিখ্যাত আসরে তিনি সেতার বাজিয়ে দেশী বিদেশী শ্রোতাদের চমৎকৃত করেছেন। তিনি ঘরাণা ওস্তাদদের কাছে দীর্ঘকাল সংগীত শিক্ষা করেন। পাশ্চাত্যে তিনি ফিলাডেলফিয়া ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অব মিউজিক উপাধি নিয়ে পাশ্চাত্যের সংগে সংযোগ সাধন করেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর স্বরলিপি প্রচারের পৃষ্ঠপোষক তিনিই ছিলেন। রাগভিত্তিক অরকেস্ট্রা রচনা ও

প্রচারে তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহী। সংগীত-বিদ্যালয় স্থাপন, সংগীতের প্রচার ও প্রচারের নানা চেষ্টা, সংগীত বিষয়ে বক্তৃতা দান তাঁর সংগীত চিন্তার ব্যাপকতাব কথা প্রমাণ করে। নাটক রচনা ও অভিনয়ে উৎসাহ এবং এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৫)—উনবিংশ শতকের সংগীত-চিন্তায় দত্তর মত প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক প্রকৃতিব ছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তায় ও কৌশলে অল্প বয়সেই সেরা সংগীত পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে সুকণ্ঠের জন্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ এবং শর্মিষ্ঠা নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় এব প্রমাণ। সেই সূত্রে পরিচয় হয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সংগে, উত্তবকালে ক্ষেত্রমোহনের শিষ্যরূপে কয়েক বছর ধ্রুপদাদি শিক্ষা করেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন কৃষ্ণধন, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ক্ষেত্রমোহনের কাছে শিক্ষাব পর হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ, অন্যস্থলে পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন এবং সেতারেও পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৬৫ খ্রী-এ গোয়ালিয়রে প্রধান শিক্ষকরূপে চাকরি নিয়ে যান। তিন বছব চাকরি করে কুচবিহারে নতুন চাকরি নিয়ে যান। কলকাতায় ফিরে এসে ১৮৭২-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ নিয়ে যান উত্তরবঙ্গে। সংগীতে মনোনিবেশ করবার জন্যে তৎকালীন মূল্যবান চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসেন এবং দি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (মিনার্ভা) ইজারা নেন। কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আর্থিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। অসুবিধার জন্যে আবাব চাকরি নিয়ে কুচবিহারেই চলে যান। এখানেই তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার' (১৮৮৫-৮৬) দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গোয়ালিয়রে থাকাকালীন প্রকাশিত গ্রন্থ—"চীনের ইতিহাস" (১৮৬৬)। "বঙ্গৈকতান"—বাদ্যবৃন্দ সম্বন্ধে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৭-এ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'ঐকতানিক' গ্রন্থের এক বৎসব পূর্বে। পর বৎসরেই প্রকাশিত হয় ভারতীয় সংগীতে হারমনি প্রয়োগ সমর্থনে গ্রন্থ—'Hindusthani Air Arranged for the Pianoforte'। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার পরের গ্রন্থ "সেতার শিক্ষা" (১৮৭০)। গীতসূত্রসারেব পরের গ্রন্থ 'হারমনিয়াম শিক্ষা' (১৮৯৯)।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি রূপে স্টাফ নোটেশান বা পাশ্চাত্য রেখা-স্বরলিপি প্রয়োগ। তিনি বিশেষ ভাবে

গীতসূত্রসারের দ্বিতীয় খণ্ডে ধ্রুপদের স্বরলিপি করে এই পন্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। গীতসূত্রসার গ্রন্থের বহু আলোচনাই তাঁর প্রগতিশীলতা সপ্রমাণ করে। কৃষ্ণধন অবশ্য পাশ্চাত্য 'টনিক সোলফা'ও ব্যবহার করেছেন। কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ, রাগসংগীতে কণ্ঠ প্রয়োগের ত্রুটি, হারমনিয়ামের যুক্তিসংগত সমর্থন, রাগ-রাগিণী ভাবনা সম্বন্ধে কতকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ, গানের রচনার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা এবং সংগীতে গানের কাব্যিক রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি তিনি বিশ্লেষণ করেন। বস্তুত, কৃষ্ণধনই এ যুগের কাব্য-সংগীতের সপক্ষে প্রথম তাত্ত্বিক প্রবক্তা। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি বিশ্লেষণ করে ঠুমরির বৈশিষ্ট্যকে সম্ভাবনাপূর্ণ বলে জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ঠুমরি সেকালে রুচিশীল সংগীত সমাজে গ্রাহ্য ছিল না। রাগ-রাগিণীর বিভাগে হনুমন্ত মতের অযৌক্তিক রূপ সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। শৌরীন্দ্রমোহনের মতো তিনি প্রাচীন-তত্ত্ব সন্ধানী ছিলেন না, কিন্তু রাগ সম্বন্ধে যে ভাবনা তাঁর মধ্যে জেগে-ছিল ভাতখণ্ডে সেই সমস্যার নিরসন করেন উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঠাট পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও প্রচলন করে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নিজে বাংলা শিখে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং আলোচনা-সূত্রে তার উল্লেখও করেছেন।

রাধামোহন সেন—টপ্পা গায়ক হিসেবে নিধুবাবুর শেষ জীবনের সমসাময়িক রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সংগীত গ্রন্থ "সংগীত তরঙ্গ" সম্ভবত বাংলায় রচিত প্রথম তাত্ত্বিক গ্রন্থ, প্রথমে ১৮১২-এ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ নাগাৎ এই গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রাধামোহনের গ্রন্থটি পদ্যে রচিত। গ্রন্থটিতে স্বর, রাগ, তাল, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ আছে। সে যুগের বিখ্যাত সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজিতে নিজের রচনার অনুবাদের সংগে রাধামোহন সেনের কয়েকটি গানও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। কাশীপ্রসাদের গান সেকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ উনবিংশ শতকের রাগসংগীতের প্রকৃতি ॥

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে লাগা মাত্র সকল বিষয়েই সাড়া জাগে। প্রায় ছয়শত বৎসর যে সংগীত মুসলমান রাজত্বের সময়ে বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্ত হয়, সে গান রাজকীয় দরবারেই তা আবদ্ধ থাকে, উচ্চতর সমাজের মনোরঞ্জক হয়েই বজায় ছিল। কিন্তু গায়ক ও বাদক মণ্ডলী নবাবী ও রাজকীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বে সাধারণের মধ্যে স্থান লাভ করেন।

সংগীতে বাংলা – বংশগত সম্পত্তির মতো সংগীত বিদ্যাকে সংরক্ষণের আগ্রহে কলাবন্তগণ তখন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। নিভৃতে চর্চা চলতে থাকে, এবং প্রয়োজন মত নানা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গান ও বাজনা শুনিয়ে গুণী-জ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেন। ফলে যেমন অর্থবান লোকেরা এগিয়ে আসেন তেমনি বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃতি ঘেঁষা মন নিয়ে [illegible] শিষ্ট ব্যক্তিরাও চর্চা সুরু করেন। বাংলাদেশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বহু স্তরে বহু রকমের সংগীতচর্চার পরিবেশ সৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতকে বিষ্ণুপুর ঘরানার পাশাপাশি কলকাতায় বহু স্তরে ধ্রুপদ চর্চার নানা শিল্পী ও সমজদার গড়ে ওঠেন। বিষ্ণুপুরের গায়কগণ অনেকে কলকাতায় এসে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। বারাণসী ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াত সহজ হওয়ায় এ অঞ্চলের ঘরানেদাররা কলকাতায় আসতেন বা কলকাতার লোক বারাণসীতে শিক্ষা করতেন। তেমনি সংযোগ হয় বেতিয়া, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে।

কলকাতায় খেয়াল গান দানা বাঁধতে আরম্ভ করে অনেক পরে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বরং বহু সেরা ধ্রুপদ গায়কদের পাওয়া যায়, কিন্তু সে তুলনায় খেয়াল গাইয়ে পাওয়া যায় না। খেয়ালের আঙ্গিকের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি তখনও বোঝা যায়নি। যাঁরা ধ্রুপদ গান করতেন তাঁরা ধ্রুপদ ও টপ্পা সংমিশ্রিত খেয়াল গান করতেন। ধ্রুপদের পরেই সে যুগের আসরে টপ্পা গাওয়া হত। এ জন্যেই উনবিংশ শতকের বাংলা গানে ধ্রুপদ ও টপ্পার প্রভাব থাকলেও খেয়ালের প্রভাব নেই বললেই চলে। আমরা জানি এই শতকের প্রথম থেকেই টপ্পা গানের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। এ সম্বন্ধে নিধুবাবু ও

অন্যান্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলায় উনবিংশ শতকের গানের ধারা মোটামুটি ধ্রুপদ ও টপ্পার সংমিশ্রিত ধারা, খেয়াল যেন আদৌ নেই।

ঠুমরি—এই কয়েকটি ধারার পরে ঠুমরির কথা আসে। ঠুমরি গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কতকগুলো তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত করা ছাড়া ইতিহাস অনুসরণ করে উনবিংশ শতকের পূর্বে যাওয়া চলে না। ঠুমরি যেমন একদিকে বাঈজীদের নৃত্য সম্বলিত গানরূপে প্রচলিত ছিল এবং সারেঙ্গীয়াদের মুখে মুখে ফিরতো, তেমনি অন্যদিকে কোন কোন ধামার, খেয়াল ও টপ্পা গায়ক নিভৃতে ঠুমরি চর্চা করতেন। ঠুমরি সে অনুসারে বিশিষ্ট গায়ক সমাজের সম্মানিত স্তরে স্থান পেত না। আমরা জানি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠুমরির সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশান্বিত ছিলেন। প্রথমেই ঠুমরি গানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ঠুমরির ঐতিহাসিক দিকটার প্রতি লক্ষ্য করা সুবিধে।

বিষয়বস্তু বিচারে ঠুমরি প্রেমের গান বা প্রেম-নিবেদনের গান। লক্ষ্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু, আসলে ঠুমরি গানের প্রেমের প্রকাশটি শেষ পর্যন্ত গায়ন-ভঙ্গির ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে মানবিক প্রেমে পরিণত হয়। ঠুমরি শব্দটি হিন্দিতে ব্যাখ্যা করা হয় ঠুনকত (ঠুম্) এবং রিঝাবত (রি)—সুর ভঙ্গি ও ছন্দের সম্মিলিত গীত-রীতি দ্বারা চিরন্তন-আধ্যাত্মিক প্রেমের অভিব্যক্তি। এই প্রেম রাগানুগা ভক্তির সামিল—শৃঙ্গার রসের প্রকাশ। শৃঙ্গার ছাড়া ঠুমরি হয় না। সেজন্যে গানের বিষয়বস্তু ও কথাগুলো বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়: (১) রাধার রাত্রি-ব্যাপী অপেক্ষার আকুতি, (২) বিরহবেদনা, (৩) নানারূপ ভান, (৪) অতিরিক্ত আবেগাত্মক ভাব, (৫) পথে বাধাদান ও বলপ্রয়োগ, (৬) ভর্ৎসনা, (৭) মিলনাত্মক ও কামনাবিধুর ভাব, (৮) অন্ধকার রাত্রিতে গোপন মিলন যাত্রা, (৯, মিলনাত্মক আনন্দের ছন্দোবদ্ধ ভাবপ্রকাশ, ইত্যাদি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই বৈষ্ণবিক শৃঙ্গারাত্মক ভক্তিভাবটি মানবিক প্রেমে পরিণত হয় কেন? উত্তর হচ্ছে, এটা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সমর্থিত। মানুষ আধ্যাত্মিকতাকে আপন ভাবেই পরিণত করে নেয়।

এরপর একটি স্তরে ঠুমরির প্রকাশ-ভঙ্গি সুরের বিশিষ্ট কারুকর্মে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে প্রেমের বিষয়টি অত্যন্ত সামান্য সূত্র হয়ে সুরের ভঙ্গিতে লক্ষ্য ন্যস্ত হয়। যেমন ধরা যাক গোলাম আলী খাঁর 'আয়ে না বালম' গানটি। গানের বিশিষ্ট কারুকর্মকে লক্ষ্য করে বলা হয়—ঠুমরি রূপ। 'ভাব' সেখানে

লক্ষ্যবস্তু নাও হতে পারে। এভাবেই বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গিকেই অনেক সময়ে চিনে নেওয়া যায় ঠুমরির অঙ্গরূপে। সেজন্যে আজকাল শ্রোতাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঠুমরির কোন্ অঙ্গটির প্রতি শ্রোতার লক্ষ্য? তাঁরা ঠুমরির প্রকৃতি নিরূপণ করবেন সুরের 'বোল' তৈরির কায়দা লক্ষ্য করে। 'বোল' তৈরি বা 'বোল বানানা' মানে হচ্ছে ভাব প্রকাশের জন্যে সুরকে ছোট ছোট স্তবকে গাঁথা। এই স্তবকে গাঁথা বা বোল-বানাবার কায়দা বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ রকমের। লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, গয়া বা পাঞ্জাবী রীতিগুলোর তারতম্য শুনেই বোঝা যায়। বোল বানাবার জন্যে রাগের নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে কারুকর্ম বিধিবদ্ধ থাকে না, শিল্পী কতকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এ কথা জানা দরকার যে সাধারণত ভৈরবী, খম্বাজ, কাফি ঠাট ও রাগ পিলুতে ঠুমরি গান প্রচলিত। এতদ্ অতিরিক্ত আরো প্রচলিত রাগে ঠুমরি চালু আছে। তালের দিক থেকে ঠুমরির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। তালগুলো—ত্রিতাল, দীপচন্দী, যৎ; অন্যান্য হাল্কা-তালেরও প্রচলন আছে।

সাধারণ ভাবে আজকালের ঠুমরিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমটি প্রাচীন অঙ্গের ঠুমরি—যে গানের সঙ্গে রাগ-সংগীতের বা খেয়ালের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। প্রাচীন-অঙ্গের ঠুমরিরূপে এ গানকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। এর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিকে **খড়ীবোলী** অভিহিত করা হয়, সম্ভবত খেয়াল থেকেই এই রূপ বিকশিত। এ সব গান পূর্বে একতাল, ঝাঁপতাল, পাঞ্জাবী-ঠেকাতে গাওয়া হত।

দ্বিতীয় স্তরে **পূর্বীঅঙ্গের** ঠুমরিতে অনেকটা বিহারের পশ্চিমাঞ্চল, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা ও সন্নিহিত এলাকার লোকসংগীতের সংমিশ্রণ হয়েছে। এ অর্থে সাওন্, কাজরী, লাওনী, চৈতি, ঝুলন প্রভৃতি ঠুমরিরূপে প্রচলিত। এই স্তরের আরো বিশেষ লৌকিক রীতির অভিব্যক্তি হয়েছে বিশেষ ধরণের হাল্কা গানে—যাকে বলা হয় **দাদরা**। শুধু 'দাদরা' তালে গাওয়া গান নয়, কার্ফা তালে এবং অন্যান্য সহজ ছন্দে গীত গানও দাদরা।

হোরী ধমার থেকে হোরী ঠুমরির রূপান্তর হয়েছিল গোড়ায়। হোলী উপলক্ষে এ গানগুলো চাঁচর তালের অনুরূপ ১৪ মাত্রার যৎ (দীপচন্দী) তালে গাওয়া হত। পরে এর সরল প্রকরণও চালু হয়েছে।

এবারে ঐতিহাসিক দিক থেকে ঠুমরি লক্ষ্য করা যেতে পারে। ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল 'প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থে বলেছেন ঠুমরি গানের

অলংকার পূর্ণ সংগীতভঙ্গির সঙ্গে সংগীত-রত্নাকর বর্ণিত **রূপক-প্রবন্ধের** সামঞ্জস্য আছে। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমলতা শর্মা একটি বিশিষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধে বলেছেন ঠুমরির সঙ্গে প্রবন্ধ-গীতির একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা সহজ। মতঙ্গ-বর্ণিত প্রবন্ধের অন্তর্গত **গণ-এলা** শ্রেণীর **নাদাবতী** প্রবন্ধ লক্ষ্য করলে এ অনুমান সত্য মনে হয়। গানের অঙ্গ অবশ্য শার্ঙ্গদেব বর্ণিত **প্রতিগ্রহণিকা, স্থায়ীভঞ্জনী** এবং **রূপকালপ্তির** সঙ্গে মিলে যায়।

এবারে আমাদের বক্তব্য এই যে নায়ক-নায়িকা ভাবের কোন গানই যে হঠাৎ এক সময়ে ঠুমরিতে পরিণত হয়েছে, ভারতীয় ঠুমরির প্রকৃতি লক্ষ্য করলে একথা বলা যায় না। প্রাচীন অলঙ্কার এবং রচনার সংগে সামঞ্জস্য খুঁজতে কোন অসুবিধা নেই। তবু বলতে হবে অন্য অনেকগুলো বিষয় বিচারে ঠুমরির উদ্ভবের জন্যে প্রাচীন যুগে যাওয়া চলে না। (১) প্রথমে, রাধাকৃষ্ণ প্রেম—রাধার সম্বন্ধে ধারণা ও রাধার সত্তার প্রকাশ ষোড়শ শতকের পূর্বে হয় নি। শুধু নায়ক-নায়িকা প্রেমের প্রকাশ নিয়ে এ গান হয় নি। (২) ঠুমরির অস্তিত্বের কথা ঔরঙ্গজেবের সময়ে সপ্তদশ শতকে ফকিরুল্লাহের গ্রন্থে প্রথমে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন রূপ কি ছিল বলা চলে না। (৩) এরপর অষ্টাদশ শতকে একদিকে খেয়াল অন্যদিকে টপ্পা এ দুটোরই নানা পরিবেশ গড়ে ওঠে, ঠুমরি কোথায় ছিল হদিস করা যায় না। একথা সত্য যে হোরী জাতীয় রচনা অনেকটাই প্রাচীন এবং পূর্বেকার। অষ্টাদশ শতকে হোরী ঠুমরির অস্তিত্ব ছিল ধরে নিতে পারা যায়। (৪ উনবিংশ শতকে ঠুমরির বিকাশের প্রকৃত ইতিহাসের জন্যে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়—ক) প্রথমে নৃত্যের সংগে ঠুমরির সম্পর্ক—বিশেষ করে কত্থক নৃত্য, (খ) লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজেদ আলার ঠুমরি রচনা ও প্রচলন, (গ) তবলার বাদনের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঠুমরির বিকাশ। ওয়াজেদ আলী ইংরেজ কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন (১৮৫৬-১৮৮৭)। তখন মেটিয়াবুরুজই লক্ষ্ণৌ ঠুমরির স্থান হয়ে দাঁড়ায়। এরপরে ঠুমরির একটি বিশেষ কেন্দ্র কলকাতা। এখানে গোয়ালিয়রের ভাইয়াসাহেব গণপৎ রাও, মৈজুদ্দিন খান, মীর্জা সাহেব, গয়ার শোনীজী মহারাজ, শ্যামলাল ছত্রী এবং অন্যান্য অনেকে ঠুমরির রীতিকে উচ্চতম সংগীতের পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলাদেশে পরবর্তীকালে ঠুমরি প্রচারের মূলে ছিল সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর শিক্ষাদান।

সংগীতে মহারাষ্ট্র—রাগ সংগীতে মহারাষ্ট্রের দান অপরিসীম। প্রাচীন সংগীতের সংগে মহারাষ্ট্রের সংগীতশিল্পীদের সম্পর্ক বিশিষ্ট। আমরা জানি দেবগিরি শার্ঙ্গদেবের যুগে সংগীত-কেন্দ্র ছিল। নিকটবর্তী অউরঙ্গাবাদের দৌলতাবাদই দেবগিরি রাজ্য। সেখানে যাদব-বংশীয় রাজারা সংগীতের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। এর পরবর্তী ব্যক্তি সংগীত-প্রাণ ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহ্ বা নওরসী আদিল, যাঁর কাছে আকবর আসাদ বেগকে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। আদিলশাহ মারাঠী জানতেন এবং এ এলাকায় ধ্রুপদের সূচনা অনেকটা তাঁরই চেষ্টায়। এর পরের স্তরে মহারাষ্ট্রে ধর্মীয় সংগীত প্রধান হয়েছিল—ধ্যানেশ্বর, নামদেব, তুকারাম, সন্ত একনাথ প্রভৃতি সন্তদের অনুপ্রেরণায়। সেনী ঘরাণার ধ্রুপদিয়াগণ ও অন্যান্য সংগীত কুশলীরা মারাঠা পেশওয়াদের রাজসভা অলংকৃত করে ছিলেন। এঁদের মধ্যে খুশল খান, দেবল সেন, মেনধু সেন, বিলাসবর খান প্রভৃতি নামগুলো উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ইব্রাহিম আদিল শাহের ধ্রুপদ সঞ্চারের পর থেকে নানা ধারার মধ্য দিয়ে আমরা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষ্য করি। এ সময়েই মহারাষ্ট্রে সংগীতরত্ন **বালকৃষ্ণ**বুয়া হদ্দু হস্সু খাঁর গায়কী ভঙ্গিতে খেয়াল গান করতেন। বালকৃষ্ণ-বুয়াই মহারাষ্ট্রে রাগ সংগীতে এ যুগের গোড়াপত্তন করেন। ধ্রুপদ সংগীতের যুগের পরে বালকৃষ্ণবুয়াই খেয়ালের দিকে পথ পরিবর্তন করে দেন। সেই থেকেই মহারাষ্ট্রে খেয়ালের একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গির উদ্ভব হয়।

বালকৃষ্ণবুয়া ১৮৪৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। কিছু সময় দেশে সংগীত শিক্ষার পর, মধ্যপ্রদেশে দেবজীবুয়ার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে থেকে শিক্ষার অবস্থায়ই গোয়ালিয়রে চলে আসতে বাধ্য হন। এখানে এসে তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত হয়েছিলেন। প্রথমে হস্সু খাঁর শিষ্য যোশীবুয়ার কাছে শিখতে সক্ষম হননি, পরে ছয় বৎসরকাল শিখেন। পরে হদ্দু খানের পুত্র মহম্মদ খানের কাছে শেখেন। এর পরে গোয়ালিয়র ঘরাণার বিশিষ্ট অধিকারী হয়ে বোম্বাই ফিরে আসেন। মীরাজ এবং ইছালকরঞ্জীতে ফিরে সংগীত শিক্ষায় শিষ্যগোষ্ঠী দাঁড় করিয়েছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্‌কর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট খেয়াল-ভঙ্গি এরপর নতুন পথে বিকশিত হতে থাকে। বালকৃষ্ণবুয়ার গোয়ালিয়র-গায়কী যাঁরা অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা—পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর, অনন্তমনোহর যোশী, মীরাশীবুয়া, গজানন রাও যোশী, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাস প্রভৃতি। পরবর্তীকালে অন্যান্য ঘরাণা-

গুলোও মহারাষ্ট্রে প্রবলভাবে বিস্তৃত হতে থাকে। এর মধ্যে জয়পুর ঘরাণার আল্লাদিয়া খানের জটিল তান পদ্ধতির খেয়াল ভঙ্গি একটি শ্রেণীতে বিস্তৃত হয়। অন্য দিকে কিরানা ঘরাণার আব্দুল করিম খাঁ মহারাষ্ট্রেই অবস্থান করেন এবং খেয়ালের অংগে একটি বিশিষ্ট স্বকীয় রীতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত খেয়ালের বেশ কয়েকটি ধারা ভারতীয় সংগীতের বিকাশের পথে বিশিষ্ট অবদান।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর (১৮৭২-১৯৩১)। বেলগাঁও-এর অন্তর্গত করুন্দুবাদে জন্ম। ছেলেবেলায়ই বালকৃষ্ণবুয়ার কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। শিক্ষা শেষে সংগীতজ্ঞদের সামাজিক সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হন। এ সময়ে জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে ভক্তিধর্মে দীক্ষিত হন। ৯০১-এ লাহোরে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পলুসকরের এই বিদ্যালয়টি বিশিষ্ট শ্রেণীর সংগীত চর্চা থেকে সবসাধারণের জন্যে মুক্ত-পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রথম প্রচেষ্টা। সরকারের ও জনসাধারণের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। বিদ্যালয়টি কাশ্মীরের মহারাজার বৃত্তিতে এবং অন্যান্য সাহায্যে প্রায় ৮ বছর চলে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে তিনি গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মহাবিদ্যালয় অনেকটা অবৈতনিক ও আবাসিক ছিল। পলুসকর অর্থসংগ্রহের জন্যে অর্থবানদের দ্বারস্থ না হয়ে সাধারণের মধ্যে টিকিট বিক্রয় করে সংগীত সভা করেন। এভাবে সংগীতকে যদি কেউ গণতান্ত্রিক রূপ দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করে থাকেন, তাতে পলুসকরই প্রথমতম। দেশের বিভিন্ন স্থলে বিদ্যালয় স্থাপন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগ সৃষ্টিতে ও গঠনে সাহায্য, স্বীয় মহাবিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনা, মহাবিদ্যালয়ের সংযুক্ত ছাপাখানা পরিচালনা ও তাতে সংগীত গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। সংগীত প্রচারে তিনি সুবক্তা ছিলেন, শিষ্যমণ্ডলীকে নিজে শিক্ষাদান, গ্রন্থ ছাপা প্রভৃতিতেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। ধীরে ধীরে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০০ হয়। যন্ত্র-শিক্ষার্থীদের জন্যে যন্ত্রের ব্যবস্থা, পাঠ্যগ্রন্থের ব্যবস্থা, ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে এক ব্যাপক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন তিনি।

সংগীতামৃত প্রবাহ নামক সংগীত পত্রিকা ছাড়া তিনি ছোট ছোট প্রায় ৭০ খানা ছাপা পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া, কয়েকটি সংগীত সম্মেলনের ব্যবস্থাও পলুসকর করেছিলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের মতো স্থানে এরূপ

বড় একটি প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত ১৬ বছর পরে ১৯২৪ সালে দেনার দায়ে বন্ধ হয়ে যায়। পলুস্‌কর এরপর শিষ্য-পরিবৃত হয়ে নাসিকে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভজনে মন সমর্পণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। পলুস্‌করের যে শিষ্য-গোষ্ঠী আজও তাঁর সংগীতকে সজীব করে রেখেছেন, এঁরা হলেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শঙ্কররাও পাঠক (বেহালাবাদক), বিনায়ক রাও পটবর্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাস, শঙ্কর রাও ব্যাস প্রভৃতি। পলুস্‌কর যে স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন তাকে দণ্ডমাত্রিক (স্বরের মাথায় দণ্ড ব্যবহার করে মাত্রা দেখান) পদ্ধতি বলা চলে। মোটামুটি, বিষ্ণু দিগম্বরের শিষ্যমণ্ডলী এ পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন।

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০-১৯৩৬): ভাতখণ্ডের সংগীত শিক্ষায় অনুপ্রেরণা মাতৃদত্ত। সেতারে পারদর্শিতা লাভ করেন অল্প বয়সে—বারাণসীর পান্নালাল বাজপেয়ীর কাছে এবং পরে গোপালজীর কাছে। এফ এ পাশ করবার সংগে সংগে বোম্বাই-এর 'গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী' নামক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হন। এ:সূত্রে প্রায় তিন শত ধ্রুপদ শেখেন রাওজী বুয়ার কাছে এবং পরে শিক্ষা করেন আগ্রার আলী হোসেন ও বিলায়েৎ হোসেনের কাছে। তাছাড়া এ সময়েই মহম্মদ আলী খান ও আসিক আলী খানের নিকটে ধ্রুপদ, খেয়াল, হোরী, ঠুমরি, তারানা সংগ্রহ করেন। গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীর পরিচালনার সূত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়। আইন পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সংগে ডিগ্রি অর্জন করেও আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন নি, সংগীত গবেষণা ও প্রচারেই জীবন উৎসর্গ করেন। অনেকগুলো ভাষা শিখে বিভিন্ন ভাষার সংগীত-গ্রন্থ পাঠ করতে সুরু করেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ এবং সংগীতের নানা বক্তৃতায় রত হন তিনি। ১৯০৭ সালে কলকাতায় শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগে সাক্ষাৎ করেন। বাংলা শিখে তিনি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতসূত্রসার পাঠ করেন। ১৯০৯ থেকে উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলের ঘরাণা গায়কদের ও বাদকদের সংগে সাক্ষাৎ আলোচনা ও সংগ্রহ চলতে থাকে। গোড়া থেকেই সংগীতের তত্ত্বচিন্তায় গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেন এবং উত্তর ভারতীয় রাগপদ্ধতির মতানৈক্য-গুলি সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন। এই চিন্তার ফলেই ভাতখণ্ডের সমন্বয়-মূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। কারণ সংগ্রহ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে রাগ সম্বন্ধে বিপুল মতপার্থক্য তাঁর কাছে প্রথম থেকেই সমস্যামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত হনুমন্ত মতকে সম্পূর্ণ বর্জন কবে তিনি দক্ষিণ ভাবতীয় মেল পদ্ধতিব অনুসবণ কবেন। সেই সূত্রে দশ-ঠাটেব পদ্ধতি প্রচলন কবেন। ধীবে ধীবে 'লক্ষ্য-গীত' এবং 'অভিনব বাগমঞ্জবী এ দুটো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক কালে ১৯০৯ এ 'হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি'ব প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন খণ্ডেব পব এই গ্রন্থেব শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। পূর্ণ গ্রন্থেব সংকলনে প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয়। গ্রন্থে দশঠাট পদ্ধতি অনুসাবে বাগেব শ্রেণী বিভাগ, তত্ত্ব-মূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা, শ্রুতি ইত্যাদিব বিচাব এবং সংক্ষেপে ও পবিচ্ছন্ন বীতিতে গানেব সম্পূর্ণ সংগ্রহকে ন্যস্ত কবা ভাতখণ্ডেব এক অবিস্মবণীয় কাজ। পূর্বে সপ্তম পবিচ্ছেদে আমবা লক্ষ্য কবেছি উত্তব ভাবতীয় এবং দক্ষিণ ভাবতীয় সংগীত সম্বন্ধে তঁদেব প্রাঞ্জল আলোচনাব পদ্ধতি। ভাতখণ্ডেব মতেব সমর্থন আসে ববোদা, গোয়ালিয়ব প্রভৃতি স্থান থেকে। ববোদা বাজ্যে সংগীত বিদ্যালয় পবিচালনা সম্বন্ধে আমন্ত্রিত হন। বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ আসে শিক্ষক তৈবিব জন্যে। ভাতখণ্ডে বাগতত্ত্বকে সবল ভাবে লক্ষণ-গীতেব মধ্যে যেভাবে বিধৃত কবেছেন তা সবক্ষেত্রেই অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ কবে। ঠাকুব নওয়াব আলী খান তাব মাবিফ-উন্-নগমৎ গ্রন্থে লক্ষণ গীত গ্রহণ কবেছেন। নানাস্থানেব বিদ্যালয় পবিচালনা ও শিক্ষক তৈবীব আবেদন যখন তাঁকে ঘিবে ভিড় কবতে থাকে তখন পুস্তক প্রকাশেব যাবতীয় কাজও এগিয়ে যায়। চীজ সংগ্রহেব ব্যাপাবেও যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ কবেন নানা স্থান থেকে। এবপব কতকগুলো সংগীত সম্মেলন সংগঠিত কবেন। ববোদায় ১৯১৫-তে, দিল্লীতে ১৯১৮-য, বাবাণসীতে ১৯১৯-এ, এবং লক্ষ্ণৌতে ১৯২৫-এ। ১৯২৫ নাগাদ লক্ষ্ণৌ ম্যাবিস্ কলেজেব পত্তন হয়। যে বিদ্যালয়গুলো ববোদা, গোয়ালিয়ব প্রভৃতি স্থানে ছিল তিনি সেগুলো নিয়মিত পবিদর্শন কবতেন এবং উপদেশ দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বতনজনকবকে নিয়মিত শিক্ষাব পব ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁব নিকটে ঘবাণা গানেব শিক্ষাব ব্যবস্থা তিনিই কবে দেন। বিদ্যালযেব শিক্ষায় তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টাব ত্রুটি কবতেন না। সংগীত ক্ষেত্রে ভাতখণ্ডেব বিশ্লেষণী প্রতিভা, কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কলানৈপুণ্যেব সমান্তবাল প্রযোগ হয়েছে। ৬৭ বছব জীবনকালেব মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিপুল সংগ্রহ, সংস্কাব, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং ব্যাপক ও সহজ তাত্ত্বিক আলোচনা কবে বহুকালেব লুকোনো সম্পদকে সাধাবণেব হাতে তুলে দেন; তাঁব দান সংগীত-ইতিহাসে চিবস্মবণীয় হয়ে থাকবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মসংগীত ঃ কাব্য-সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত-চিন্তা ॥

ঊনবিংশ শতকের লোক-প্রচলিত বাংলা গানের সাংগীতিক বিভাগে দুটো পর্যায় ঃ প্রথমে ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক গান, পাঁচালী, কবি, তরজা এবং লোকসংগীত ; এবং দ্বিতীয়ে, টপ্পাগান, ব্রহ্মসংগীত, স্বদেশী সংগীত, যাত্রা ও নাটকের গান ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর গানের সুরগুলোর দুটো স্তর, কোথাও বা একটিই সুরের রূপান্তর—গানের স্থায়ী অংশে একটি সুর এবং পরবর্তী অংশগুলোতে আর একটি সুর। দ্বিতীয় শ্রেণীর গানগুলো বিগত শতকের শেষভাগে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্যসংগীতে পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ গানের বিষয়বস্তু যেমন কাব্যিক রূপ ধারণ করে অন্যদিকে সুরও তেমনি Selective বা নির্বাচিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সুর বা সুরের অংশ আর বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে আটকে থাকে না। মোটামুটি সুর ও তালের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গান একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত।

ব্রহ্মসংগীতের পত্তন করেন রামমোহন। তিনি ১৮২৫ খৃঃ-এ আত্মীয়-সভা নামে একটি সম্মিলনের প্রবর্তন করেন এবং সেখানে তাঁরই সংগীত-শিক্ষাদাতা কালী মির্জাকে গায়করূপে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মসংগীতের সূত্রপাত এখানেই ধরা যায়। এরপর ১৮২৮-এ যখন ব্রহ্মসভা নিজ গৃহে স্থাপিত হয় তখন সংগীতকে উপাসনায় প্রাধান্য দেওয়া হল। রামমোহন নিজে গান রচনা করে পথ প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের সংগীত-রাগকল্পদ্রুম গ্রন্থে রামমোহনের প্রায় ৯০টিরও অধিক গান সংকলিত হয়েছে। গানগুলোর কয়েকটি ধ্রুপদ জাতীয়, অন্যান্য গান আড়া, তেওট, যৎ, ত্রিতাল (তিতারা), ঢিমা একতালা প্রভৃতি তালে প্রচলিত রাগ-গান। কতকগুলো গানে চার তুক বা স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ রচনা দেখা যায়। ধ্রুপদী ভঙ্গির কয়েকটি গান রাগ ইমনকল্যাণ, সুরট প্রভৃতি চৌতালে, রাগ কেদারার গান ধামারে, তেমনি আবার আড়া তালে সিন্ধু, ভৈরবী, বরোয়া, পিলু প্রভৃতি টপ্পা ভঙ্গির প্রয়োগ প্রমাণিত করে। পরবর্তীকালের স্বরলিপিতে রামমোহনের যে ৪৪টি গানের রূপের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলোকে মৌলিক সুর বলা চলে না

(প্রফুল্ল কুমার দাস ঃ গবেষণা গ্রন্থ ১ম খণ্ড)। রামমোহনের পর যখন আদি-ব্রাহ্মসমাজের সকল দায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথের ওপর পড়ে (তিনি দীক্ষিত হলেন ১৮৪৩-এ)। দেবেন্দ্রনাথ নিজে গান রচনা করলেন এবং এর পরের যুগে পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ ও জোড়সাঁকো পরিবারের সংগে সম্পর্কিত অন্যান্য সকলকে ব্রহ্মসংগীত রচনায় উৎসাহিত করলেন। পূর্ব থেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তীকে গায়করূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে যুগের অসংখ্য রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল্যবান সংকলন "ব্রহ্মসংগীত" গ্রন্থে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কাঙালীচরণ সেন এই সমস্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে অমূল্য কাজ করেছেন। প্রথম থেকেই বিশ্বভারতীর স্বরলিপি প্রকাশও এ ইতিহাসে বিশেষ স্থানলাভ করছে। লক্ষ্য করতে হবে যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের সংগে এই শ্রেণীর বাংলা গান ব্যাপক হয়েছিল। ভজন, কীর্তন, স্তোত্র, বেদমন্ত্রগান, ইত্যাদি সহ পরবর্তী কাব্যসংগীত থেকে অনেক গান ব্রহ্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এজন্যে ব্রহ্মসংগীতের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন স্বতন্ত্রভাবে করা দরকার। সংগীতের ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীত কাব্যসংগীতের পূর্বরীতির স্থান অধিকার করে। যাঁরা এ গানের সংগে সংশ্লিষ্ট তাঁরা হলেন কালীমীর্জা, নিধুবাবু, দেবেন্দ্রনাথ নিজে, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিত্র, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী এবং আরো অনেক। ব্রহ্মসংগীতের জন্যে আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বরলিপির কতকটা মার্জনা করেন। ব্রহ্মসংগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এইরূপে বর্ণনা করা যায়ঃ

১। ব্রহ্মসংগীতের সুর ও তালে ধ্রুপদ গানই বিশেষ উপযুক্ত, এরূপ ধারণা গোড়ায় প্রবল ছিল। কিন্তু ব্রহ্মসংগীতের গানে কথার ভাব ও তালের সমন্বয়ই প্রধান লক্ষ্য, এজন্যে ধামারে গান রচিত হলেও ধামারের তালচাতুর্যকে প্রয়োগ করা হত না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বরচিত ধ্রুপদভিত্তিক গানের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মসংগীত।

২। ভাল ভাল সুর চয়ন করে গানে প্রয়োগ পদ্ধতি প্রথম যুগে

থেকেই অবলম্বিত হয়। এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন যে তিনি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সংগে মিলে যে কোন গানের সুরে নতুনত্ব বা মাধুর্য লক্ষ্য করলেই তাকে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করতেন।

৩। সংগীতের বিধিনিষেধকে ভেঙে গানে সুর প্রয়োগও কতকটা চালু হয়ে যায়। ব্রহ্মসংগীতে ধ্রুপদ ও টপ্পাকে যেমন ভাঙা হয়েছে, তেমনি কীর্তন ভাঙা হয়েছে, রামপ্রসাদী সুর ও লোকসংগীতের সুর গ্রহণ করা হয়েছে, এবং রাগের নিয়মাবলী সবত্র সমান ভাবে রক্ষিত হয়নি।

৪। রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়বস্তুতে যখন আধ্যাত্মিকতার সংগে মানবিক গুণ, মঙ্গলবোধ, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধ যুক্ত হল এবং নতুন প্রতীকের মধ্য দিয়ে কাব্য-মহিমা আরোপিত হল, ব্রহ্মসংগীত তখন আর কেবল ধর্মীয় ভাবে আবদ্ধ রইল না। লক্ষ্য করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার বিশিষ্ট যুগ থেকে অর্থাৎ সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালীর পর থেকেই ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে কাব্য-সচেতনতার নিগূঢ় সংযোগ হল। অর্থাৎ ১৮৯৫ নাগাৎ ব্রহ্মসংগীতের এই পরিণত স্তর লক্ষ্য করা যায় কথা ও সুরে। এ গান নিছক ভগবদ্ভক্তিতে আবদ্ধ নয়। এর পরের যুগে বিংশ শতকের প্রথম দশ বৎসরের শেষে ১৯০৮-১০ নাগাৎ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি রচনায় আধ্যাত্মিক রসের ওপর কবিত্বের তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল বলা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের উক্তি লক্ষ্য করা যাক—"তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্ম-সংগীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌছাইয়া দিয়াছে।' সেই সূত্রেই বলি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত কাব্যসংগীতে ক্রমপরিণতি লাভ করে। ব্রহ্মসংগীত কাব্যসংগীতেই পরিণত হল; কাব্যগুণের সংগে বাছাই করা সুর ও তাল ও তার অংশ বা নতুন উদ্ভাবিত ফর্ম (form) সুরের অঙ্গে যুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়েই ব্রহ্মসংগীত কাব্য-সংগীতে পরিণত। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই বিশিষ্ট শ্রেণীর চরম প্রকাশ। Principle বা তত্ত্বের দিক থেকে নতুন রচনা পদ্ধতিতেই পরবর্তী যুগের ব্রহ্মসংগীতের মূল্যায়ন হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, অতুল-প্রসাদ ও রজনীকান্তের এই শ্রেণীর কিছু গান ব্রহ্মসংগীতে যুক্ত করা হয়েছে।

॥ কাব্য-সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তা ॥

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানে কাব্যসংগীতের যে বিশিষ্ট ধারার সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, অন্যান্য ভাষায় এই ধরণের গানের সন্ধান মিলে না।

অথচ অন্যান্য ভাষায় আজকের আধুনিক রীতির গান সর্বত্রই পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যসংগীতের ধারা এই আধুনিক রীতির পূর্ববর্তী একটি বিশেষ প্রবাহ। বাংলায় এই স্বতন্ত্র ধারা বিকশিত হবার কারণ ঃ

(১) সংগীত-রচয়িতারা বিশিষ্ট কবি, (২) তাঁদের গানের মধ্যে কাব্য-গুণ ও কবি মানসের প্রভাবই বড়ো, সংগীত তার সহায়ক, (৩) গানের কাব্য-গুণের প্রয়োজনে কবি সুর ও তালকে মুক্ত ভাবে গ্রহণ, বর্জন, নির্বাচন ও সংমিশ্রণের পক্ষপাতী।

প্রত্যেক ভাষার ধর্মীয় গানের মধ্যে কাব্যিক ভাবসম্পদ খুবই স্পষ্ট। মরমী ভক্ত কবিদের গানে সন্ত ভক্ত কবিদের গানে, মন্ত্রগানে, কীর্তনে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসে, আগমনী-বিজয়া গানে ও অন্যান্য শাক্ত কীর্তনে যথেষ্ট কাব্যিক স্ফুরণ দেখা যায়। কিন্তু কাব্য-সংগীত এমন রচনা যাতে কবির জীবনোপলব্ধি ও তদুপযোগী পরিমার্জিত ও বিশিষ্ট কথা বিধৃত থাকে। কাব্য বলতে একটি গানের সীমিত পরিসরের মধ্যে যে জীবনাভিজ্ঞতা ব্যক্ত হতে পারে তাই বোঝায়। যে অর্থে বড়ো রচনাও কাব্য, কবিতাও কাব্য, এমনকি নাটকও কাব্য হতে পারে, গান রচনায় কাব্য তা নয়। গানের নিয়ম ও পরিমিতি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্য দিকে কবি নিজে সুরকার বা কম্পোজার, তার সুরেই গান রচিত। বাংলা সংগীতের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রেষ্ঠ কবি—সেরা কম্পোজার, তার সুরপ্রয়োগের রীতি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ, যা পৃথিবীর সংগীত-ইতিহাসে বিরল।

কিন্তু এ প্রসংগে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—সংগীতে কাব্যপ্রধান রচনার স্থান কোথায়? সংগীতের ইতিহাস ও তত্ত্বচিন্তায় এ প্রশ্ন প্রয়োজনীয়। আমরা ভারতীয় সংগীতে যুগযুগব্যাপী বহু ধারা লক্ষ্য করেছি। সবগুলো শ্রেণীর গান যে রাগসংগীতের নিয়ম পদ্ধতি অনুসারী, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু জমিটা যে ভারতীয় রাগ-সংগীতের বা মেলডির (একক সংগীতের) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাস অনুসারে রাগের ভিত্তিভূমির বাইরে যাওয়া যায় না। এবারে আর একটি প্রশ্নও দাঁড়ায়, তাত্ত্বিক বিচারে সংগীত ও কথার সম্পর্ক কিরূপ?

এর উত্তরে আমরা প্রথমে লক্ষ্য করতে পারি ঃ একশ্রেণীর সংগীত কথাবিহীন বা কথা-সামান্য। যন্ত্রসংগীতে কিংবা কণ্ঠের রাগালাপে কোথাও কোথাও কথার স্থান নেই। কথা-নিরপেক্ষ সংগীতেরই বিশেষ স্থান। কোন

কোন গানে কথা অস্পষ্ট, কতকগুলো শব্দমাত্র—কথা সুর-প্রকাশের ক্ষীণ অবলম্বন। ধ্রুপদ গানে সহজ কথা, সুর ও তালের বাহন, কথার আধিক্য আছে কিন্তু বহুরূপেই তা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। খেয়ালে কথাগুলো কয়েকটি নির্বাচিত শব্দ (কাশ-ভঙ্গির)-সমষ্টি—বিস্তার ও তান ইত্যাদির উপযোগী। টপ্পার কথাও একরূপ তান, পল্টা, বোলতানের উপযোগী শব্দসমষ্টিমাত্র। ঠুংরিতে নায়কনায়িকা ভাব প্রকাশের জন্য ক্রিয়াপদ সম্বলিত কয়েকটি সহজ শব্দই প্রধান। বলা বাহুল্য এসব গানের নির্ধারিত চরণ বা তুক থাকলেও কথা সুরের তুলনায় মৌলিকত্বহীন ও অপ্রধান। নির্বাচিত সুর বা রাগ প্রকাশের বহু রূপের জন্য কথা অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক। অতএব রাগসংগীতে কথা রচনার দারিদ্র্য ও বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সীমার মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট বাগ্গেয়কার ভাল কথা রচনা করতেও পারেন।

কথা ও সুরের সম্পর্ক চিন্তায় অন্যান্য দুএকটি ধারার সংগীতের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। ধর্মীয় সংগীতে কথাই প্রধান, এখানে সুর সহকারী। ভাব প্রকাশের জন্য আবৃত্তিমূলক সুরই হোক বা কতকটা বিকশিত সুরই হোক, নির্দিষ্ট ধরনের সুরের নির্বাচিত অংশ ব্যবহার হয়। কীর্তনে, কথার বিকশিত রূপের সংগে উপযোগী সংগীতের বিকশিত রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু সবত্রই পথ বাঁধা। লোকসংগীতে কথা প্রবল ও স্বতস্ফূর্ত, সুরও ঠিক সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রচলিত বহু বিচিত্র রাগ বা সুরের অংশ নিয়ে রূপলাভ করে লোকপ্রচলিত (popular) সংগীত ও যাত্রা নাটকের গান। এই সুরের সকলই কথা প্রধান।

রাগসংগীতের বিচিত্র সাধনা ও রূপের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় কর্ণাটক সংগীতে। কথা সেখানে রাগসংগীতের রূপানুসারী শাস্ত্রীয় রীতিতে সংগঠিত, বিশিষ্ট সংগীতকারদের ধ্যান, মেলপদ্ধতি ও রাগের বিকাশে কেন্দ্রীভূত। এর মধ্যেও ত্যাগরাজের মতো বাগ্‌গেয়কার জীবনের প্রতি সুরের উপযোগী অমূল্য কবিত্বপুর্ণ গান রেখে গেছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সে সকলই ধর্মীয়, আনুষ্ঠানিক মানবজীবনের নানা অধ্যাত্মবোধের সংগে অর্থাৎ প্রচলিত জীবনধারার সংগে সংশ্লিষ্ট। কর্ণাটক সংগীতে রাগ বিকাশের বৈশিষ্ট্যে সামান্যমাত্র ব্যতিক্রমও নেই। কথা রাগের উপযুক্ত বাহন।

সংগীতের ইতিহাস বিশ্লেষণে সংগীতকলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সুরের

অভিব্যক্তিতে ক্রমবিকাশ, স্বর প্রকাশেব কায়দা, স্বরের গতি বা ছন্দ, সুরের অলংকার এবং ভাব ও রস ইত্যাদি নিয়ে সংগীতের একটি বিশিষ্ট জগৎ। সুবের কি কোন বিশেষ বক্তব্য আছে যেমন কথায় বিশেষ বক্তব্য থাকে? ভারতীয় সংগীত-তাত্ত্বিকের মতে সুবেব আছে বর্ণ, ধ্যানরূপ, প্রকৃতির পরিবর্তনের ভাব প্রদর্শনেব লক্ষণ, এমন কি, ভবতের মতে, প্রতিটি স্বরেও 'রস' সঞ্চিত আছে। রাগের মূলে যে ভাবাভিব্যক্তিব বা মুড (mood) প্রকাশেব এমন সঞ্চয় আছে তা নানাভাবে সংগীত-শাস্ত্রে বর্ণনার চেষ্টা হয়েছে। রাগেব ভাব ও রস সম্বন্ধে মধ্যযুগে বহু আলোচনা পাওয়া গেছে। এই অর্থে রাগ-সংগীত স্ব-নির্ভর, কথার অপেক্ষা রাখে না। পাশ্চাত্য সংগীতের তাত্ত্বিকের মতেও সংগীত একটি অনির্দিষ্ট য়ূনিভার্সাল ল্যাঙগুয়েজ (Universal language' নয়। সংগীতের বিশেষ (Particular) ভাব প্রকাশের গুণ ব্যক্ত করতে জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক তাত্ত্বিক বলেন, সংগীত-বোধ নিভর করে সংগীতের উৎপত্তি ও সময়ের সংগে মানব মনেব সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, সংগীত-চেতনা, পশ্চাৎপট, সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব. অভিজ্ঞতাব ওপর। ভাব-প্রকাশের সংগে সংগীত অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। অন্যান্য বিষয়ের মত সংগীত সংস্কৃতিও নানা ভাবে বহুদিন ধবে বিকশিত হয়, তাই বিশুদ্ধ সংগীত বিশেষ অর্থবোধক।

সংগীতের স্বাতন্ত্র্য যেমনই হোক আমাদেব আলোচ্য বিষয় 'কথা', কথার সংগে সুরের সম্বন্ধ। যদিও সংগীতই প্রধান এবং প্রকৃত সংগীতে কথা অপ্রধান, একথা স্বীকার্য যে জগতেব সকল ভাষায় কথা-সমৃদ্ধ সংগীতই বিশেষ জনপ্রিয় এবং অনেকেব কাছেই বিশেষ বিবেচ্য। ধর্মীয় সংগীত ছাড়া অন্যান্য কথা-প্রধান রচনা মনের ভাবপ্রকাশের প্রধান অবলম্বন বলেই এই সংগীতকে অনেকে প্রাধান্য দেন। পাশ্চাত্য সংগীতেব তাত্ত্বিকেবাও এই সমস্যার সম্মুখীন।

কিছু সংগীতে কথা কোথাও প্রধান, কোথাও অপ্রধান—এ দুটো বিরোধী দ্বিমুখী ভাব বলা চলে। অথচ সংগীতে সুব ও কথার ব্যবহার পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য-মূলক হওয়া দরকার। কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীব সকল সংগীতেই আলোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করে।

Many exponents of music appreciation, as we have discovered, are excessively concerned with literary aspects even in their approach to purely instrumental music. It is per-

haps only natural, then, that they go to extremes when the composition they are dealing with contains a text—

সুরে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া যায় না, সেজন্যেই গানের কথা নিয়ে সংগীত সমালোচকদের মধ্যে মাতামাতি দেখা যায়। বহু শ্রোতা ও শিল্প সমালোচক সংগীতের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে মোটেই ভাবেন না।

Giving listener the unwarranted impression that the work is "about" the text, and that the music merely supports the words. Many singing teachers and choral directors also sin in this direction often leaving singers and others with the conviction that the music is a "translation into sound" of the text.

সংগীতের ইতিহাস চিন্তায় কাব্য-সংগীত বিশ্লেষণ করতে এসে আমরা ঠিক এ রকম এক সমস্যার সামনেই উপস্থিত হই। রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সংগীতের প্রবর্তক। তাঁর প্রধান বক্তব্য: 'সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেটিকে বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সংগে অনির্বচনীয়, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট ছড়া বেঁধে দিয়েছে ছন্দ।"··· "বাংলা দেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর. রূপ।"···রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগের রচনায় বলেছিলেন, "সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে কবিতা ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে সংগীত ততখানি করে নাই।" পরে রবীন্দ্রনাথের এই মত সংস্কার করা হয় যখন তিনি বলেন, "বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপস করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক।···কে বড় কে ছোট তার মীমাংসা হওয়া কঠিন।"···রাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও সাহিত্যপন্থী, যথা, "আমাদের রাগ-রাগিণীর রসটি বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্তবাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্যলোকের দুঃখসুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।···কোন একটা আবেগ প্রকাশে নির্বাক ভৈরব একটা

এবস্ট্রাক্ট আবেগ প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু ঠিক কাব্যের কথাটি বলতে গেলে সে বোবা। অথচ বলতে গেলে যেমন কথার দরকার, তেমনি দরকার সুরের। বাণী ছাড়া কানাড়া হয় বোবা, বাণীর যোগে কানাড়া একটি রস পেয়েছে তার দাম কম না।”...

বলা বাহুল্য, সংগীতের ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদের লক্ষ্য সুর ও ছন্দেই বিশেষ ভাবে ন্যস্ত। এই দৃষ্টিতে কথাও প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্য সংগীতে কথার প্রতি পক্ষপাত আছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীততত্ত্বে কাব্য সমর্থনই প্রবল, যদিও গানে সংগীতের ব্যবহার অনিবার্য। যাঁরা সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করেন তাঁদের মতে সাংগীতিক জগতে কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। সুরের সমগ্রতায় তাঁদের দৃষ্টি—নানা সূক্ষ্ম কাজকর্ম, তান, উপোজ, সুরব্যবহারের ব্যাপকতা তাঁদের কাছে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে অনেক কিছু অবান্তর—সুরবিহার, বিস্তার, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য ইত্যাদি। এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু স্থলে গান ও কবিতা একাকার মনে হবে। অনেক স্থলেই গান কবিতা হিসেবে পাঠ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু গান যেমন কবিতা হয়েছে, বহু কবিতাও সুরযোজনার জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত। অর্থাৎ বহু গানে এমন “গতিশীল” প্রকৃতি আছে যে সে স^ গান কাব্যিক এবং আবৃত্তি-মূলক গুণ সমন্বিত। এজন্যে অনেক গানের কথা সুরকে গতিশীল বাহন রূপে অবলম্বন করতে পারে। এ ধরণেব গানগুলোতে সুরের বৈশিষ্ট্য সামান্য, কিন্তু এগুলো রবীন্দ্রতত্ত্বের দ্বারা সংগীতরূপে সমর্থিত। সাংগীতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীতের বেশির ভাগ বিমিশ্র-সংগীতরূপে বিচার্য। রবীন্দ্রনাথেব গান কাব্যসংগীত রূপে সকলের কাছেই একটি বিশিষ্ট সংগীতশ্রেণী রূপে স্বীকৃত। সুর ও ছন্দ কথার সঙ্গে এমনভাবে সংমিশ্রিত যে রবীন্দ্র-সংগীতের বহুমুখী রূপ অন্য কোন কাব্যসংগীতের সংগে তুলনীয় নয়। এসম্পর্কে বলা দরকার যে শুধু কাব্য নয়, কাব্য উপযোগী সুরজগৎও একটি বিশিষ্ট উদ্ভাবন। এ সংগীত নানা বিচারে বিশিষ্ট রীতি রূপে পরিণত। কাব্য-সংগীত বলতে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি-রচয়িতাদের গানও উল্লেখ কবা হয়, সে অর্থে দ্বিজেন্দ্রলালের গান, রজনীকান্তের গান এবং অতুলপ্রসাদের গান বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান বিশিষ্ট রীতিরূপে রবীন্দ্রসংগীত নামে প্রচলিত। এরপর, নজরুল থেকে আরম্ভ করে সংগীতে আরো একটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়—তার নাম আধুনিক।

রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বিশিষ্ট সুরকার। পৃথিবীর সংগীতের ইতিহাসে এমন কবি-সুরকারের উদাহরণ মেলে না—যাঁর কাব্যজিজ্ঞাসা ও সংগীত সমভাবে সংমিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে ব্যাখ্যার সুরু হতে পারে প্রচলিত কতকগুলো রাগের ধ্রুপদ গান, কতকগুলো প্রচলিত রাগের ব্যবহার এবং বাংলাগান রচনার নানা উপাদান নিয়ে। এ বিশ্লেষণে রাগতত্ত্ব, রাগালাপ, রসতত্ত্ব, তান-অলংকার ইত্যাদির প্রয়োজন মোটেই নেই। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাব্য-সম্পদ গানে পরিণত হয়ে রাগের জমিতেই দাঁড়ায়। শুধু সংগীতের গঠন ও কলা-রূপ স্বতন্ত্র ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। এই গঠন ও ক্রমবিকাশ রবীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট তত্ত্বের ওপরে ন্যস্ত। ইতিহাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক জীবন নানা ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। আমাদের বিভাগগুলো এইরূপ: (১) প্রস্তুতি পর্ব—১৮৮১ পর্যন্ত প্রথম ২০ বৎসর, (২) প্রথম যুগের রচনা (ক) ১৮৮১ থেকে দশ বৎসর, (খ) ১৮৯১ থেকে নয় বা দশ বৎসর (১৯০১), (৩) রচনার প্রথম পরিণত পর্যায়—১৯০১ থেকে ২০ বৎসর এবং (৪) দ্বিতীয় পরিণত পর্যায় ১৯২১ থেকে ২০ বৎসর। রবীন্দ্র-সংগীতের তত্ত্ব যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা অনেকেই এইরূপ বিভাগ করেন। সময়-বিভাগগুলো সংগীতের রচনা প্রকৃতির ক্রমবিকাশ বুঝতে সহায়তা করে। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে সেরা বা লোকপ্রিয় বিখ্যাত গান কোন বিশেষ যুগেই রচিত হয়েছে। বিভাগগুলো শুধু রবীন্দ্র-সংগীত তত্ত্ব ও কাব্য-রচনার সংগে সামঞ্জস্যমূলক। কাব্য-সংগীতের বিষয়বস্তু অনুসারে সংগীত রচনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্যে এ বিভাগ প্রয়োজন। একথা বলা দরকার যে সংগীত-কম্পোজারের মূল্যায়নে গানের সংখ্যা বিশেষ বিচার্য নয়। মোটামুটি, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের রচনায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে যতটা ন্যস্ত, এ সময়ের বা পরের রচনা অনেকটাই সৃষ্টিমূলক বা সুপরিকল্পিত। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় হয়ত গোড়ার দিকের অনেক গান জনপ্রিয় মনে হতে পারে বা সংগীত হিসেবে ভালো লাগতে পারে, আবার পরের যুগের অনেক রচনা একঘেয়ে, মৃদু অথবা দুর্বল মনে হতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিশীল মৌলিক সংগীত রচনা পরের দিকেই

'বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক ভাবে চিন্তা না করলে সৃষ্টির মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্র থিওরি মেনেই বিচার করতে হয়—কথা ও সুরের উদ্বাহ ও মিলনের ফলশ্রুতিই প্রকৃত সংগীত।

রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাখ্যায় তিনটি বিষয় লক্ষণীয়: (১) সংগীত-কুশলতা, (২) সংগীত-রচনার প্রকৃতি এবং (৩) সংগীত-রচনার বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ-পদ্ধতি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-কুশলতা তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রেরণার ফসল। ছেলে-বেলায় সাধারণ সংগীত শিক্ষার কোন নিয়মিত ব্যবস্থাপনায় তিনি মাথা গলান নি। উনবিংশ শতকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। এই পরিবারে সংগীত শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, সংগীত শিক্ষাকে নিয়মিত উৎসাহ দান করা হত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই পদ্ধতি-মূলক ব্যবস্থাপনাব মধ্যে আসেন নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রথম থেকেই সংগীত-রচনার শিক্ষা, সংগীত শিক্ষা নয়। কারণ, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল কণ্ঠের স্বভাবজাত ঐশ্বর্য, তিনি সুগায়ক ছিলেন। তাঁব প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলার প্রচলিত গানের প্রতি। বালক বয়সে কিশোরী চাটুজ্যেব কাছে পাঁচালী শেখা এবং পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে বাংলা গান শেখা তিনি বাল্যজীবনের বড়ো ঘটনা মনে করতেন। সে তুলনায় বিষ্ণু চক্রবর্তীর এবং যদুভট্টের শিক্ষাদান তাঁকে বাংলা সংগীতের বেশি কাছে টানতে পারে নি। অবশ্য তাঁদের গানের সুবের কাঠামো রবীন্দ্রনাথের রচিত গানে রূপ লাভ করেছে। গান শোনাই রবীন্দ্রনাথের মনে শিক্ষার কাজ করেছিল।

রীতিগত শিক্ষার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বরং এ দিকটায় তাঁর শিক্ষা সহজে পরিণতি লাভ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিক্ষাদান সত্যিকারের কম্পোজারের পাঠ গ্রহণ বলা চলে। প্রায় ১৩ বছর বয়সের রচনাই রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের প্রধান ঘটনা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকের জন্যে "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানটি এবং সঞ্জীবনী সভার জন্যে রচিত "এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন" ও "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ" এ দুটি গান। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" সংগীতটি ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। এই বোধ হয় প্রথম রচিত ধর্মসংগীত। এই সব-কটি গানের সুর যোজনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত ছিল বলে মনে হয়। আনুমানিক ১৮৭৮ সালের এপ্রিল থেকে ঐ

বৎসরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমেদাবাদে বাসকালে "নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়," "বলি ও আমার গোলাপ বালা", "শুন নলিনী মেল আঁখি আঁধার শাখা উজল করি"—গান ক'টিতে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে সুর দিয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে সুর তৈরি করতেন আর রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয় চৌধুরী সে সুর নিয়ে গান রচনা করতেন। ২১ বৎসর পর্যন্ত এই শিক্ষা-নবিশির যুগ। সংগীত রচনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের মূলে ছিলেন দেবেন্দ্র-নাথ নিজে, ব্রহ্মসংগীতের ইতিহাস আলোচনায় তা লক্ষ্য করেছি। সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ—গান রচনার জন্যে দেবেন্দ্রনাথের অবাধ প্রশংসা ও পুরস্কার দান। কাজেই কম্পোজারের কাজই রবীনাথের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে, রাগসংগীতের ব্যাকরণ শেখা তাঁর হয়ে ওঠেনি এবং রাগসংগীতের পথ তাঁর নয়, এ তিনি ছেলেবেলায়ই বুঝে নিয়েছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথের মানস গঠনের জন্যে দায়ী তাঁর বিপুল সম্ভাবনাময় সাহিত্যলোক।

রবীন্দ্রনাথের রাগানুসারী গান রচনাকে তাঁর প্রায় একুশ বৎসর বয়সের সীমানার মধ্যে নির্ধারিত করা হয়। তাঁর রচনার উৎস দুইটি—একদিকে প্রথম জীবনে ধ্রুপদ গানের ছকে গান রচনা এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞের হাতে গান তুলে দেওয়া, অন্যদিকে নিজের গাইবার উপযোগী গান ও গীতিনাট্য ও নাটকের জন্যে গান রচনা—দুইটি বিশিষ্ট দিক। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি বৃহত্তম অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল : (১) নিজের বিশেষ ধরনের গায়ন-শক্তি ও গায়কবৃত্তির বিকাশ এবং (২) নাট্য আবেদন। প্রথম বিষয় বা নিজের গায়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সামান্যই বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি কতকটা প্রচার-বিমুখ। কিন্তু গান রচনা ও গান করার আনন্দ তাঁকে উদ্বেল করে দিত এ খবর নানা ভাবেই ছড়ান। আমরা জানি নাটকের গান রচনা রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষ দিক। ভারতীয় সংগীতের প্রথম তাত্ত্বিক ভিত্তি 'নাট্যশাস্ত্র'। নাটক অবলম্বন করেই আমরা সে যুগের গানের রাজ্যে প্রবেশ করি। এ যুগে বিশ্বকবির সংসারে গান শুনতে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্য-নাট্য, নাটক, রূপকনাট্য প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে সাধারণ নাটকের গান সাময়িক ভাবে চালু থাকলেও সহজে অচল হয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়বস্তুতে মৌলিক জীবনোপলব্ধি ও

রূপোপলব্ধি এবং চিরন্তন জীবন-সমস্যা ও সে উপযোগী সংগীত রচনা-বৈশিষ্ট্য শ্রোতাকে গভীরভাবে সকল যুগেই বিমুগ্ধ করে রাখে। এর কারণ, গানের মধ্যে সহজ আবেগানুভূতির আবেদন বেশি, প্রত্যক্ষ চিত্ররূপও প্রবল। সব-চেয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে গানের শব্দচয়ন ও কথা-গ্রন্থনের বিশেষত্ব—জীবনের নানা ঘটনা ও বস্তুর বিষয়-বৈচিত্র্য নিয়ে গান বহুযুগব্যাপী জনপ্রিয়তার কারণ।

রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট ভাণ্ডার নাট্য-সংগীত-সম্পদগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমে, সম্পূর্ণ গীতরীতিতে বাঁধা 'অপেরা' শ্রেণীর রচনা—বাল্মীকি-প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২) এবং মায়ার খেলা (১২৯৫ বা ১৮৮৮)। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে—"বাল্মীকি-প্রতিভা সুর করিয়া অভিনয়—স্বতন্ত্র সংগীত মাধুর্য অল্প স্থলেই আছে। কালমৃগয়াও এই শ্রেণীর রচনা। মায়ার খেলায় গানের সুরজগৎ সম্পূর্ণ স্ফূর্তি লাভ করে।" সত্যিকার রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃতি মায়ার খেলার গানেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ, গানগুলোয় সংগীতে ও কথায় এমন সম্মিলিত পূর্ণতা আছে যে এই গানগুলো নাটক ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া চলে। রবীন্দ্রনাটকের গানের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর সংগীতকে চিরন্তন সম্পদ করে রেখেছে। পরবর্তী নাট্যসংগীতগুলোর সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। মাঝামাঝি সময়ের অনেকগুলো নাটকের মধ্যে ঋতুর অনেক গান স্থান লাভ করেছে—শারদোৎসব, ফাল্গুনী, বসন্ত, শ্রাবণ-গাথা, ঋতুরঙ্গ, সুন্দর, নবীন প্রভৃতি। বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যে এবং বিভিন্ন টেকনিকের অবলম্বনে আরো কয়েকটি সংগীত-প্রধান নাটক উল্লেখ করা দরকার - অচলায়তন, অরূপরতন, তাসের দেশ, শিশুতীর্থ, শাপমোচন প্রভৃতি। তাছাড়া বিভিন্ন ছোটবড় নাটকের জন্য রচিত গানগুলোয়ও একই মূল্যায়ন করা যায়। যথা, ডাকঘরের জন্য লিখিত অল্প কয়েকটি গান। শেষের দিককার যুগান্তকারী সৃষ্টি—চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি। নৃত্য-সম্বলিত নাটক দৃশ্য হলেও সম্পূর্ণরূপে পটভূমিকার গানের ওপর নির্ভরশীল। সর্বত্রই গীতের প্রাধান্য এবং গানগুলো স্বতন্ত্রভাবেও গীত হয়।

প্রথম জীবনের সাংগীতিক রূপ যেমন একদিকে রাগসংগীত-ভিত্তিক হয়েছে, অন্যদিকে নিত্য নতুন রীতি অনুসরণ ও বাংলা গানের প্রাচীন রূপের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই চলেছে। অর্থাৎ, একুশ-বাইশ বছর বয়স থেকেই নানান রূপ প্রয়োগ উদ্ভাবিত হচ্ছে। এখানে পাশ্চাত্য সংগীতের ভঙ্গি নিয়ে গান রচনার কথাও আসে। বাল্মীকি প্রতিভার তিনটি গান নিয়ে

এই ধরণের রচনার আরম্ভ। বিভিন্ন প্রচলিত বিলাতী সংগীত রচনার অনুসরণে, কিছু বা বিলাতী স্তোত্র-গাথার রীতিতে বা গির্জার সংগীত নিয়ে, কোথাও সমবেত কণ্ঠের গানে, কখনো উত্থান-পতনের বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনে, স্ট্যাকেটো বা বিচ্ছিন্ন সুর-প্রয়োগের কায়দায় রবীন্দ্রনাথ কতকগুলো গান রচনা করেন। এ বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষের মতটির উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কটা গান বিলেতি সুরে ও ঢংএ রচনা করেছেন এ খোঁজ করলে তাঁকে ভুল বোঝা হবে।…"প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সামান্য কয়েকটি গানই আমরা দেখি।…বিদেশী সুর ও ঢং বাংলা কথার সংগে কেমন খাপ খায় তাই তিনি দেখতে চেয়েছেন"। অর্থাৎ যে কোন সংগীতের রূপ নিয়ে নিজের ফর্ম (form) তৈরী করা, যে কোন ঢং নিয়ে নিজের মান সুরের পটে সাজানো —রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তাতে যদি তোমার হল সুরু, আমার সকল রসের ধারা, আমাদের শান্তিনিকেতন, আলো আমার আলো ওগো ইত্যাদির মত বিশিষ্ট গান সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে বৈদেশিক-প্রভাব বলে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

লোকপ্রচলিত সুরের আরোপ এ যুগ থেকে সার্থক ভাবেই হতে থাকে। রামপ্রসাদী সুরের দুই তুক ও কীর্তন গোড়ার উৎস। ১৮৮৬ ডিসেম্বরে দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবির স্বকণ্ঠের গান—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"; এ সময় থেকে বহু বিচিত্র ধর্মীয় গান ও সুর রচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে গান রচনার উল্লেখ করা যায়। অল্পকাল পরে সুর যোজনার দিক থেকে প্রথম পরিণত রীতি 'মায়ার খেলা'র গানে স্থান লাভ করে। মায়ার খেলার গানের মালা দীর্ঘদিন ধরে লিখিত, হৃদয়াবেগে বা রোমান্টিক উপাদানে গঠিত। কাব্যের দিক থেকে তখন 'মানসী'র যুগ চলেছে।

১৮৯০-৯১ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সাহিত্য, ছোটগল্প, রাজনৈতিক ও নানা প্রবন্ধ সাহিত্যের রচনা চলতে থাকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বাংলার গ্রামজীবনের সংগেও নানা অভিজ্ঞতায় নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত সংগীত-সমাজের সংগে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ সময়ে বাউল, বৈষ্ণব কীর্তনীয়াদের কাছ থেকে আহৃত সংগীত নানাভাবে নাটকের গান ও ব্রহ্ম-সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ

বাংলাদেশের লোকপ্রচলিত সুর ও লোকসংগীতের সংগে সম্পর্ক সংস্থাপন করেন। পদ্মার ধারে ধারে শিলাইদহে এবং গ্রামবাংলার নানাস্থানে তিনি ঘুরেছেন। কাব্যের দিক থেকে এই সময়কালে কবির সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, কণিকা ও ক্ষণিকা রচনার উল্লেখ করা যায়। সংগীত সম্বন্ধে নানা চিন্তা ও সংগীত রচনাধারার বিশেষ প্রস্তুতি এই দশটি বছরেই হয়েছিল। অতএব দেখা যায় আমরা সংগীত রচনার এই ২০ বছরের পর্বকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি – ১৮৮১-৯১ এবং ১৮৯:-১৯০০|১৯০১।

১৯০০/১৯০১ থেকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কর্মধারার জন্যে যেমন সংগীত রচনা নানা ভাবেই দরকার হয়ে পড়ে, অন্যদিকে বহুমুখী সাহিত্যকর্মের মতোই সুরধুনী তখন মনের মধ্যে প্রবহমাণ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পর থেকে কাব্য-ধারার পরিণততম রূপের বিকাশ হয়েছে। রচনাগুলো নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, বলাকা, পলাতকা প্রভৃতি। শারদোৎসবের নিসর্গরূপের সুরমাধুর্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতির কাব্য-রসের সংগে সহজ সুরের সংগতিপূর্ণ উদ্ভাবিত সুর ও ছন্দের ধারা কাব্যরসকে প্রবলভাবে ভাসিয়ে নিয়ে ভাবজগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেয়—ভ্রম হয় আমরা রূপগত অথবা কথাসমন্বিত ভাবজগতে বিচবণ করছি। গীতলিপি, গীতপঞ্চাশিকা, গীতলেখা, বৈতালিক, গীতবীথিকা প্রভৃতি স্বরলিপি গ্রন্থ-গুলো রবীন্দ্রসুরের রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করে এই যুগে।

কবি জীবনের এই পর্ব পর্যন্ত যে সব লৌকিক সুরের গান রচনা করেছেন তার মধ্যে রামপ্রসাদী, মিশ্র কীর্তন, লোকগীতির সুর বিশেষ করে বাউল সুরেই উল্লেখযোগ্য গান রচিত হয়েছে। ১৩১২ সালে (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত বাউল সংগীতের স্পষ্ট ও সার্থক ব্যবহার হয় কয়েকটি গানে—আমার সোনার বাংলা, ও আমার দেশের মাটি, ওরে তোরা নাইবা কথা বললি, ঘরে মুখ মলিন দেখে, ছি চোখের জলে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, যে তোরে পাগল বলে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, ইত্যাদি। তাছাড়াও এই সূত্রে অন্য কতকগুলো গান উল্লেখ করা যেতে পারে—এবার তোর মরা গাঙে, আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে, মা কি তুই পরের দ্বারে, যদি তোর ভাবনা থাকে, আপনি অবশ হলে, বাংলার মাটি বাংলার জল, ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ইত্যাদি। বাউল বা লোক-প্রচলিত সুরের মধ্যে নানা সুরের অংশ প্রয়োগও অনেক স্থলে লক্ষ্য করা যেতে

পারে। বাউলের সুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : "আমার অনেক গানেই আমি বাউল সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সংগে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে।" অতএব বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বাউলশ্রেণী থেকে গানের নানান রূপ সঞ্চয় করে বেশ কতকগুলো বৈচিত্র্য এনেছেন। মধ্যবাংলার এবং রাঢ়ীশ্রেণী বাউলদের মধ্যে আজকাল সুরগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ মূল মধ্য বাংলা এলাকা থেকেই সুর সংগ্রহ করেছেন। অধিকাংশ লোকগীতিতে সুরের দুটো তুক বিভাগ আছে—গানের প্রথমাংশ এবং পরবর্তী অংশ। গানকে চারভাগে রূপ দেবার জন্যেই অনেক বাউল গানের সংগে রাগের অংশ যোগ করা দরকার হয় ব'লে মনে হয়েছিল। এই মিশ্র প্রকৃতি ছাড়াও কিছু গানে বাউল ভঙ্গি মোটামুটি ঠিক আছে।

পৌরুষ ও বীরত্বের ব্যঞ্জনাসূচক, উদ্দীপনা সূচক বা বলিষ্ঠ উল্লাসের গানের সন্ধান রবীন্দ্রসংগীতে কতটা পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। রবীন্দ্র রচনায় সুরের সাধারণ প্রকৃতি মধ্যগতি, শান্ত, স্নিগ্ধ ও মৃদু। একথা স্বীকার করা যায় যে করুণতাই আবেগের আকর্ষণীয় প্রকাশ এবং দুঃখের সৌন্দর্যে সুর বিশিষ্টতা লাভ করে। "আমার সোনার বাংলা" স্নিগ্ধ শান্ত রসের গান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ গান কিরূপ অনুপ্রেরণাদায়ক হতে পারে তা কিছুদিন আগেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করেছি—বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সূত্রে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে শান্ত স্নিগ্ধ সুরের লোকগীতি-প্রতিম রবীন্দ্রসংগীত কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনুমেয়। একথা বলা যায় যে স্নিগ্ধ ও নরম সুর ব্যক্তি মনের বেদনা ও আকুতিকে নাড়া দিয়ে তাকে যেভাবে সকলের সামিল করে দিতে পাবে, তা হয়ত অনেক উত্তেজক বা পৌরুষ-সমন্বিত সুর করতে পারে না। সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথের সুর সে দিক থেকে নরম প্রকৃতির। কিন্তু কথার কাব্যিক সরলতা এই দুর্বলতাকে কতটা সঞ্জীবিত করতে পারে তার উদাহরণ কতকগুলো গানে হয়ত মিলতে পারে—বাঁধ ভেঙে দাও, আমরা নতুন যৌবনেরি দূত, খরবায়ু বয় বেগে, আগুনের পরশমণি, আমি ভয় করব না, হবে জয় হবে জয়, শুভ কর্মপথে, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা, আনন্দধ্বনি জাগাও ইত্যাদি। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনাথের গান—ব্যক্তির গান ; সকলের গান সামান্যই আছে। রবীন্দ্রনাথের গান মানুষ হবার গান, রসগ্রহণের শক্তি অর্জন করবার

গান, রূপ-রস-গন্ধ-স্বাদ নিয়ে পূর্ণ সংস্কৃতিময় মন অর্জন করবার গান—যুদ্ধের গান নয়। আমাদের দেশে হাজার কণ্ঠের উজ্জীবনের গান এতকাল রচিতও হয়নি। বিংশশতক থেকে আরম্ভ করে আরো কয়েকটি সংগীত রচনা ধারা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে বাউল সংগীত, উদ্দীপনামূলক গান, ঋতুসংগীত, প্রভৃতি অন্যদিকে গীতাঞ্জলি ও গীতি-মাল্যের বিশিষ্ট আবৃত্তি-স্তুতি-ভক্তিরস-স্নিগ্ধ গান ও নানা উৎসবের গান উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯২১ থেকে যুগটিকে মোটামুটি অনেকে বলেন অনুভূতি-প্রধান, রাগ-রাগিণী ও কাব্যরসের গঙ্গা-যমুনা সংগম। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন, শেষের গানগুলো সম্পূর্ণ ইস্‌থেটিক। এ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রবীন্দ্রস্মৃতিতে বলেছেন, "অনেকে তাঁর প্রথম বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও মর্মস্পর্শী বোলে। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইস্‌থেটিক।"

ঋতুচিত্র বা নিসর্গভাব সমন্বিত সংগীত ১৯২১-এর পরেও একই ধারায় প্রবাহিত। সকল ঋতুর গান নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত সম্পূর্ণ, যদিও কয়েকটি ঋতুই গানে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। পৌষ যেমন ডেকে নেয়, তেমনি টানে হিমের রাত্রির দীপালিকা, হেমন্ত-লক্ষ্মীর ছবি, আমলকীবনে শীতের কাঁপন, জীর্ণশীতের সাজ, জাগ্রত বসন্ত, অগ্নিময় গ্রীষ্ম, সবচেয়ে বিচিত্র বর্ষা ও শরতের ঝলমলে রূপ, ঋতুগুলি যেন সংগীতকে সমভাবেই আশ্রয় করেছে। তবু কয়েকটি ঋতুর গানই বিশিষ্ট সন্দেহ নেই। বহু গান এ সময়ে নব-গীতিকায় প্রকাশিত। ফাল্গুন, বসন্ত, প্রবাহিণী, সুন্দর, শেষ বর্ষণ, নটীর পূজা, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, প্রভৃতি সংগীত রচনার যুগে রবীন্দ্র-নাথ তাঁর কথা ও সুরে বিচিত্র সমন্বয় বা সিনথেসিস করেছেন। কল্পনাশক্তি এখানে চূড়ান্তরূপে ক্রিয়াশীল।

মোটামুটি, রবীন্দ্রসংগীত নিম্নলিখিত তত্ত্বের ওপর দাঁড়ায়:

(১) সংগীতের অনির্বচনীয়তাকে বচনীয় করবার জন্যে কথার প্রয়োজন এবং কথা সুরের সংগে সংযুক্ত হলেই তা নতুন তাৎপর্যে ধরা পড়ে।

(২) রাগ-রাগিণীর চেয়ে কথার অর্থবোধক সমৃদ্ধি বেশি। যদিও রাগের ভিত্তিভূমি সুর, কিন্তু কথা-দ্বারাই সুরকে নতুন তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করা যায়। গানকে সে অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন—বিশিষ্ট

রাগ বিশিষ্ট ভাবের প্রতীকরূপে মনের মধ্যে ধরা দেয়। যথা, "ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ ব্যাকুলতা,...ভৈরো যেন ভোর বেলাকার আকাশের প্রথম জাগরণ"...ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা পদ্ধতি এসব তাৎপর্য ব্যাখ্যার নিয়মে বাঁধা পড়ে থাকে নি। কিছু কিছু রাগরাগিণীর সংগে সময়বোধের সামঞ্জস্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের লক্ষ্যস্থল রাগের অংশগুলোর ওপর ন্যস্ত। গোড়ায় যদিও অনেক রাগ (প্রায় ৮০টি) ব্যবহারের প্রমাণ আছে, রচনায় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য রাগাঙ্গের প্রতি এবং তাও রাগ সংখ্যা পোনেরো/ষোলটি হওয়া সম্ভব।

(৩) অলংকারের প্রয়োজন সামান্য এবং সীমিত।

(৪) রবীন্দ্রনাথ কোনও তালেই তালের কারিগরি, বোল-বাণী-বাট-তেহাই-লয়কারী পদ্ধতির প্রয়োগ সমর্থন করেন নি, বরং বিরুদ্ধ পন্থা অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্র-পদ্ধতি অনুসারে কবিতার ছন্দের মতই মুক্ত-ছন্দ গানে প্রযুক্ত হওয়া দরকার। এই অনুসারে সমের বিশিষ্ট ঝোঁক বর্জনীয়। এই প্রসঙ্গে সমে পড়ার খিটিমিটি ভাল কি মন্দ এসব আলোচনা অবান্তর। ভারতীয় রাগসংগীতে সুরের কারিগরির মতো তালের কারিগরি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের তালতত্ত্ব কাব্য ছন্দের অনুসরণ করে বোলেই তাতে পর্ব ভাগ এবং তালের দৈর্ঘ্য সুবিধে অনুসারে সাজিয়ে নেওয়া যায়। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি তাল রচনাও করে নিয়েছেন। যথা,— রূপকড়া, একাদশী, ঝম্পক, নবতাল, নবপঞ্চতাল ইত্যাদি। এখানে স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রে সংগীতকে রাগসংগীত থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন। সমের প্রয়োগ বর্জন করলে এই গান রাগসংগীত পদ্ধতি থেকে অনেক ফারাক হয়ে যায়। প্রাচীন লোকগীতিতে অথবা বর্তমান নানাপ্রকারের আধুনিক সংগীত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রতি মাত্রার ভাগ অথবা শুধু মাত্র পর্বভাগ নিয়ে বহু গান প্রচলিত। তাল সেখানে রীতিবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সংগীতে মুক্ত-ছন্দ ব্যবহারের পদ্ধতি ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করেন।

কয়েকটি লক্ষণ বিশ্লেষণের পর সংক্ষেপে রবীন্দ্রসংগীতের ধারার ক্রম পরিবর্তন নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত করা যায়: প্রথম যুগে রাগসংগীতের পন্থায় গান রচনা করেন, বিশেষ করে ধ্রুপদপদ্ধতি এই ধারায় প্রধান অবলম্বন। পাশাপাশি ছেলেবেলাকার রচনায়ই রামপ্রসাদী সুরও কীর্তনের রীতি অবলম্বন

লক্ষণীয়। সেই সংগে আসে পাশ্চাত্য সংগীতের কয়েকটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে সংগীত রচনা। এর পরে বাউল সুরের বিচিত্র ব্যবহারের যুগ। বাউল সংগীতে নানা রাগও সংমিশ্রিত হতে থাকে এবং রবীন্দ্র রচনার বিশিষ্ট দিকে পরবর্তী জীবনে (১৯০১-১৯২১) বিশেষ প্রসারিত। বাউলের সুরের সঙ্গে ভাটিয়ালী সারি গানের সুর ও ছন্দ প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যদিকে ধ্রুপদ ধারার সংগীতের পাশাপাশি সে সময়ের রীতি অনুসারে নিধুবাবুর টপ্পা-রীতিকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন। টপ্পার গিটকারী অলংকারটিকে সংগীত রচনার শেষ পর্যায় পর্যন্ত স্থানে স্থানে ব্যবহার করে যান। উদ্ভাবিত সুর সংমিশ্রণে, সহজ তালে, এবং নানান নাটকীয় সংগীতে রচনাগুলো যেমন বিকশিত হতে থাকে, অন্যদিকে উদ্ভাবিত হয় আনুষ্ঠানিক গান, উদ্দীপক গান ও নাট্যগানের সুর। সংগীতের নানা প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাকে আরো নতুন পথে পরিচালিত করেন—শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদেব জন্যে গান রচনা, নাটকে, গীতিনাট্যে, নৃত্যনাটকে প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে যুক্ত করেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ দ্বিজেন্দ্র-গীতি, রজনীকান্তের গান, অতুলপ্রসাদের গান, নজরুল গীতি ও অন্যান্য ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ – ১৯১৩): ডি এল রায় সেকালের বিখ্যাত কবি-নাট্যকার। কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ পাশ করে বিলাতে অধ্যয়ন এবং দেশে ফিরে সরকারী চাকরি দ্বিজেন্দ্রলালের এক দিকের জীবনকথা। কিন্তু নাটক রচনায় তিনি বিশিষ্ট। দেশপ্রীতি নাটকের বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে সমস্ত জনসমাজকে প্রভাবিত করেছিল। দেশপ্রীতিমূলক গানগুলো বিশেষ সুর প্রযোজনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটকের জন্যে গীত রচনায় ব্রতী হন। গানগুলো বিশিষ্ট সাহিত্যিক গাথা।

এ কয়েকটি গানের সংগীত পরিকল্পনা এমন ভাবে করেন যে সংগীত প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়। গান কয়েকটি—(১) ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা, (২) ভারত আমার ভারত আমার, (৩) বঙ্গ আমার জননী আমার, (৪) যেদিন সুনীল জলধি হইতে। পাশ্চাত্য সংগীত রীতি এদেশে তখনো অজ্ঞাত, অর্থাৎ স্বর সংগতি বা হারমনির প্রয়োগ তখনো গ্রাহ্য হবে কিনা সমস্যা, এ সময়ে জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করে বৃন্দ-গানের একটা নতুন দিকের উদ্বোধন করেন এবং হাবমনি প্রয়োগের চিন্তা প্রসারিত করেন। সুরের দিক থেকে গানগুলোর শিকড় মাটিতেই প্রোথিত, কিন্তু ভঙ্গিটা আমদানী করা হয়েছিল। সেই থেকে আলোচনারও সূত্রপাত।

পুত্র দিলীপকুমার পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের টপ্‌খেয়াল পদ্ধতির কথা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। টপ্‌খেয়াল বিশিষ্ট ধরনের খেয়াল বা টপ্পা নয়, ঊনবিংশ শতকে দুয়ের সংমিশ্রণে অনেক গান খেয়ালের রূপে টপ্পার তান ব্যবহার করে গাওয়া হত। সেকালের বিখ্যাত ধ্রুপদ ও টপ খেয়াল গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বিজেন্দ্রলালেব বন্ধু ছিলেন। ডি. এল. রায় সুরগুলো বন্ধুর নিকট থেকে সংগ্রহ করে নিজের গানে প্রয়োগ করেন। টপ্‌খেয়াল রীতিতে কি এ গান গাওয়া হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে দ্বিজেন্দ্রলালের গান অনেকটাই অব্যবহায হয়ে গেছে। আজকাল টপ্‌খেয়াল রীতিও কোন বিশেষ রীতিরূপে পরিচিত নয়। তাছাড়া ডি. এল. রায়ের নাটকের ব্যবহার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের গানও খানিকটা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। গানগুলোর সাহিত্যিক মূল্যও তেমন স্পষ্ট নয়। তবে কতকগুলো গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে এ যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। যথা, আজিগো তোমার চরণে জননী, ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে, আমার আমার বলে ডাকি, প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে ইত্যাদি। এদিক থেকে দেশপ্রীতিমূলক গানগুলোই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ দান বলে স্বীকৃত।

তৃতীয় স্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান। হাসির গানের যে দিকটি দ্বিজেন্দ্রলাল উন্মোচিত করেন তার প্রধান বিষয় ও উদ্দেশ্য নিছক হাসির সঙ্গে

*এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমার "বাংলা সংগীতের রূপ" ও "Music of Eastern India" দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি কিছু শ্লেষ ও বিদ্রূপ। সমসাময়িক রুচিবোধের সমালোচনায় শ্রোতার মনোরঞ্জন করত এসব গান। এই দিক থেকে তিনি রজনীকান্তকেও প্রভাবিত করেন। রচনার মধ্যে কিছু nonsense verse-ও মিশে আছে। কৌতুক রসও বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। তেমন সূক্ষ্ম হাস্যরস হাসির গানের মধ্যে আশা করা যায় না। সংগীত রচনায় হাস্য সৃষ্টির দান সামান্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন গায়ন শক্তির বিশেষত্ব। এই তিন শ্রেণীর গান দিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুকালের জন্যে সংগীত ক্ষেত্রে জনসাধারণের মন এমন অধিকার করে বসেছিলেন যে সে তুলনায় অন্য রচয়িতাদের গান এত জনপ্রিয় ছিল না। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রীতিমূলক গানের সুর, সমবেত সংগীতের কায়দা, অন্যান্য ভাষার গানেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

লোকপ্রচলিত গ্রন্থগুলো: হাসির গান, আষাঢে, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, পুনর্জন্ম, পরপারে, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০): পাবনায় জন্ম। রাজসাহীতে শিক্ষা ও ওকালতি এবং রাজসাহীতেই লোকান্তর প্রাপ্তি। বাণী (১৯০২) ও কল্যাণী (১৯০৫) কাব্যগ্রন্থ রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। বাণীর ২য় সংস্করণ বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল এবং নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলোই বিশিষ্ট গানের সঞ্চয়ন।

রজনীকান্তের গান বিষয়বস্তু অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:—

(১) ভক্তিমূলক গান, (২) প্রীতিমূলক গান, (৩) দেশাত্মবোধক গান এবং (৪) হাস্যরসের গান।

রজনীকান্তের অধ্যাত্ম-বোধই শ্রোতার মনে সহজ ও ঐকান্তিক আবেগের সংযোগ ঘটিয়েছিল। দিলীপকুমার রায় এই গুণ ব্যাখ্যা করে বলেন, "ঐকান্তিক অমৃত তৃষ্ণার গান।" প্রচলিত রাগের কয়েকটি গান রচনার সরলতা ও অকৃত্রিম ভাবাবেগ প্রকাশের জন্যে সাধারণের মন কেড়ে নেয়। এ জন্যেই তিনি কান্তকবি রজনীকান্ত। আত্মিক প্রেরণায় চির-বৈরাগ্যের রূপ দেখেছেন কতকগুলো গানে—তুমি নির্মল কর, তোমারি দেওয়া প্রাণে, আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, কেন বঞ্চিত হব চরণে প্রভৃতি। তিনি সুগায়ক ছিলেন, তাই আত্মিক প্রেরণায় প্রাণ ঢেলে গান করতেন। দেশাত্ম-বোধক গানের মধ্যে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"

তৎকালীন যুব সমাজের মুখে মুখে ফিরত। হাস্য রসের বা বিদ্রূপাত্মক গান-গুলোতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবই স্পষ্ট। সমসাময়িক জীবন ও সমাজকে তিনি শ্লেষ করেছেন। যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচয়িতা সে অর্থে রজনীকান্তের পরিসর ও পরিবেশ সামান্য মাত্র। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালে ব্যাপ্তি অনেকটাই আছে। তবু গানের বিষয়বস্তু ও কথা রচনার রীতি দৃষ্টে তাঁকে কাব্য সংগীতের একটি বিশিষ্ট আসন দেওয়া হয়।

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১—১৯৩৪): ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন—কর্মজীবন (আইনজীবি) লক্ষ্ণৌতে—লক্ষ্ণৌতেই কর্মবহুল জীবনের মধ্যে সংগীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গানের সংগ্রহ—গীতিগুঞ্জ (প্রথম সংস্করণ, ১৯৩১)। স্বরলিপি গ্রন্থ—কাকলী।

২০৪।৮টি গানের সমষ্টি নিয়ে অতুলপ্রসাদ কাব্যসংগীতের রচয়িতা বা কবি-সুরকার হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের গান যখন অনেকটাই অপ্রচলিত, তখন অতুলপ্রসাদের গানের শ্রোতার আধিক্য—বিশেষ একটি আলোচনার বিষয়। কাব্যিক প্রকৃতিতে তাঁর রচনা দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ বলা যায় না। আধ্যাত্মিক আকুতিতে রজনীকান্তের গানের গভীরতা অনেক বেশি। অতুলপ্রসাদের অনেক গানের কথা-রচনা ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু সংগীতক্ষেত্রে এর স্থান অত্যন্ত বিশিষ্ট। অতুলপ্রসাদের রচনা সার্থকতা অর্জন করবার কয়েকটি কারণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করা যায়: (১) বহু গানের স্থায়ী অংশ বা প্রথম কলি (যা পুনরাবৃত্তি করা হয়) বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। কাব্যিক সংগতি না থাকলেও, অনেক গানে কথা রচনায় বিশেষ সুষমা লক্ষ্য করা যায়। দিলীপকুমার একে authentic গান বলেছেন। (২) গানের কথা রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব বর্তমান। (৩) সুর রচনার মৌলিক রীতি: স্বতঃস্ফূর্ত কীর্তনাঙ্গ ও বাউল সুর প্রয়োগ, চমকপ্রদ সুর সংগ্রহ ও প্রয়োগ, সুরের নানা প্রচলিত ভঙ্গি অবলম্বন, যথা গজল, দাদরা, বাংলার লোকসংগীত. বাউল ইত্যাদি। অনেকের মতানুসারে বাংলা গানে প্রথম ঠুমরি ভঙ্গি প্রয়োগ করেন। দিলীপকুমার বলেছেন, অতুলপ্রসাদের ছিল 'নেওয়ার আশ্চর্য শক্তি'। এমন কি নজরুলের সুর থেকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। (৪) করুণ রসের অভিব্যক্তিই বিশেষ ভাবে রূপ লাভ করেছে।

সুর রচনার দিক থেকে অতুলপ্রসাদের অবলম্বন বাঁধা কতকগুলো প্রচলিত রাগ, যথা ভৈরবী, বেহাগ, খম্বাজ, পিলু, কাফি ইত্যাদি। বেহাগের রূপেঃ বঁধু নিদ নাহি আঁখি পাতে, একা মোর গানের তরী ইত্যাদি। খম্বাজের রূপেঃ কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা, কে যেন আমারে বারে বারে চায়, কে গো তুমি আসিলে অতিথি, এ মধুব রাতে ইত্যাদি। অন্যান্য রাগের চেয়েও ভৈববী রচনাই বেশি লক্ষ্য করা যেতে পাবে। অতুলপ্রসাদ অবশ্য আরো নানা রাগেই কিছু গান রচনা করেছেন।

কয়েকটি সুলিখিত গানঃ চাঁদিনী রাতে কেগো আসিলে, তুমি মধুব অঙ্গে, আমার মনের ভাঙা দুয়ারে, জানি জানি তোমাবে গো বঙ্গরাণী, এমন বাদলে তুমি কোথা, তব অন্তব এত মন্থর ইত্যাদি। ভাষা রচনায় অতুলপ্রসাদ স্নিগ্ধ, কোমল শব্দ চয়নে লক্ষ্য রেখেছেন ও সুরেব অনুরূপে কথাব সাবধান ব্যবহার করেছেন। কীর্তন-বাউল সুর ব্যবহারে, কথা রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে কয়েকটি দেশপ্রীতিমূলক গানের রীতি দ্বিজেন্দ্রলালের পথ অনুসারী মনে হয়। মোটামুটি অতুলপ্রসাদের গান উত্তব ভাবতীয় সুরের লঘুরীতির ভঙ্গিতে রচিত কিন্তু বাংলার শব্দভঙ্গিতে সুন্দর ভাবে রূপান্তরিত। তাছাড়া সমসাময়িক বাংলা গানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে গানের বিশিষ্ট কাব্যিক রূপ দিয়েছেন তিনি। শব্দ নির্বাচনেব দক্ষতা সংগীত রচনাকে বেশি সাহায্য করে। এ দিক থেকেই তাঁব বচনা কতকটা জনপ্রীতি অর্জন করেছে।

অতুলপ্রসাদের করুণ রসেব গান বেশি আকর্ষণ করে। গানেব ভাবের মধ্যে যেমন একাকিত্বের প্রকাশ রয়েছে তেমনি কিছু কিছু ব্যথার অভিব্যক্তির সঙ্গে কোমল ও করুণ সুব মিশেছে। কাব্য সংগীত রূপে অতুলপ্রসাদের গান প্রচলিত থাকার কারণ, অধিকাংশ গানই রবীন্দ্র-সংগীতের পদ্ধতিতে গাওয়া হয়। অতুলপ্রসাদ ঠুমরী ভঙ্গিতে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বর্তমান গায়ন-ভঙ্গি লক্ষ্য করলে এ কথাটি ব্যর্থ উক্তি মাত্র মনে হয়।

নজরুলঃ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯, ২৪শে মে) বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম—ছেলেবেলায় ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় মসজিদে যুক্ত—১০ বৎসর বয়সে মক্তবে পড়াশোনা—গরীব ছিলেন বলে ১১ বৎসর বয়সে 'লেটো' গ্রাম্য গানের দলে গায়েন রূপে যোগদান, কিন্তু ক্রমে এখানেই গীত ও সুর রচনার সুরু। কিছুকাল আসানসোলে রুটির দোকানে, বৎসরখানেক মৈমনসিংহের গ্রামে,

পরে রাণীগঞ্জ বিদ্যালয়ে পড়তে আসেন—১৭ বৎসর বয়স নাগাৎ প্রথম মহাযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেণ্টে যোগদান করেন—১৯১৯-এ ফিরে এসে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন—দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২০-২৫-এর মধ্যে নিতান্ত আবেগময় জীবন কাটান—পত্রিকা সম্পদনা করতেন—কারারুদ্ধ হয়েছিলেন—১৯২৪-এ, বিবাহ—১৯২৫-এ কৃষ্ণনগরে—এর পরে কলকাতায় কবি-সুরকার—১৯৪২ থেকে ব্যাধিতে নির্বাক।

কবি ও সুরকার নজরুলের দান মোটামুটি ২২ বৎসর সময়কাল। এ শতকের তৃতীয় দশকে আবির্ভাব, চতুর্থ দশকে বিশেষ প্রচারিত, পঞ্চম দশকে তাঁর গান অতীতের কোঠায়। বর্তমানে নজরুল-গীতি উজ্জীবিত ও উদ্ভাবিত।

বিদ্রোহী কবির কণ্ঠে ফুটে ওঠে প্রবল আত্মশক্তি, পৌরুষ, দুঃসহ মানসিক জ্বালা, অন্যায়ের প্রতিবাদ। মার্চের সুরে বীরপদক্ষেপের গানগুলো—চল্ রে চল্‌রে, এই শিকল পরার ছল, টলমল টলমল পদভরে, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, কারার ওই লৌহ কপাট, তোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, তোরা সব জয়ধ্বনি কর্, দুর্গম গিরি কান্তার মরু প্রভৃতি।

এর মধ্যে রচনা করে চলেছেন নিরন্তর। গৃহে আর্থিক অনটন, সন্তানের মৃত্যু প্রভৃতি তাঁর জীবন বিপর্যস্ত করে, কিন্তু কবি সুরকার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। রচনাগুলো ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে। গান ও কবিতা বিক্রয় করে চলেন তিনি। সংগীত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ: বুলবুল (১ম খণ্ড) ১৯২৮, চোখের চাতক ১৯২৯, চন্দ্রবিন্দু (বাজেয়াপ্ত ১ম সংস্করণ), নজরুল গীতিকা—১৯৩০, নজরুল স্বরলিপি—১৯৩১, জুলফিকার—১৯৩২, বনগীতি—১৯৩২, গুলবাগিচা—১৯৩৩, গীতিশতদল—১৯৩৪, স্বরলিপি—১৯৩৭, স্বরমুকুর—১৯৩৪, গানের মালা—১০৩৪, বুলবুল (২য় খণ্ড)—১৯৫২।

সংগীতের পথে তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল মেগাফোনের জন্যে গান রচনা, রেডিওর জন্যে রচনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে, জনসাধারণের দাবীতে এবং সর্বোপরি স্বকীয়-শক্তিতে গান গাইবার আকাঙ্ক্ষায়। সুর, লেখা ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকজনার নাম করা যায়—জমিরুদ্দিন খাঁ থেকে রাগ-সংগীতের সংগ্রহ (বিশেষ করে খেয়াল ও ঠুমরী), মঞ্জু সাহেবের কাছ থেকে গজল, দাদরা ইত্যাদির সুর, আব্দুল সালাম নামক জনৈক গায়ক থেকে

আরবী, পারসী ইত্যাদি সুর ও ছন্দ, কোচবিহারের আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মেদ থেকে উত্তর বাংলার লোকগীতির সুর ও ছন্দ ইত্যাদি। ঝুমুর সাঁওতালী দেশের লোক নজরুলের পূর্ববাঙলার ভাটিয়ালীর সঙ্গেও যোগস্থাপন হয়েছিল ছেলেবেলা থেকে। কীর্তন, রামপ্রসাদী ইত্যাদি এবং শ্যামাসংগীতের কথা ও সুরএও যুক্ত হন। সুরকার ও গীতি-রচয়িতারূপে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় কলকাতা রেডিওর প্রথম যুগে দুটো অনুষ্ঠানের জন্যে রচনা করেন হারামণি (হারানো রাগের বাংলা গান) এবং নবরাগমালিকা (নতুন রাগ বা রাগ-মিশ্রণের গান)। এতে রাগভিত্তিক রচনার দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ভাতখণ্ডের লক্ষণগীত অনুসারে কিছু রচনাও আছে।

নজরুলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাগ-অনুসারী কথা রচনা। রাগ এখানে প্রধান। রাগ-সংগীতের রীতিতে এ গান গাওয়া যেতে পারে। গায়ক কথাকে বজায় রেখে খানিকটা স্বাধীনতা নিয়ে অলঙ্কার প্রয়োগ করতে পারেন—এবং রাগের সমগ্র রূপের প্রতি দৃষ্টি রাখা নজরুলের গানের একটি বিশিষ্ট দিক। এই রীতির বিকাশ **রাগপ্রধান** বাংলা গানরূপে। বহু নজরুলগীতি রাগ-প্রধান শ্রেণীব রচনা। এ গান আধুনিক গানের একটি রাগসংগীত-ভঙ্গি-যুক্ত রীতি। মানে, রাগসংগীতের ঢং যে আধুনিক গানে প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ, যে গানে রাগ প্রাধান্যলাভ করে তা রাগপ্রধান নয়—রাগসংগীতেব রীতি বা ঢংই বিশেষ লক্ষ্য। রাগানুসারী গান বাংলায় বহুকাল থেকেই প্রচাবিত। কিন্তু আধুনিক রীতির এই ধরণের গানের রচনার সঙ্গে পূর্বের গানের মিল নেই। নজরুলের এই পদ্ধতির গান সমসাময়িক হিমাংশু দত্তেব রচনায় বিশিষ্ট রূপ পেয়েছিল। রাগে রচিত যে নজরুলগীতি আজকাল বেশির ভাগ ত্রিতালে গাওয়া হয়, অধিকাংশই রাগপ্রধান শ্রেণীর। (বাংলা সংগীতের রূপ, পৃঃ ২২০-২২৭ দ্রষ্টব্য।)

কার্ফা তালের গানের বিচিত্র ঝোঁকের ব্যবহার নজরুলের পূর্বে কদাচিৎ দেখা যায়। অতুলপ্রসাদের গানে এ প্রবল আবেগ ও ছন্দের দোলা নেই, যদিও অতুলপ্রসাদ গজল দাদরার ছন্দ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। সংগীতের বিচারে নজরুল গজলের সার্থক অনুকরণ করেছেন। অনুকরণ মৌলিক আর্ট নয়; তবু, বাংলা গানের বিচারে এ রচনা তীব্র বেগ সৃষ্টির কারণ হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষার গানের (সুর ও ছন্দ) বাংলা adaptation বা রূপান্তর

নজরুলের একটি বিশিষ্ট কাজ। এ বিষয়ে তিনি পথপ্রদর্শক এবং নতুন ভঙ্গির নির্দেশ দেন। (ঐ, উদাহরণ দ্রষ্টব্য)

নজরুলগীতি **আধুনিক** গানের স্তরে বিশিষ্ট সৃষ্টি। বরং নজরুল রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের যুগের কাব্যসংগীতের সঙ্গে পরবর্তী আধুনিক গানের যুগের মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ (বাংলা সংগীতের রূপ)। কারণ তিনি সুরের গ্রন্থন কায়দা লক্ষ্য করে গান রচনা করেছেন এবং সুরকারের বা প্রযোজকের হাতে তুলে দিয়েছেন নির্দিষ্ট যন্ত্র সহযোগে রেকর্ড করবার জন্যে। এই তিনটি স্তরে যে Process বা পদ্ধতি অবলম্বন তা-ই আধুনিক গানের বিশেষ রূপ সৃষ্টি করে। আধুনিক গানের কথায় জীবনের সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগ একটি বিশিষ্ট দিক। এরপর আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আসে সুরকারের ওপর। তিনি বাছাই করে সুর-কলি গ্রহণ-বর্জন করে অথবা সুরকে প্রয়োগের নানা পন্থা উদ্ভাবন করে গানে রূপদান করেন—গায়কের সাহায্যে। **আধুনিক** কথাটি এ জায়গায় আজকের যুগের একটি নাম। দিলীপকুমার রায় 'সাংগীতিক' গ্রন্থে এবিষয়ে একটি কথা (১৯৩৮-এ) বলেছেন—কম্পোজিসান কাকে বলে তাই আমরা ঠিকমত এযাবৎ জানতাম না। সবে আভাস পেতে শুরু করেছি কাকে বলে 'গান'। (বিস্তৃত আলোচনা: বাংলা সংগীতের রূপ, পৃঃ ৭২-৯৯ এবং ১৭২-১৮৮; Music of Eastern India, pp. 216-237)। এভাবেই আধুনিক গানের সৃষ্টি। এ বিষয়ে কে প্রথমে কাজ করেছেন (রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সাইগল, নজরুল অথবা অন্যান্য) আমাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষণীয় হচ্ছে নজরুলের হাতে বহু আধুনিক গান রচিত হয় যাকে এই শ্রেণীর গানের গোড়ার রচনা বলা যায়। (১) সুর অনুযায়ী পদ রচনা (২) সুরগ্রন্থন পদ্ধতি (কারুশিল্পের মতো কাজ) (৩) গানকে যন্ত্র সহযোগে গাওয়ান—গানের এই কয়েকটি প্রধান ধাপ। এধরণের রচনায় কথা-রচয়িতা ও সুর-রচয়িতা অনেকটা objective বা নৈর্ব্যক্তিক, দৃশ্য বা শ্রাব্য নয়। এজন্যে নজরুলের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত গান বলতে যা বোঝায় তা বিশেষ নেই। কিছু রচনা তিনি সুর করেছেন, কিছু রচনা সুরকারদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীতে সক্রিয়ভাবে কাজে যোগ দেবার পর ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের দিনে ১০।১২টি করে গান রচনা করে গেছেন। গানের প্রথম পংক্তিগুলো সুরে সাজিয়ে রচনা করেছেন সন্দেহ নেই। এজন্যে সকল গান

পুরোদস্তুর সুর করা হয় নি। বহু কথা রচনা এজন্যে ভাল করে উৎরোয় নি, কিন্তু অনেকগুলিই ভাল গান রূপে শ্রোতার মন অধিকার করেছে। যাঁরা এসব বিষয়ে নজরুলের সংগে সংযুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন—কমল দাশগুপ্ত, উমাপদ ভট্টাচার্য, জগৎ ঘটক, ধীরেন দাস, নিতাই ঘটক, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়, চিত্ত রায়, গিরীণ চক্রবর্তী প্রভৃতি। আর গোড়ায় যাঁরা প্রকৃত গানের রূপদান করেছেন তাঁদের নাম—নলিনীকান্ত সরকার, ধীরেন দাস, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, দীপালি নাগ, শচীন দেববর্মণ, আব্বাসউদ্দীন, গিরীণ চক্রবর্তী, শান্তা আপ্তে, মৃণালকান্তি ঘোষ এবং আরো অনেকে। এই সূত্রে আধ্যাত্মিক গানের রচনা, বিশেষ করে ইসলামী সংগীত, এককালে মুখে মুখে ফিরেছে। অন্যান্য গানের কথার সঙ্গে শ্যামাসংগীত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ কর্মজীবনে শ্যামাসাধনার সঙ্গে নজরুল খানিক যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই গানগুলোর চমকপ্রদ কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটি যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণে নজরুলের সাংগীতিক-ব্যক্তিত্ব এরূপ মৌলিকতা অর্জন করেছে তা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে বলা চলে—

১। দুর্দমনীয় শৌর্য ও বীরত্বের ব্যঞ্জনা।

২। বাস্তব জীবনকে গভীর ভাবে যুক্ত ক'রে গান রচনা—বর্ণনাত্মক ভঙ্গির বিশিষ্টতা।

৩। কার্ফা ও দাদরা তালের দোলা সৃষ্টি।

৪। রাগ কাঠামো ও রাগগানের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা।

৫। আধুনিক রাগ-গানের ভঙ্গি রচনা।

৬। বৈদেশিক ও বিভিন্ন সুরকলি সঞ্চয়ন ও অনুরূপ কথা বচনা ও প্রয়োগ। গানের রচনায় যাঁদের দ্বারা নজরুল প্রভাবিত তাঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং যাত্রাগানের রচয়িতা ও গায়ক মুকুন্দ দাস।

গানের কথা রচনার বিষয়ে নজরুল ছিলেন জীবনের অনেকটা কাছে, একসঙ্গে অনেকটা বাস্তবমুখী এবং আবেগপ্রধান ছিলেন। অসংখ্য রচনায় কথাগুলো শুধু কারুকর্মের মতো রচিত হয়েছে, কাব্যিক গভীরতা বা জীবনোপলব্ধির বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টির সময় তাঁর ছিল না। প্রায় তিন হাজারেরও বেশি গান রচনার কথা শোনা যায়। শ্রেষ্ঠ গান ও সুর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। এবং সংখ্যা অবান্তর। সাংগীতিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য

আবৃত্তিমূলক গানের একই রূপকে আমরা যেমন বিশিষ্ট স্থান দেব না তেমনি নজরুলের অসংখ্য রচনার সঠিক মূল্যায়নও সম্ভব নয়। শ্রেণী বিভাগ করে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে সাংগীতিক কথা-নৈপুণ্য বিশ্লেষণ করলে দ্বিজেন্দ্রলালের, রজনীকান্তের সামান্য সংখ্যক গানেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অতুলপ্রসাদ অল্প গান রচনা করেও বিশিষ্ট। নজরুলের গানও তেমনি শ্রেণী-বদ্ধ করে বিশিষ্ট ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে নজরুল সীমিত সময়ের মধ্যে সংগীতের নানা ধারায় অজ্ঞাতসারেই বিশিষ্ট প্রবাহের সৃষ্টি করে গেছেন যার মূল্যায়ন শুধু কাব্যসংগীতরূপে করা যায় না। সেরা গান সংখ্যায় খুব বেশি নয়। নজরুলের মধ্যে দুইটি সত্তা ক্রিয়াশীল—একটি কবি-নজরুল এবং আর একটি সংগীত-প্রাণ নজরুল। সংগীত রচনা—যাকে Methodical বলা চলে নজরুল সেরূপ নয়, কিন্তু নজরুলের সংগীত আবেগপ্রবণ ও স্বতঃস্ফূর্ত। সে জন্যে রচনায় প্রাণবত্তা প্রস্ফুট বেশি।

স্বদেশী গান

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে যেমন ব্রহ্মসংগীতকে কেন্দ্র করে সংগীত রচনার ক্ষেত্রে কথা ও সুরের নতুন উদ্ভাবনী শক্তি বাংলাদেশের রচয়িতাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, দেশভক্তি ও বীরত্বব্যঞ্জক কথা ও তার সুরও অন্যদিকে সংগীত রচনাকে নতুন করে সঞ্চারিত করবার আর একটি বিশিষ্ট কারণ। আমরা এখানে দেশভক্তিমূলক রচনা ও কাব্য লক্ষ্য করছি না, স্বদেশী গান রচনায় সুরযোজনা ও ছন্দ ও কণ্ঠ প্রয়োগ লক্ষ্য করছি। কারণ বিষয়টি গানের কথার দিকে আকর্ষণ করলেও, সংগীত রচনায় সাড়া দেবার এ-ও একটি ক্ষেত্র। আমরা দেখেছি চিরাচরিত রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিধুবাবুর "নানান্ দেশে নানা ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?" —এই বিষয়বস্তুতে রাগপ্রয়োগ করা হয়েছিল।

এরপর দীর্ঘকাল নানাভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রীতি জনসমাজে সঞ্চারিত হতে থাকে। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা থেকে যে ভাবধারা সঞ্চারিত হয়, দশ বছরের মধ্যে তা সংগীতে পরিণতি লাভ করে। ১৮৭৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'জাতীয় সংগীত' নামে গ্রন্থ এর প্রমাণ। কিন্তু প্রকাশিত সংগীতের ক্ষেত্রে যে সব গানগুলো বিশিষ্ট সুররচনার প্রেরণা সৃষ্টি

করেছিল, অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে দেশপ্রেমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্তে সংগীত রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল, সে গানগুলো এই :

(১) হেমচন্দ্রের—বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে

(২) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—মিলে সবে ভারত সন্তান

(৩) গোবিন্দচন্দ্র রায়ের—কতকাল পরে বল ভারত রে

(৪) মনোমোহন বসুব—দীনের দীন সবে

(৫) আনন্দচন্দ্র মিত্রের—উঠ উঠ উঠ সবে ভারত সন্তানগণ

(৬) কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের—না জাগিলে সব ভারত ললনা। ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগেব কয়েকটি গানও স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সুবে ও কথায় বিশিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এ সম্বন্ধে তৎকালীন সেরা ব্যক্তিদের উক্তিগুলো আজ আমবা বিস্মৃত। ধীরে ধীরে এই ধারায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি যোগদান করেন। সুরের দিক থেকে নিয়মিত রাগে গান গাওয়া হলেও বাগকে উপস্থাপনার জন্যে সুর-সংযোজক নতুন ভাবে ভেবেছেন। এই সূত্র ধবেই সমবেত কণ্ঠেব গান ও সেই সম্বন্ধে চিন্তা জেগেছে। এই কাবণেই পাশ্চাত্য প্রভাব গানে সঞ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ কথা রচনার চেয়েও সুব রচনা এবং ছন্দপ্রয়োগের ভাবনা এই ধবণের বাংলা গান অবলম্বন করে বিশেষ রূপ পবিগ্রহ করে। কাব্য-সংগীত রচনায় সুবপ্রয়োগ এবং পরবর্তীকালে আধুনিক গানে সুবপ্রয়োগ ও প্রযোজনার দিক থেকে এ একটি প্রথম সাংগীতিক স্তব বলা যায়।

আধুনিক সংগীতের বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমার নিম্নলিখিত বইগুলি দেখুন—

আধুনিক—১। বাংলা সংগীতের রূপ—তৃতীয় ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

২। Music of Eastern India—pp 216-237

রাগপ্রধান—১। বাংলা সংগীতের রূপ—পৃঃ ২২০-২২৬

২। Music of Eastern India, pp 84-85, 91, 99, 155, 160, 208, 212, 214, 223, 222-224

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ বাংলা লোক-সংগীত ॥

লোকসংগীত, লোকগীতি ও পল্লীগীতি শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু লোকসংগীত বলতে আমরা এখানে শুধু সংগীতাংশই আলোচনা করব, সাহিত্যাংশ নয়। লোকসংগীত নির্ভর করে আদি প্রকৃতির চলিত আঞ্চলিক ভাষাতে এবং চলিত আঞ্চলিক সুর-তালে। অর্থাৎ এই গানে ভাষার উচ্চারণে যেমন লৌকিক ধ্বনিগত রূপ বজায় থাকে, তেমনি সুরের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। এই গানে কথা, সুর ও তাল অচ্ছেদ্য, সকলই প্রথমে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত। আধুনিক কালে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে গানের সংগে ব্যবহৃত হত লৌকিক সংগীত-যন্ত্রাদি। আজকাল একটু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে যুগ যুগ ধরে উচ্চ-সংগীত ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়লেও লোকসংগীতের মূল প্রকৃতি বদলায় নি। কাঠামোটা ঠিকই আছে। প্রথমে লোকসংগীতকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে: (১) আদিম সংগীত এবং (২) প্রচলিত লোকসংগীত। আমাদের বিশেষ দৃষ্টি বাংলার প্রচলিত লোকসংগীতে নিবদ্ধ, যদিও এর সংগে আদিম সংগীতের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আলোচনা করলে দেখা যাবে অপ্রচলিত লোকসংগীতের আদিমরূপ (ethnic প্রকৃতি) প্রায়ই লুপ্ত হয়ে গেছে, হয়ত কিছু লক্ষণ এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। আদিম লোকসংগীত পাওয়া যায় সভ্যতা থেকে দূরবর্তী নিতান্ত বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু, বহু আদিবাসীও যুগে যুগে অল্প অল্প করে অন্যান্য সংগীত দ্বারা প্রভাবিত। তবু যা হোক, আঞ্চলিক রূপের প্রাধান্য থাকে বলেই বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল লক্ষ্য রেখে সংগীত বুঝে নেওয়া যেতে পারে। কারণ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা এবং লৌকিক সংস্কৃতির চর্চা মানুষের দেহে ও মনে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে লোকসংগীতে তার চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভারতীয় সংগীতে সকল অঞ্চলেই যেমন ধর্মীয় প্রভাব বর্তমান তেমনি আবার গানের মধ্যে একক গানের আধিপত্যও দেখা যায়। লোকসংগীত,

সংজ্ঞা অনুসারে, গোষ্ঠীর সংগীত। কিন্তু বাংলাদেশে বিশিষ্ট অঞ্চলে এই থিওরি চলে না। এখানে একক সংগীতের বিশিষ্ট রীতি প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় দিক থেকে মধ্যযুগে কীর্তনের প্রভাব এবং শাক্ত সংগীতের প্রভাব, অন্যদিকে তারও পূর্বে মহাযান মত ও নাথ ধর্মের প্রভাব এবং সূফী-মতের প্রভাব সাধারণ লোকসমাজে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। ফলে সংগীত কোথাও একই রূপে স্থির থাকতে পারে নি। ধর্মীয় ভাবধারাও অনেক ক্ষেত্রে community music-এর পরিবর্তে একক সংগীত প্রচারের জন্যে দায়ী। উৎসব অনুষ্ঠান ও আচার থেকে সমবেত ভাবে গাইবার গানের উদ্ভব হয়েছে প্রচুর।

বাংলা আঞ্চলিক লোকসংগীত তাই নানারূপেই পাওয়া যায়। অঞ্চলগুলো, (১) বাংলাদেশ (২) পশ্চিমবঙ্গ, (৩) ত্রিপুরা, ৪) আসামের শিলচর ইত্যাদি অঞ্চল। এই সকল অঞ্চলের সংগীত ভাষা, সুর ও ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে ধর্মীয় প্রভাবসহ চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের গান অর্থাৎ, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা প্রভৃতি নদীতে সীমাবদ্ধ পূর্বাঞ্চলের গান ;

(২) উত্তরবাংলা—বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলো পদ্মার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পূর্বে যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ;

(৩) মধ্যঅঞ্চলের বা ভাগীরথীর পূর্ব-ব-দ্বীপ অঞ্চলেব এবং নদীর দুই তীরের মধ্যঅঞ্চলের গান ; এবং

(৪) ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল রাঢবঙ্গের গান।

(১) **পূর্বাঞ্চলের গান :** বাংলাদেশের মৈমনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, তাছাড়া, ত্রিপুরা ও শিলচর এলাকার বিস্তৃত অঞ্চলেব সংগীত ভাটিয়ালী। 'ভাটিয়ালী' শব্দে 'ভাটির নেয়ের' বা 'মাঝি মাল্লার' একটা চাক্ষুষ ছবি ভেসে উঠতে চায়। কিন্তু নামের ব্যাখ্যার সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক নেই। বরং বলা যায়, নানা ভুল ধারণাই ছড়িয়ে আছে। প্রথমে, ভাটিয়ালীতে উদার মাঠ, নদী, গাঙ, খাল, বিল প্রভৃতি এলাকার ছন্দোবিহীন টানা সুরে অবরোহী ক্রমে গানের শুরু। এ গানের গায়ক ও শ্রোতা গায়েন নিজে। দ্বিতীয়ত, যখন লোকালয়ে এসে ভাটিয়ালী ছন্দোবদ্ধ হয় তখন এটি একটি ব্যাপক শ্রেণীর লোকসংগীত-রীতি। এর অন্তর্গত বহু রকমের গান। উচ্চারণ ভঙ্গি এবং গানের আহ্বায়ক রীতি এর বিশেষ দিক।

উচ্চারণের রূপ অনুসারে কতকগুলো চলিত মত ছিল—সুষঙ্গী, ভাওয়াইল্যা, বিক্রমপুইর‍্যা, বাখরগঞ্জ্যা, গোপালগঞ্জী, চান্‌পুর‍্যা ও সিলেটী। এসব গান জন্মগত আঞ্চলিক উচ্চারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অভিজ্ঞ সংগ্রাহক বলেন, উচ্চারণের কায়দাকে লহরে সাজানো হয়। লহর বা টানগুলোর বর্ণনা— 'বিচ্ছেদী', 'সারী', 'ঝাঁপ' ও 'ফেরুসাই'। টানা সুরে বিচ্ছেদী লহর। দ্রুত তালে 'সারী' লহর। 'ঝাঁপ' লহর দমকা হাওয়ার মত আকস্মিক। বাকী সকল ভঙ্গি 'ফেরুসাই' লহর নামে পরিচিত। 'না, ঐনা, এই না, রে, আরে, হায়, হায়রে, যে, সে, লো, গো' প্রভৃতি শব্দ বসানোর হেরফেরে লহর বোঝা যায়। যাঁরা এই গানে অভিজ্ঞ তাঁরা সহজে বুঝতে পারেন। তবে শহরে শেখা গানে বোঝা দুঃসাধ্য। তত্ত্বগত ভাবে ভাটিয়ালী মেয়েদের গান নয়, নারীকণ্ঠে এ গানের পদ্ধতি প্রচলিত নয়। চট্টগ্রাম ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় পালাগানে কয়েকটি রীতি বা ভঙ্গি প্রচলিত ছিল—হলুছাফাটা, সাইগরী বা সাওরী ও মুড়াই। হলছাফাটা চট্টগ্রামের গানের পালা। মুড়াই ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলের রীতি। উচ্চগ্রামের কণ্ঠ ও সুরের দোলা এই গানের বৈশিষ্ট্য। সাইগরী বা সাওরী দক্ষিণাঞ্চলে নৌকার মাঝিদের গানের সুর। মূল্যবান পালা গানগুলোর মধ্যে এই রীতিগুলো স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু মোটামুটি এর বিশ্লেষণ করা হয় দুইটি শ্রেণীতে। আহ্বান-সূচক 'তার' স্বর থেকে গানের সুরু। তারার গান্ধার মধ্যম থেকে সুরু হয়ে বিলাবল ঠাটের সমস্ত স্বরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসে সা-এ থেমে যায়, অথবা তারার-স´ থেকে গড়িয়ে এসে উদারার ধ্‌-তে থেমে যায়—এক্ষেত্রে ঝিঁঝিটের সুর বোঝায়। পূর্বের স্বরভঙ্গিটি স্পষ্টতই বেহাগ জাতীয়। অনেক গানেই খাম্বাজের সংমিশ্রণ এবং পাহাড়ী সুরের ভঙ্গিতে ম মধ্যম প্রবল হতে পারে। সুরের দুটো কলিতে—স্থায়ী অথবা ১ম তুকে ছন্দোবদ্ধ গানে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। গানের বহু কলিতে অন্তরার বা ২য় তুকের সুর ব্যবহার হয়। চতুর্মাত্রিক বা দুই মাত্রার তাল এবং তিনমাত্রার খেমটা ছন্দের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় এই গানে। গানগুলোর প্রকৃতি :

বিচ্ছেদী—বিরহ প্রকাশক টানা সুর—সাধারণত, ছন্দ-বর্জিত পুরুষ কণ্ঠের গান।

সারী—দ্রুত তালের, কর্ম-সংগীত শ্রেণীর—নৌকা বাইচের গান। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সংগীত—আনন্দবোধক হাল্কা চালের। মৌখিক রচনাও প্রচলিত।

বারোমাসী—অপেক্ষাকৃত লঘুছন্দে মাস-ঋতু বর্ণনার গান—প্রেম সংগীত, ছন্দোবদ্ধ বিচ্ছেদী ভাব বর্তমান।

ঘাটু—মৈমনসিংহে বালিকাবেশী বালকের নাচ গান। বর্ষাকালে নৌকোতে এ গান প্রচলিত—ঘাটু ঘাটের গান।

পালা গান—গাথা গানগুলো (মহুয়া, মলুয়া ইত্যাদি) পৃথিবীর লোকসাহিত্যের আশ্চর্য সম্পদ বলে স্বীকৃত। ভাটিয়ালীর বিকাশ হয়েছিল বিশেষ করে এই পালা গানগুলোর জন্যেই। অধিকাংশ ছুটা গানগুলো এই পালা গানের অংশ।

মুর্শীদ্যা—ইসলামিক বাউল প্রকৃতির গান। এ গানে ছন্দের রূপ উল্লেখ-যোগ্য। মুর্শীদ অর্থে গুরু বা পীরের গান। সুফীমতের ভাবযুক্ত গান।

জারী—মুসলমানদের মহরম পর্বের গান। মৈমনসিংহ ও ঢাকার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত। বর্ণনাত্মক রচনা। বিশিষ্ট গায়েনের দ্বারা নৃত্যেব ভঙ্গিতে গাওয়া হয়।

বাউল—পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী ভঙ্গির এ গানে মূল বাউলরীতি রক্ষিত হয় না। নৃত্য ভঙ্গি এখানে নেই, বাউল এখানে বসা গান। সুরও দুঃখ-বোধক। এ গানের প্রধান যন্ত্র সারিন্দা।

দেহতত্ত্ব—অনিত্য দেহ ও পরমাত্মার রূপক নিয়ে গান। এ গান কোথাও লৌকিক সুরের, কোথাও বাউলের অনুকরণ এবং কোথাও কীর্তন-প্রভাবিত। ধর্মতত্ত্ব নিয়েই এই গানের উৎপত্তি। বাউল তত্ত্বের সংগে সংমিশ্রিত হয়ে অন্য-দিকে সহজিয়া ও তান্ত্রিক ভাবধারার একটা সংমিশ্রণ হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের দেহতত্ত্ব ভাটিয়ালী রীতিতে গীত। দেহতত্ত্ব সারা দেশময় প্রচলিত।

এছাড়াও **ধানভানা, চিঁড়েকোটা** প্রভৃতির গানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবাহের গানের সুরেরু ভঙ্গি বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। বিবাহের গানগুলো নানাভাবে স্থানচ্যুত হয়ে বর্তমানে কলকাতা এলাকার গায়েনদের সংগ্রহে কিছু কিছু প্রচারিত।

(২) **উত্তর বাংলার** সংগীত প্রকৃতি ব্যাপক ভাবে ভাটিয়ালী রীতির সংগে সামঞ্জস্যমূলক হলেও, মূল সুরভঙ্গির নাম হচ্ছে "ভাওয়াইয়া"। ভাওয়াইয়া কোচবিহারের সংগীতরীতি যা বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। ভাটিয়ালীর সঙ্গে পার্থক্য থাকার মূল কারণ এই অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং ভাষার অনুযায়ী ছন্দ বা

তাল পদ্ধতি। মূল টানা ভাটিয়ালীর রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও ছন্দেই গানের অমিল খুব বেশি। ছন্দ মানে ভাষা সংমিশ্রিত সুর ও তাল।

ভাওয়াইয়া দোতারা গানরূপে বর্ণিত হয়। ভাওয়াইয়া শব্দটিকে কেউ কেউ ভাবগীতির অর্থে ব্যবহার করেন। দোতারা যন্ত্রটি এ গানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত বলে অচ্ছেদ্য মনে করা হয়। দোতারা বিষয়টি নিয়ে অনেক গান আছে। দোতারায় আমাকে পাগল করেছে—এরূপ উক্তিতে লক্ষ্য থাকে বিদেশী মৈষাল—বন্ধুব প্রতি, যার হাতে আছে দোতারা। ভাওয়াইয়া গানে নারীর প্রাধান্য। ভাটিয়ালী যেমন অনেকটাই পুরুষের গান, ভাওয়াইয়া সে দিক থেকে নারীর গান বলা চলে। এর মূল লক্ষ্য করা যায় কোচবিহারে প্রাচীন কোচ-সমাজের নারীপ্রাধান্যে। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মের বিস্তার যেমন হয়েছিল তেমনি ছিল মাণিক রাজার গানের বিস্তার। সেই সঙ্গে এসে মিশেছিল পরবর্তীকালের মুসলমান সমাজ। এই সব মিশে যায় মানবিক প্রেমে। চাষীর গৃহের সমস্যা, মেয়ের বিবাহ, বিদায়, ঘরকন্না, রান্না, সাজসজ্জা, কুমারীর প্রেম, বিদেশী মৈষাল বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ, মৈষাল বন্ধুর যাত্রা এবং বিচ্ছেদ—এ সব বিষয়গুলো চিরাচরিত "কানু ছাড়া গীত নাই" কিংবদন্তীকে নিষ্ফল করে দেয়।

এ গান ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল প্রকার গানের বিষয়বস্তুতে কানুর বা কানাইয়ের প্রাধান্য। মৈষাল বন্ধু এখানকার মূল নায়ক যার জন্যে চাষী-কন্যা নায়িকার আর্তি গানে প্রকাশিত।

মহিষের পিঠে ও গরুর গাড়িতে চেপে চাষী ঘরে ফিরছে। পথ উঁচু নীচু। তার সুরের গানে ঝাঁকুনির সঙ্গে নিয়মিত গলা ভাঙছে। ঝাঁকুনিটা কণ্ঠে ও ছন্দে যেন বিশেষ ভাঙার রূপ দিচ্ছে।

চটকা—কোচবিহার থেকে আরো উত্তর এলাকার গান। ভাওয়াইয়া ভঙ্গির চটকা গান—ব্যঙ্গপূর্ণ। সমাজ ও নানা ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবন নিয়ে শ্লেষ। কোথাও রাধাকৃষ্ণ উপস্থিত। চটকা অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ের গান।

মাহুত বন্ধুর গান—উত্তরবঙ্গের এবং গোয়ালপাড়ার গান। দুই অঞ্চলের গানকে একসূত্রে অনেকটা ভাওয়াইয়ার ভঙ্গিতে একসূত্রে বাঁধে যদিও এ গানে অসমীয়া লোকগীতির প্রভাবও বর্তমান। মনে হয় একই মানব গোষ্ঠীর গানের আঞ্চলিক বিকাশ।

গম্ভীরা—মালদা এলাকার গান। প্রাচীন শৈবধর্মের সংগে সংশ্লিষ্ট এ

গান একটি প্রাচীনতম লোকসংস্কৃতির উদাহরণ। ৭০০-৮০০ খৃঃ নাগাৎ উত্তর বাংলায় গম্ভীরা প্রধান ধর্মীয় সংস্কৃতিরূপে প্রচলিত ছিল এরূপ প্রমাণ আছে। এ গান চৈত্র সংক্রান্তির গাজন-শিবপূজা ইত্যাদির সঙ্গে মিলিত সংগীত। বেশ কয়েকদিন ধরে এ অঞ্চলে আসব জমে। বর্তমান রূপে এ আসরে প্রাচীন লোকসংগীতের শিবস্তুতির সংগে আধুনিক লৌকিক সমস্যা নিয়ে নানা রচনা লৌকিক সুরে গাওয়া হয়। উত্তর বাংলার অন্য গানের সংগে এ গানের মিল নেই।

(৩) **মধ্য অঞ্চলের গান** সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকেই পদাবলী কীর্তনের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়ায়, লোকগীতিকে প্রভাবিত করে কয়েকশত বৎসব ধরে। ধর্মীয় লোকগীতিতে খোল-করতাল বাদ্যযন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। অন্যান্য গানের সুরে কীর্তনের কতকগুলো অংশ অজ্ঞাতসাবে সঞ্চারিত হয়ে যায়। অন্যদিকে শাক্ত সংগীতের রূপও এই অঞ্চল থেকেই ছড়ায়। এ ক্ষেত্রে মঙ্গল গানেব গীত পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। যথা, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদিও এ অঞ্চলে প্রবল ছিল। পাঁচালীর প্রভাব বিস্তারের মূলেও অনেকটাই এই অঞ্চল। কারণ, বাংলার মুসলমান রাজত্বেব পর থেকে বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব মধ্য-বাংলায়ই পরিস্ফুট হয়েছিল।

বাউল—এ অঞ্চলের লোকগীতিতে বাউল গানের কেন্দ্র কুষ্টিয়া। যদিও তত্ত্ব ও ধর্মীয় পদ্ধতি রূপে বাউল গান সত্যিকার লোকগীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; এ একটি ধর্মীয় রীতি, কিন্তু সুব ও তাল ও গীত পদ্ধতি বা গানের কায়দা লোকগীতিরই শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য সুর ও তাল খানিকটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বিকশিত। বাউলের বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশেব বাহনই এই সংগীত। মনের মানুষের প্রতি আকর্ষণ, গুরুবাদ, জীবনের সার্থকতার মূল লক্ষ্য, দেহবাদের অসারতা এবং পরমার্থের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চেষ্টা সকলই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। বৈষ্ণব বাউলেরা কীর্তন-প্রভাবিত। এই ধর্মীয় ভাব প্রকাশের জন্যে অন্তরঙ্গতা ও উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রকাশের সময় বাউল নেচে নেচে গান গায়। এ সত্যিকার নৃত্য নয়। বাউলের সুর ও ছন্দ এ অঞ্চলে বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে বিশেষ ভাবে বিকশিত হয়েছে যা পল্লী সুরে অনেক সময়ে হয় না। বৈষ্ণব বাউলেরা কীর্তনের অঙ্গ ব্যবহার করে এই পন্থাকে আরো এগিয়ে দিয়েছে। দোতারা অথবা গোপীযন্ত্রই বাউলের বিশেষ ব্যবহার্য যন্ত্র। লালন ফকিরের গান এদিক থেকে বিশিষ্ট

কাব্যিক এবং সাংগীতিক সম্পদ হয়ে আছে—বাংলা গানকে প্রভাবিতও করেছে। এ অঞ্চলের ফিকিরচাঁদী ঢংএর বাউল কতকটা স্বতন্ত্র—অনেকটা কীর্তন প্রভাবিত। পূর্বাঞ্চলের বাউলের সুর ভাটিয়ালী প্রভাবিত একথা বলেছি। এরা গানের সঙ্গে সারিন্দা ব্যবহার করে। উত্তরবঙ্গের বাউলদের মধ্যে দোতারার প্রচলন বেশি। গোপীযন্ত্র, গুবগুবা বা আনন্দলহরী মধ্য ও রাঢ় অঞ্চলের প্রধান যন্ত্র। বীরভূমের বাউলদের গানের সুর "ভৈরবী", অনেকটা পরবর্তী প্রভাবজনিত। মধ্য অঞ্চলের গানের মধ্যে অনেকটাই বিলাবল এবং খাম্বাজ ঠাটের সুর লক্ষ্য করা যায়। এই সুর ও ছন্দই বাংলা কাব্যসংগীতকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে।

ভাগীরথীর পূর্বতীরের এলাকায় অন্যান্য গানের মধ্যে মুর্শিদাবাদের এবং নদীয়ার **বোলান** ও **ঝাঁপান** গান এবং মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, নদীয়ার **আলকাফ** গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

বোলান—শিবপূজা বা গাজনের পাঁচালী প্রভাবিত টপ্পা (হাল্কা রসের) যুক্ত গান—তিনজন পুরুষ নারী সেজে গান করে ; যন্ত্র বাজে ঢোলক, বাঁশি, বেহালা। নানা রকমের পালা এতে গাওয়া হয়—লব-কুশ, রাধাকৃষ্ণ, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি।

ঝাঁপান—শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসামঙ্গলের গান। **ভাসান** যাত্রা একই মনসার বিষয়ে নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম এলাকায় গাওয়া হয়।

আলকাফ—গান আর ছড়া নিয়ে দুটি অংশে গীত হয়। প্রসংগ—রাধাকৃষ্ণ প্রেম এবং সমসাময়িক ঘটনা ও সমস্যা। বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মুসলমান চাষীরা এ গান গায়।

(৪) এবারে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের গান সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। রাঢ় দেশ উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে একেবারে বিপরীত ভৌগোলিক অঞ্চল। ভাগীরথী উপত্যকায় দুদিকেই কীর্তন, পাঁচালী, শাক্ত সংগীত, মঙ্গল গান এবং শৈব প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু আরো পশ্চিমে বীরভূম, বাঁকুরে, বর্ধমান, মেদিনীপুরের চড়াই-উৎরাই, কাঁকুরে মাটি আর তাল ও শাল বনের রাজ্য-গুলোতে শৈব-প্রভাব, শূন্যবাদের প্রভাব এবং নানা বিচিত্র আদিবাসী প্রভাবিত বা আঞ্চলিক পার্বণের গান প্রচলিত হয়ে এসেছে। অন্যান্য স্থানের মতো ছুটা গানের প্রচার তেমন নেই। ঐতিহাসিক দিক থেকে এসব অঞ্চলে বৈদেশিক আক্রমণ, মাটির রুক্ষতা, পশ্চিমের আদিবাসীদের প্রভাব ইত্যাদি

অনেকগুলো কারণে এখানকার গান বিশিষ্ট ভাবে নানা স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সাঁওতাল, ভূমিজদের প্রভাবে ব্রত-পার্বণগুলোও ঘরোয়া রূপ নিয়েছে।

ভাদু—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূমের কুমারী মেয়েদের গান। ভাদু ও টুসুর মধ্যে সুর ও তালের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ভাদুদেবী—ভাদুকন্যা বা ভাদুমণি। রাজকন্যা দেবীতে পরিণত। ভাদ্র মাসের শ্রাবণ সংক্রান্তির গান, যদিও পুরো ভাদ্র মাস ভরে চলে। এই গানে রামায়ণ বিষয়ক পাঁচালী গানের রূপ ধরে, নানা সমসাময়িক বিষয়বস্তুও রূপ পেয়ে থাকে। বিহার অঞ্চলের লৌকিক সুর ও ছন্দের ঈষৎ প্রভাব এ গানে স্পষ্ট।

টুসু—উৎসবের গান। অগ্রহায়ণে ও পৌষমাসে শস্য ঘরে এলে এই উৎসব চলে। টুসু স্ত্রীলোকের ব্রত পার্বণের গান, তাই সুরের প্রসার তেমন ভাবে হয় নি। এই নবান্নের গানের সুরের বৈচিত্র্যও তেমন নেই। কোন কোন জেলায় টুসু ভাদুগান দ্বারা প্রভাবিত। টুসু পশ্চিমাঞ্চলের মুণ্ডা জাতি, বাঁবহোড় প্রভৃতির উৎসবের সঙ্গেও সামঞ্জস্যমূলক। টুসু বর্তমানে পালাগানে পরিণত, পালাগান সমসাময়িক জীবন-সমস্যা নিয়ে রচিত।

ঝুমুর—ঝুমুর গানের দুটো শ্রেণী : (১) একটি লৌকিক ছুটা ঝুমুর—আদিবাসীদের গান ছিল। মুণ্ডাভাষী সাঁওতালদের সাধারণ প্রেমসংগীত। আধা বাংলা আধা লৌকিক ভাষায় ছোট ছোট গান। ঘরকন্নার কথা, মেয়ের অলঙ্কার, ফুল, পাখী এবং নতুন জীবন যৌবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় এর অবলম্বন। মাদল আর নাচ ইত্যাদির মাধ্যমে নিতান্ত ব্যক্তিগত উক্তি, উপস্থিত রচনা এর বিষয়। নিছক বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু নেই বলে গানের একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে।

(২) কীর্তনের ঝুমুর অঙ্গ বা অলঙ্কারের কথা আমরা জানি। মল্ল রাজাদের বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনের পর থেকে কীর্তনের পালা লৌকিক ঝুমুরে রূপান্তরিত হয়। পদাবলী কীর্তনের বাধাবন্ধহারা লৌকিক রূপান্তর এই ঝুমুর। গৌরলীলা, কৃষ্ণলীলা, বিভিন্ন পালা গানগুলো আদিবাসীদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে সরল সহজভাবে তাদের নিজ পরিকল্পিত পদাবলী কীর্তনের রূপে প্রকাশিত।

লেটো—নজরুল ছেলেবেলায় এ গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। উপস্থিত রচনার এ গান অনেকটা তর্জার মতো। দু'দলে ভাগ হয়ে তর্জার মতো গান

করে। তাতে থাকে প্রশ্নোত্তর, রসিকতা ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে লেটো ব্যবহৃত হত। গানের রূপ পরবর্তীকালে কিছুটা বদলে গিয়েছে।

পটুয়ার গান—পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে এই গানের অস্তিত্ব এখনো আছে। এক শ্রেণীর লোক পট অঙ্কন করে এবং এই পট নিয়ে নানা ভঙ্গি করে হাতের চিত্র দেখিয়ে গান করে। গানের বিষয়বস্তু—রাধাকৃষ্ণলীলা এবং রামলীলার চিত্র ও গান। সত্যপীরের গানও এই পটুয়াদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

যে সব প্রচলিত ও প্রচারিত গানগুলো উল্লেখ করা হল এর অতিরিক্ত নানা প্রকারের বহু গান চারিদিকে ছড়ানো আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় সুর ও তালের শ্রেণীবিভাগ করলে এতে বিশেষ কয়েকটি ধরণের আঞ্চলিক প্রকৃতিই ধরা পড়ে। অর্থাৎ এক একটি অঞ্চলে এক একটি সুরের প্রকৃতি এবং বিশেষ ভঙ্গির গান প্রচলিত দেখা যায়। ভঙ্গিগুলোই লক্ষ্য করা দরকার। সামগ্রিক ভাবে ছন্দ, তাল ও বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে তথ্য বিশ্লেষণ লোক-সংগীতকে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। লোকসংগীতের লক্ষণগুলো :

১) প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে একক সংগীত (solo) শ্রেণীর। আনুষ্ঠানিক গানে অবশ্য গানের সমবেত প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

২) সুরগুলোর লক্ষণ চিনে রাখবার জন্যে কয়েকটি ঠাট ও রাগের নাম করা দরকার। আসলে এগুলোর সংগে তেমন কোন সম্পর্ক স্থাপিত করা যায় না। প্রথমত বিশেষ প্রচলিত রীতি ও ভঙ্গিতে সপ্ত স্বরের ব্যবহার আছে। বিলাবল ঠাটের সুর এবং খাম্বাজের সুরই অধিক সংখ্যায় ছিল। কীর্তনের প্রভাবে ভৈরব ঠাটের প্রভাতী ধর্মীয় গানের রীতিতে প্রচলিত। বীরভূমের বাউলেরা ভৈরবী রাগের সুর ব্যবহার করে। অনেক গানের ভঙ্গিতে বাংলা বিভাষ বিশেষ প্রচলিত। কাফি ঠাটের সুর কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অনেক গানেই বেহাগ, মাণ্ড, পাহাড়ী, ঝিঁঝিট ধরণের সুর ব্যবহৃত। খণ্ডিত স্বরের ব্যবহার অর্থাৎ গ্রামের পূর্বার্ধের পাঁচটি সুরের মধ্যে পাওয়া যায় আদিম প্রকৃতির গানগুলো, অর্থাৎ অধিকাংশ আদিম প্রকৃতির গানই আবৃত্তিমূলক ও ঘুরে ফিরে এক সুরের পুনরাবৃত্তিই এই লোকগীতির লক্ষণ। চার পাঁচটি

স্বরের মধ্যে গানে যে combination বা অঙ্গ নিয়ে এক একটি গান পূর্ণ, তাকে এইভাবে বলা যায়:

ন্‌সর ॥ সরগ ॥ সরগম ॥ মগরস ॥ সরগপ ॥ সরম ॥ কোন কোন আদি গানে **সগপধ**-ও দেখা যায়। এক একটি গানের সুর এই স্বরের সীমার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এক একটি ধরণের গানেব এই একঘেয়ে সুরপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অনেকে আদি রাগের পরিকল্পনা সম্বন্ধে গবেষণা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকগীতির সঙ্গে রাগের সেই সম্পর্ক স্থাপন নিতান্ত কষ্টকল্পনা ও অবান্তর মনে হয়। কারণ, আদি লোকগীতিতে দ্বি-স্বর, ত্রি-স্বর ও চার-স্বরের একঘেয়ে একহারা ব্যবহারই চলে।

৩) মোটামুটি সুরের (ক) সরলতা, (খ) সমতা, (গ) পুনবাবৃত্তি, (ঘ) অলঙ্কার প্রয়োগের স্বতঃপ্রবৃত্ত বা spontaneous রীতি, (ঙ) উচ্চারণের রুক্ষতা ও অমার্জিত প্রকৃতি, (চ) সুবেব নির্দিষ্ট কাঠামো, (ছ) সুবের বিশিষ্ট ঠাট, নির্দিষ্ট স্বরসংখ্যা ও সীমিত ব্যবহার, (জ) গানের দুটো অংশ—স্থায়ী (পুনরাবৃত্তির ভাগ) এবং পববর্তী একই সুরে সম্পূর্ণ তুকগুলি বারে বাবে গান করবার বহু অংশ, (ঝ) অনেকস্থলে দোহারেব ব্যবহাব অথবা শ্রোতাই দোহার—এই সব লক্ষণ নিয়েই লোকগীতি বিকশিত।

তালেব দিক থেকে বহু শ্রেণীর আদিম প্রকৃতিব গানে মাত্রায় মাত্রায় তাল পাওয়া যায়। অনেকটা isometric ছন্দেই এ সকল গান বহুল প্রচারিত। অন্যদিকে তাল ভাগের মধ্যে ছন্দের দোলাই লোকসংগীতকে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে। তিন মাত্রার ঝোঁক এবং দোলা দিয়ে তৈরি হয় খেমটা তাল। খেমটা তালেব ঝুঁকি সাধারণ তিন মাত্রার তালের মতো নয়। অন্য দিকে দুই মাত্রা ও চারমাত্রার তালগুলোর ঝোঁক দিশি ঠুমরী (যা খোলে বাজানো হয়) এবং ঢোলের ছন্দের অনুযায়ী চতুর্মাত্রিক দোলা-যুক্ত তাল। ২।৩।৪ মাত্রার তালের অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিন্যাস নিয়েই লোক-সংগীতের লয়েব সৃষ্টি। সারি গানে নৌকার বৈঠার তালে তালে দ্রুত চার মাত্রার বিন্যাস লক্ষ্য করা যেতে পারে। খোলের দোঠুকি, লোফা ইত্যাদির প্রচার ব্যাপক ভাবে কীর্তনের প্রভাবেই প্রচারিত। বাউল গানে তিনমাত্রার ছন্দে গান করে চতুর্মাত্রিক তালফের্তা বা চারমাত্রার কারিগরি প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট রূপ। সংমিশ্রিত তাল বা ২।৩ এবং ৩।৪ এর সংমিশ্রণ (ঝাঁপ, যৎ) ইত্যাদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচলিত। কিন্তু লোকগীতির ছন্দে ও তালে

সমান্তরাল নয় বা তালের মার্জিত ভঙ্গি কখনো রক্ষা করা হয় না। আজকাল কণ্ঠ ও তালের আবহ সৃষ্টির জন্যে নানা কৃত্রিমতার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ; অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলে।

লোক-সংগীতের বাদ্যযন্ত্র লোক-সংগীতকে প্রকৃতরূপ দান করে। যে সব বিশিষ্ট যন্ত্র বাংলায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকেও নাট্যশাস্ত্রের মতে, চার শ্রেণীতেই বিভক্ত করে নেওয়া শ্রেয়।

তত বা তার যন্ত্রের মধ্যে প্রথম নারদের হাতের বীণা ধরণের **একতারা**। প্রচলন বাংলায় তেমন নেই। বরং লাউএর খোলসের ফাঁপা গোল ঢোলাকৃতি অংশ থেকে ওপরে সংযুক্ত বাঁশের চিমটে ধরণের মাথায় কানের সাহায্যে লাগানো তার টেনে একতারাতে পরিণত করা হয়। এ একতারার প্রচলনই বেশি। গানের সঙ্গে কান মুচড়ে তারকে সুর করার বিধি আছে।

তত যন্ত্রের বিশিষ্ট একটি রূপ খমক বা **গুবগুবি**, চামড়ার ছাউনি লাগানো একটি গোল ছোট ঢোলাকৃতি কাঠের খোলসের মধ্যে দিয়ে বের করে আনা তারকে একটি খুঁটির সাহায্যে টানা ও ঢিল করার সময়ে ছোট শলা বা 'কোন্' দিয়ে আঘাত করা আর উঁচু নীচু সুরে ছন্দ সৃষ্টি করা এই বিশিষ্ট যন্ত্রের কাজ। যন্ত্রটি বগলে চেপে রেখে বাজানো হয়। এ যন্ত্র ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ প্রচারিত। উড়িষ্যায় এইরূপ যন্ত্রের নাম 'তুধুকী', মহারাষ্ট্রে 'চৌধুকী, অন্ধ্রে 'জামিদাইকা', উত্তর প্রদেশে 'ধুন-ধুনাওয়া' ইত্যাদি। যন্ত্রটিকে তত শ্রেণীর না বলে তত+অবনদ্ধ বা তালযন্ত্র বলাই শ্রেয়। **গোপী যন্ত্র** চিমটে প্রকৃতির একতারার মতো, এতে দুই বাঁশের বাহুতে চেপে তারে আঘাত করে সুর ও ছন্দ সৃষ্টি করা হয়।

সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ আসামের বিশিষ্ট অঞ্চল জুড়ে দোতারার ব্যাপক প্রচলন আছে। যদিও উত্তরবঙ্গে **দোতারাকে** স্থানীয় যন্ত্ররূপে দাবী করা হয়ে থাকে, তবু দোতারাকে এরূপ কোন দাবীর সামিল করা যায় না। দোতারা শুধু এসব অঞ্চলেই প্রচারিত নয়। এমন কি ত্রিপুরার রিয়াংদেরও আমি **চমপ্রেং** নামক অনুরূপ যন্ত্র বাজিয়ে গান করতে দেখেছি। দোতারায় যে কয়েকটি তারই থাক (মোটামুটি ৪টি), দুটো তার বাজানো হয়। দোতারা ছোট সরোদ ভঙ্গির যন্ত্র, ঘুঁটি (জওয়া) দিয়ে তার বাজানো হয় এবং বাঁ হাতের আঙুলের ডগা ঘসে সুর সৃষ্টিই রীতি। কাশ্মীরে বহুকাল

থেকে রবাব যন্ত্রটি লোকগীতির সংগে ব্যবহৃত। মনে হয়, মধ্যযুগের কোন সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে অনুরূপ দোতারা যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয় অথবা রবাব বা সরোদ জাতীয় যন্ত্রের অনুকরণ করা হয়। বর্তমানে দোতারা বাংলা লোকগীতির মৌলিক সুর যন্ত্র। একদিকে ছন্দোবদ্ধ ভাটিয়ালী গানে এবং অন্য দিকে ভাওয়াইয়া শ্রেণীর গানে এ যন্ত্রটিই একমাত্র অবলম্বন। স্বরাজ ইত্যাদি অন্যান্য নামেও এ যন্ত্রটি চলে।

ধীরগতি, টানা অনেক ভাটিয়াল পালাগানের সংগে আগে **সারিন্দা** ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হত না। সারিন্দা পূর্ববঙ্গের আদি যন্ত্র। সারেঙ্গী, বেহালা ইত্যাদির সম্মিলনে লৌকিক রীতিতে কাঠ খুদে, এর ওপর গোসাপের চামড়ার আচ্ছাদন চড়িয়ে এবং তার ওপর সওয়ারী লাগিয়ে ও মাথায় কান লাগিয়ে তার টানা দেওয়া হয়। এরপর ঘোড়ার লেজে তৈরি ধনুক-ছড়ির সাহায্যে কোলে রেখে বা বুকে ঝুলিয়ে বাজানো হয়। যন্ত্রটি এখন লুপ্তপ্রায়।

আনদ্ধ বা **অবনদ্ধ**—ছাউনিওয়ালা যন্ত্র। লোক-সংগীতে ব্যবহৃত আদি এবং প্রধান যন্ত্রই আঘাত করে ছন্দ বাজাবার যন্ত্র। বহু গানে কেবল তালবাদ্যই বাজে না, বরং সংগে বাজে **ঘন**-যন্ত্র অর্থাৎ শক্ত (বিশেষ করে ধাতুর তৈরি) কাঁসি, করতাল অথবা মন্দিরা জাতীয় যন্ত্র। বাংলার লোক-সংগীত তালবাদ্য-প্রধান। শুধু বাংলায় কেন, আদিবাসীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই। খঞ্জরি বা খঞ্জনীর ব্যবহার বাংলায় খুবই কম। বাংলা লোক-সংগীতের প্রধান এবং আদি যন্ত্র **ঢোল**। বাংলার ঢোলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের ঢোলের খানিকটা পার্থক্য আছে, যদিও ঢোল ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলেরই যন্ত্র। ঢোলের বহু আকার-ভেদ ও প্রকৃতি-ভেদ এবং রূপান্তর হয়েছে।

কাঁধে ঝুলিয়ে পেটের ওপর রেখে বাজাবার মতো এই বৃহৎ যন্ত্রটির দুদিকে চামড়ার ছাউনি, ডান হাতে বাঁকা কাঠিতে বাজানো হয় এবং বাঁদিকে খালি হাতে। ঊনবিংশ শতকেরও পূর্ব থেকে ঢোল পাঁচালী এবং অন্যান্য লোকগীতির সঙ্গে ব্যবহৃত হত। বাইরের বা মুক্ত অঙ্গনের যন্ত্র বলে ঢোল প্রথমে পূজা ও উৎসবাদির জন্যই বিশিষ্ট ছিল, পরবর্তীকালে বেশি করে দলীয় গানে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং নটুসম্প্রদায় বাজনার কায়দা পুরোপুরি বিকশিত করে নেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঢোল বাজনা, তবলা বাঁয়া এবং খোল বাদন অনুসরণ করতে থাকে। ঊনবিংশ শতকে কলকাতার

কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি চমকপ্রদ ঢোল বাজাতেন বলে জানা যায়। এযুগের ক্ষীরোদ নট্টের মতো বহু সেরা ঢোল-বাদকের নাম অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। কবি গানের সহায়ক হয়েছিল ঢোল। ঢোলেই **আড়খেমটা** এবং চতুর্মাত্রিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ফুটে ওঠে। বাইরের অনেক লোকগীতিতে বিশিষ্ট কায়দার ঢোল ছিল প্রধান অবলম্বন। পরবর্তী কালে বহু গানের সঙ্গে ঢোলের তালই প্রযুক্ত হত। আজও মুক্ত অঙ্গনে পূজো অর্চাতে সশব্দে ঢোল বাজে কাঁসর এবং গ্রাম্য সানাই-এর সঙ্গে।

আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে **খোল** (শ্রীখোল) ও করতালের স্থান বিশিষ্ট। ধর্মীয় গানে (বৈষ্ণব অথবা শাক্ত), বহু মঙ্গলগীতি এবং উৎসব অনুষ্ঠানের গানে খোল-করতাল বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, খোলের প্রয়োগ বাংলাদেশেই হয়েছিল। মনে হয় শ্রীচৈতন্যের অনতিকাল পরেই খোল বাদন নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। খোলের ইতিহাস বিশ্লেষণের উপযুক্ত বহু গ্রন্থ এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাছাড়া খোল বাদনের আঙ্গিকও চূড়ান্ত ভাবে বিকশিত। প্রাচীন গ্রন্থের মর্দলম (মাদল নয়) যন্ত্রটি এই জাতীয় ছিল। মাটির তৈরি যবের আকৃতি সম্পন্ন এই যন্ত্রটি কাঠে তৈরি হত। এখনও কাঠের তৈরি যন্ত্রের ব্যবহার হয় মণিপুরে। খোলের ডান দিকের সরু আওয়াজই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ছাউনিতে খরন বা গাব লাগানোর পদ্ধতিই এ যন্ত্রকে বিশিষ্ট করেছে। সাধারণত ডানদিকে ভারি গাব এবং বাঁদিকে হাল্কা গাব লাগানো হয়।

অন্যান্য আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে **ঢাক বা জয় ঢাক** বাংলার বিশিষ্ট যন্ত্র। এটাকে পুরোপুরি বহির্দ্বারিক বলা যায়। ঢক্কার উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে মিলে। কিন্তু বাংলার ঢাকে কাঠের মোটা পেটওয়ালা যন্ত্রের দুদিকে বড়ো চামড়ার টানা দেওয়ার ফলে একটি দিকেই বিশেষ আওয়াজের সৃষ্টি হয়। বাজানো হয় দুটো কাঠির সাহায্যে। ওজনে এবং আকৃতিতে বড়ো হলেও কাঁধে ঝুলিয়ে একমুখে বাজানো চলে। এই ঢাককে প্রাচীন যুদ্ধ-যন্ত্র বলতে দ্বিধা হয়। সাধারণত বাংলার এই যন্ত্রটিতে বিশিষ্ট খেমটা ও চতুর্মাত্রিক দোলা দেওয়া ঝোলান ছন্দ বাজানো হয়। শৈব ও শাক্ত মুক্ত অনুষ্ঠানেই এই যন্ত্র প্রযুক্ত —দুর্গা ও কালীপুজোর সংগে বিশেষ সংশ্লিষ্ট। গাজনের উৎসবে এর প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

লোকসংগীতের সঙ্গে ব্যবহৃত আরো কয়েকটি আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে **ঢোলক,**

তবলা-বাঁয়া, **খঞ্জনী** এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে **মাদল** উল্লেখযোগ্য। ঢোলক ঢোলেরই ছোট সংস্করণ, অপেক্ষাকৃত আধুনিকতম। যন্ত্রটির বিশিষ্ট ব্যবহার হিন্দী লোকসংগীতেই বেশি, বাংলায় এ যন্ত্র কতকটা পশ্চিমের প্রভাবে কোন কোন গানে ব্যবহার করা হয়। বাংলায় ইসলামী সংগীতের অবলম্বনেই ঢোলকের ব্যবহার অনেকটা ছড়িয়েছে। লোকসংগীতে তবলা-বাঁয়া আধুনিকতম ব্যবহার বলা যায়। খঞ্জনীর গান এদেশে তেমন নেই। ফিকিরচাঁদী বাউল গানের সংগে ব্যবহৃত খঞ্জনীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা করতালেরই নামান্তর।

ঘন যন্ত্রের মধ্যে করতাল, ঝাঁঝ এবং মন্দিরার বহু বড়ো ও ছোট সংস্করণ কীর্তন, পালাগান, যাত্রা, পাঁচালী, কবি, মালসী (শ্যামাসংগীতের লৌকিক গান) প্রভৃতিতে ব্যবহৃত। এই যন্ত্র-ব্যবহার প্রধানতঃ কীর্তনের প্রভাবে বলা যায়। কাঁসর যন্ত্রটি ঢোল এবং ঢাকের সঙ্গে উভয় ক্ষেত্রেই বাজানো হয়।

লৌকিক যন্ত্রের আর একটি বিশিষ্ট রূপ **সুষীর** বা **শুষির** যন্ত্র—ফুঁ দিয়ে অথবা হাওয়ায় যে যন্ত্র বাজানো হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে বাঁশীই সংগীত যন্ত্রের আদিতে। স্বভাবতই হাওয়ায় খোলা বাঁশ বেজে ওঠা অথবা বাঁশ বাজানোর মতো হাড় ছিদ্র করে আদিবাসীদের বাঁশি বাজানোর উদাহরণ মনে হতে পারে। গানের সংগে বাঁশী বাজানোর প্রচলন বহু পরবর্তী। বেণু বাজানোর উদাহরণ একমাত্র মুণ্ডা, ওরাওঁ অর্থাৎ সাঁওতালী গানে মিলে। কীর্তনের সঙ্গে নানা ধরণের শিঙ্গা বাজানো হত। শঙ্খ প্রাচীন মাঙ্গলিক বাদ্য। শানাই মুসলমান রাজত্বের শেষ দিকে পূর্ব বাংলার গ্রাম অঞ্চলে অনুকরণ করে ঢোলের সঙ্গে বাজানো হত। এ অঞ্চলে ত্রিপুরার বিশেষ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ছিদ্রওয়ালা ত্রিপুরা বাঁশের বাঁশী সৃষ্টি। উচ্চ সংগীতের বিশিষ্ট আকর্ষণরূপে শাহ্‌নাই এর মতো এই শতকেই এ বাঁশী রাগসংগীতের বাদ্যযন্ত্রে পরিণত।

এই সকল যন্ত্রের পরিশীলিত বাদন-ভঙ্গি, সুরের যথাযথ প্রয়োগ ও যন্ত্র-গুলোকে কিছুটা সংস্কার করার ফলে, আধুনিক যুগে লোকসংগীত এক ধাপ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। গ্রাম্যতা এবং রসবোধ, রুক্ষতা ও স্নিগ্ধতা, অমার্জিত ও মার্জিত এই দুটো প্রকৃতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাগুলো লোকসংগীতের নিজস্ব। কিন্তু যখন কণ্ঠ ব্যবহারের কৌশল, এবং শ্রোতাসাধারণের কাছে গান উপস্থাপিত করবার জন্যে সুরের নির্বাচন

ও ছাঁটাই প্রক্রিয়া বিশেষ গায়কের মধ্যে চলতে থাকে, তখন লোকসংগীত খানিকটা মার্জিত হয়ে পড়ে। গান কতটা মার্জিত হবে তাতে তর্কের অবকাশ নেই, কিন্তু কাঠামো বিকৃত করা চলে না। হাল আমলে হারমনিয়াম এবং অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহার, তবলা-বাঁয়ার প্রয়োগ লোকসংগীতকে এমন স্তরে স্থাপিত করেছে যে সে সম্বন্ধে বহু মতান্তরের উদ্ভব হয়েছে। শ্রাব্য বিষয়ের গ্রহণযোগ্য রূপের মধ্যে তারতম্য হলে যে কোন শ্রোতা সুশ্রাব্য বস্তুকেই গ্রহণ করে। সংগীতের এই ত বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ মৌলিক-লোকগীতির পরিবেশে অত্যন্ত রুক্ষ গানও যেরূপ গ্রাহ্য, অন্য পরিবেশে তা গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। অন্তত সাংগীতিক নিয়মে রীতি পদ্ধতি ও প্রকৃতি বজায় রেখে যে লোকসংগীত সাংগীতিক রূপে উত্তীর্ণ হয় তাই আজ লোকসংগীতরূপে স্বীকৃত হয়। এ বিষয়ে সাংগীতিক এবং লোকসাহিত্যের প্রবক্তার মধ্যে মতভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ বাদ্য সংগীত ॥

সেতার, সুরবাহার, বীণা, রবাব, সুরশৃঙ্গার ও সরোদ ঘরাণা

বাদ্য সংগীতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগীত প্রচারের শ্রেষ্ঠ বাহন। পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকগণ বুঝেছেন ভারতীয় রাগ সংগীত মেলডি প্রকৃতির বা একক-সংগীত হলেও তার ক্রমবিকাশ তাঁদের শ্রেষ্ঠ সংগীতের (হারমনি) তুলনায় ন্যূন নয়। ভারতীয় রাগসংগীত বোঝবার চেষ্টা ইয়োরোপীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে ঊনবিংশ শতক থেকেই শুরু, কিন্তু তাঁদের কাছে সব সময়েই এ সংগীত অত্যন্ত জটিল মনে হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বক্তব্য তাঁদের গ্রন্থে অনেকটা বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রচিত, কোথাও কোথাও comparative বা তুলনামূলক উক্তিও মিলে। অন্যদিকে ভারতীয় সংগীতে বাস্তব জীবনে 'হারমনি' উদ্ভাবন ও প্রয়োগের চেষ্টাও চলেছে। কিছু সংখ্যক বাদ্য-বৃন্দ বা অরকেস্ট্রা ঊনবিংশ শতক থেকে রচিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সিনেমাতে, গ্রামোফোন রেকর্ডে ও রেডিওতে ব্যাপক ব্যবহার চলেছে।

যে যন্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় রাগ-সংগীত বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত তা হচ্ছে সেতার এবং সরোদ। উনবিংশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত বহু ভারতীয় শিল্পী ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে সংগীত প্রচার করেছেন। এর ফল আধুনিক কালেই বেশি স্পষ্ট হয়েছে।

সেতার: যে যন্ত্রের মাধ্যমে আজকের প্রচার অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিদেশেও যে যন্ত্র বিশেষ প্রচলিত হচ্ছে তা—**সেতার**। যন্ত্রটি বর্তমানে সেতার ও সুরবাহার সমবায়ে একই নামে প্রচারিত। সেতারের ইতিহাস নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন। কিংবদন্তী ও অনুমান নির্ভর করে নিম্নলিখিত মতগুলো ছড়িয়ে আছে:

১। প্রাচীন যুগের অসংখ্য বীণার মধ্যে সেতারের উদ্ভব সম্বন্ধে অনেক-গুলো বীণার নাম করা হয়, যথা—চিত্রাবীণা, সপ্ততন্ত্রী বীণা, পরিবাদিনী, কচ্ছপী বীণা (শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর), বিপঞ্চী বীণা ইত্যাদি।

২। আমীর খুসরোর উদ্ভাবিত যন্ত্র।

৩। বিদেশী কিথারা বা Kouttra'র সংগে তুলনীয়/প্রভাবিত/সম্পর্কিত। কোন কোন মতে যন্ত্রটি পারস্যদেশ থেকে এসেছে।

৪। আবুল ফজলের বর্ণনায় "যন্তর"—কাষ্ঠনির্মিত দুই তুম্বাওয়ালা পাঁচ তারের যন্ত্র। সেকালের যন্ত্র শব্দে বোঝায় ত্রিতন্ত্রী বীণা। "সেহ্‌তার দারদ"-এর সংক্ষেপ উল্লেখে "বীণ-সেহ্‌তারের" উদ্ভব অনুমান করা হয়।

৫। ফকিরুল্লাহ্ "যন্তর" বর্ণনা করেছেন—'কাষ্ঠ নির্মিত। লম্বায় একগজ, ভিতরটা ফাঁপা। দুদিকে দুটি লাউ থাকে। লাউ দুটির উপরের দিকের অংশ কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। দাণ্ডের ওপর দিয়ে পর্দা সংযুক্ত থাকে এবং তার উপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার দুই প্রান্ত থেকে বাঁধা থাকে।'

অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেতারের কোন স্পষ্ট পরিচয় নেই। তানসেন-পুত্র বিলাস খাঁর পরে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত এলে আমরা মসিদ খাঁর নামের উল্লেখ দেখতে পাই। এর মানে, মসিদখানী বাজনার উদ্ভব ঔরঙ্গ-জেবেরও পরে, অর্থাৎ তানসেনের পঞ্চম পুরুষের শেষ ভাগে। কারণ বিলাস খাঁ জাহাঙ্গীরের সভায়ও বর্তমান ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও মহম্মদ শা'র সংগে সেতার উদ্ভাবনের কিংবদন্তী জড়িত আছে। মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ও শেষ ভাগে সেতার যন্ত্রটি উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হয়। বীণ থেকে সহজতর এবং বাজনায়

নৈপুণ্য প্রদর্শনের উপযোগী যন্ত্র বলেই জনপ্রিয় হয়েছিল। আধুনিক কালের প্রবীণ সেতারীদের মতানুসারে কিংবা প্রবীণ তাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া যায়:

গোয়ালিয়রের রহিম সেন ও পুত্র অমৃত সেন প্রথম সেতার ঘরাণার সৃষ্টি করেন বলে দাবী করা হয়। কিন্তু সেতারের প্রথম প্রবর্তনের কোন যুক্তিই প্রামাণ্য নয়।

অন্যদিকে সুরবাহার প্রচলনের প্রথম ঐতিহ্য গোলাম মহম্মদ নামটির সঙ্গে জড়িত। গোলাম মহম্মদের পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ রাজা শৌরীন্দ্রমোহনকে সেতার শিক্ষা দেন। এই ধারা কলকাতার আরো অনেকের বাজনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ইমদাদ খাঁ এঁর সংগে যুক্ত ছিলেন।

১৮২৫ খৃঃ এ লিখিত মাদনুল মুসীকীতে তৎকালীন অথবা অনতিকাল পুর্বের সেতার বাদকদেব এই নামগুলো উল্লিখিত: ১। রহিম সেন—মসিদ খাঁর পুত্র, ২। নবাব গোলাম হোসেন খাঁ (দিল্লী), ৩। গোলাম রেজা (লক্ষ্ণৌ)—ঠুমরি বাজের জন্য খ্যাত, রেজাখানী গতের উদ্ভাবক, ৪। গোলাম মহম্মদ (সুরবাহার বাদক), ৫। বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ, ৬। রাজ পাই—প্যার খাঁ জাফর খাঁর শিষ্য, ৭। বরকত উফ' সন্ বহা—প্যার খাঁর শিষ্য, ৮। নবাব ইশমত জঙ্গ প্যার খাঁব শিষ্য, ৯। নবাব অল্লী নক্কী খাঁ এবং ১০। ঘসীট খাঁ —দুজনই ওয়াজেদ আলি শাহের দেওয়ান হায়িদার খাঁর শিষ্য, ১১। কুতুব আলি উদ্দৌলা—প্যার খাঁর শিষ্য, ১২। নবীবক্স—গোলাম মহম্মদের শিষ্য। উল্লিখিত বাদকদের মধ্যে অনেকেই প্রথম যুগের বিশিষ্ট সুরবাহার ও সেতার শিল্পী। প্যার খাঁর নাম কয়েকটি ক্ষেত্রেই উল্লিখিত। তানসেনের পুত্র বংশের তিনজন বিশিষ্ট কলাবন্ত জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, বেতিয়া, রেওয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। এঁরা আসলে রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। এঁদের মধ্যে প্যার খাঁ উদ্ভাবনী শক্তিতে বিখ্যাত। সেতারের উদ্ভব ও শিক্ষাদানের সংগে ইনি সংশ্লিষ্ট, বেশ কয়েকজন সেরা সেতারীই প্যার খাঁর কাছে শিখেছিলেন;

মোটামুটি, উল্লিখিত কয়েকটি উৎস থেকে মনে হয় সুরবাহার ও সেতার বাদন নানাভাবে অনেকের মধ্য দিয়েই প্রচারিত হয়েছে। গোয়ালিয়র, জয়পুর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ এ কয়েকটিই সেতারের বিশেষ কেন্দ্র, এবং উদ্ভব অনুসন্ধান

করতে আজ থেকে দু'শো বছর আগেও যাওয়া চলে না। উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট সুরবাহার-সেতারের স্রষ্টা শিল্পী ইমদাদ খাঁ কলকাতায়ই দীর্ঘকাল বাস করেছেন। তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভায় ও ওয়াজেদ আলি খাঁর সভায় ছিলেন এবং জীবনের শেষ কয়েকটি বছর কাটান ইন্দোরে। ইমদাদ খানের নিজ শিক্ষায় একদিকে জয়পুরের বজর আলী খাঁ এবং আমীর খাঁ এবং পরে অন্যদিকে কলকাতায় সাজ্জাদ মহম্মদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। অনেক-গুলো ধারাই ইমদাদ খানের বাজনায় যুক্ত হয়েছিল—যা এনায়েৎ খানের বাজনায় সঞ্চারিত হয়। সুরবাহারের আলাপে ইমদাদ খাঁ ছিলেন অতুলনীয়। গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রথম যুগে যে কয়েকটি রচনা প্রচারিত হয়েছিল তার দ্বারাই তাঁর অদ্বিতীয় শিল্পী-সত্তা বোঝা যায়।

সেতার বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংগীত প্রচারের একটি প্রধান মাধ্যম। প্রচারের কৃতিত্ব পণ্ডিত রবিশঙ্করের অনেকটা হলেও পূর্বেও সেতার সে দেশে প্রচারিত হয়েছিল। এখন সংগীতের ইতিহাসে বক্তব্য এই যে বর্তমান শতকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মত সার্থক সংগীত-শিক্ষাদাতা এর মূলে। মধ্যযুগের সংগীতে শিক্ষাদানের চিন্তা ও প্রসার স্বাভাবিক ছিল না, শিক্ষার্থীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাধনা এবং শিক্ষা গ্রহণের শক্তিই ছিল প্রধান। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ শিক্ষাদানের বিশিষ্ট কয়েকটি রীতি উদ্ভাবন করেন সেতার যন্ত্রটিতে। বর্তমান যুগের ভাবধারা অনুসারে প্রচার, প্রসার ও গ্রহণ-বর্জন যখন প্রবল, তখন সেতারের মত ভারতীয় আধুনিকতম যন্ত্রটিতে উত্তর ভারতীয় বহু বিভিন্ন রীতিকে সম্মিলিত করা হয়েছে। সেতারের কাজ এই দিক থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ঘরাণা কায়দায় আবদ্ধ নেই। নানা পদ্ধতির মিলন ও উদ্ভাবনের যন্ত্ররূপে বর্তমান যুগের ইতিহাসে সেতার বিশিষ্ট।

রীতি অনুসারে সেতারে বাজানো হতো আওচার, জোড়, ঝালা, মসিদখানী ও রেজাখানী গৎতোড়া। সুরবাহারে বাজানো হতো আলাপ, জোড়, ঝালা—বীণ-কায়দায় ধ্রুপদী ভঙ্গিতে। বাজনার রীতি আজকাল সংমিশ্রিত।

সেতারের অঙ্গগুলোর নাম এইরূপ—হাঁড়ি, তবলি, লেঙটি (টেল্‌পিস্‌), সওয়ারী (ব্রীজ), ঘোড়ী, আড়ি, ঘাড়ী, সরস্বতী, পর্দা, কান, দান্‌ডি, তরফের তার, নায়কী তার বা 'মেন' তার, মধ্যম তার, সুর তার, জুড়ী তার, খরজের তার, চিকারী, মিজরাব ইত্যাদি।

বীণা—বৈদিক যুগে এবং গান্ধর্ব সংগীতের যুগে বহু প্রকারের বীণা প্রচলিত ছিল। সমস্ত প্রকারের বাদ্যযন্ত্র (বিশেষ করে তত শ্রেণীর) বীণা নামে অভিহিত হত [প্রথম পরিচ্ছেদ]। এই সকল বীণার আকৃতিগুলো সাধারণতঃ প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনরূপে বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টজন্মের কয়েকশত বৎসর পূর্বে, গান্ধর্ব গানের প্রথম যুগে তুম্বী বীণার প্রচলন ছিল। আজকালকার তম্বুরা (তানপুরা) সেকালের তুম্ববীণার সংগে সংশ্লিষ্ট কিনা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কোন কোন মতে তানপুরা মিশর অঞ্চল থেকে এসেছে। শোনা যায় তুর্কী, আরব, পারস্য এ সব দেশে বহু-তার-সমন্বিত অনুরূপ নামের যন্ত্র প্রচলিত ছিল। যন্ত্রটি 'জাওয়া' দিয়ে অথবা আঙুলে বাজান হত। এই যন্ত্রের সঙ্গে বর্তমান তম্বুরার মিল থাকা সম্ভব নয়। নাম নিয়ে গবেষণা ভাষা তত্ত্বের কাজ, নামের সামঞ্জস্যে সংগীতের সামঞ্জস্য নির্ধারণ মানে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগীতের সম্বন্ধে বলা। তম্বুর ও তানপুরা, কিথারী ও সেতার, তবল (আরবী) ও তবলা—এ সব এক ধরণের ভাষায় অভিহিত বিভিন্ন ধরণের বিষয়। ভাষার দিক থেকে যত মিল থাক না কেন সাংগীতিক অনুসন্ধানের ফল স্বতন্ত্র।

খৃষ্টীয় শতকের পূর্ব থেকেই বৌদ্ধধর্ম নানা দেশে প্রচারিত হতে থাকে। সেই সূত্রে ভারত থেকে বিভিন্ন সংগীত-যন্ত্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (মধ্য এশিয়ায়) ছড়িয়ে গিয়েছে, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণ আছে। অন্য দিকে খৃষ্টীয় শতকের পর থেকে বহুযুগব্যাপী বাইরের আক্রমণের ফলে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হয়েছে। দ্রাবিড় অঞ্চলের আদি বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে সুমিরিয় (৩০০০ খৃঃ পূঃ) বাদ্য যন্ত্রের সামঞ্জস্যও উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন বীণা যন্ত্রের নানারূপ মৌলিক গঠন আছে যা এদেশের বিশিষ্ট যন্ত্ররূপে ভারতেই বিকশিত। ম্যাণ্ডোলিন রূপের বীণা যন্ত্রের উদাহরণ মিলে অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতিতে, যার প্রতিফলন দেখা যায় মধ্য এশিয়ায় দেওয়াল চিত্রে। অন্যদিকে সুদূর বরবুদুর, জাভা, বালী প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন তো নানা ভাবেই মিলে। আমরা এখানে বর্তমান যন্ত্রগুলোকে লক্ষ্য করব।

বীণা যন্ত্রটি কুঁদনো কাঠে তৈরি। দাক্ষিণাত্যে এর বিশেষ প্রচলন উল্লেখ-যোগ্য। অন্ধ্রপ্রদেশে, তামিলনাদে সপ্ততারের এই যন্ত্রবাদ্যটি শুইয়ে রেখে নানা ভাবে বাজানোর রীতি প্রচলিত আছে। একটি কাঠ কুঁদে তৈরি যন্ত্র

কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো স্বতন্ত্রভাবে তৈবি করে জুড়ে দেওযা হয়। বীণা যন্ত্রেব ব্যবহাবে যাঁর ঐতিহাসিক অবদান বিশেষ স্মরণীয়, তিনি হলেন তাঞ্জোবেব বাজা বঘুনাথ নায়ক, যিনি চব্বিশটি ঘাটেব প্রয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ দীক্ষিতাব তাঁব সহায়তা কবেছিলেন। ঘাটগুলো এমন ভাবে সাজানো হয় যেন মেলকর্তা পদ্ধতিতে বাগ বাদনেব উপযুক্ত হয় যন্ত্রটি। বীণায় উদ্ভাবিত সংগীতেব মধ্যে তানম্ বিশেষ উল্লখযোগ্য। সাধাবণ নামে এই যন্ত্র সরস্বতী বীণারূপে প্রচাবিত। এই সম্পর্কে বিখ্যাত শিল্পী শেষণেব বীণাবাদন সম্বন্ধে দিলীপকুমাব রায়েব বর্ণনা স্মবণীয়।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কর্ণাটক সংগীতেব আব একটি যন্ত্র—গোট্টুবাদ্যম। এতে ঘাট ব্যবহাব হয না, বাজানো হয় তাবেব ওপবে স্বব চালনাব উপযুক্ত একটি মোষেব শিং-এব টুকবো দিয়ে। গোট্টুবাদ্যম্ যন্ত্রে বাজানো হয়—রাগ আলাপন, তানম্, পল্লবী ইত্যাদি। যন্ত্রটিব প্রচলন হযেছে বিগত একশত বৎসবেব মধ্যে। গোট্টুবাদ্যম প্রচলনেব সংগে সংশ্লিষ্ট দুটো বিখ্যাত নাম—তিরুবিদায়ীমরুদূব সখাবাম বাও এবং মহীশূবেব নাবায়ণ বাও আয়েঙ্গাব।

প্রাচীন বীণ উত্তব ভাবতে গানেব সংগেই বাজানো হত। ক্রমে একক বাজনাব জন্যে যন্ত্রটি শিল্পী ও কলাবন্তদেব প্রিয হয়ে ওঠে। কর্ণাটক সংগীতেব বীণা এবং উত্তব ভাবতে ব্যবহৃত বীণ দুটোই সবস্বতী বীণা, যদিও গঠন ও আকৃতিতে বৈষম্য আছে। উত্তব ভাবতীয বীণাতেও ২৪টি ঘাট শ্রুতি বিচাব কবে লাগানো হয়। সাধাবণতঃ বাঁ কাঁধে ফেলে বীণাটি বাজানো হয় (দক্ষিণী পদ্ধতিব মত কোলে নিয়ে অথবা শুইযে বেখে নয়)। কাঁধেব ওপরে থাকে বীণাব উপবিভাগে লাগানো তুম্বাটি। একক বাজনায় আলাপ, জোড়, ঝালা প্রভৃতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে বাজানো হয়। ছন্দেব সঙ্গে বাজে পাখওয়াজ, তবে সাধাবণতঃ তাল বাজানো হয না। চিকাবীব তাবেব ব্যবহাবও প্রচলিত। বিশেষ ভাবাভিব্যক্তিব জন্যে পাখওযাজ ও বীণেব মিলিত বাজনায় তাবপবণ শোনা যায়।

বীণাবাদনে আকববেব সভায় বিশিষ্ট ছিলেন মিশ্রি সিং বা নবাৎখাঁ। তানসেনের পুত্র বিলাসখাঁও বিশিষ্ট বীণবাদক ছিলেন। বীণবাদনে তানসেনেব পুত্র-কন্যা বংশীয়দেব মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ কবা হয়—শাহ্ সদাবঙ্গ (নিয়ামৎ খাঁ), ফেবোজ খাঁ, মহাবঙ্গ, জীবন শা, প্যাবি খাঁ (অংলীকট), জীবনশাহেব পুত্র নির্মল শাহ, ওমবাও খাঁ, ছোট নবাৎ খাঁ

প্রভৃতি। এই ধারা আমীর খাঁ, ওয়াজীর খাঁ, দবীর খাঁ এবং বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীতে সমাপ্ত। আগ্রা ঘড়পোবের ঘরাণায় বাংলার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত। অন্যান্য বীণ ঘরাণাগুলোর মধ্যে জয়পুরের রজব আলী উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বীণ ঘরাণা অযোধ্যা, বারাণসী ও উদয়পুরের সংগে সংশ্লিষ্ট। কিরাণা ঘরাণায়—বন্দেআলী খাঁ। আবদুল আজীজ খাঁর বিচিত্র বীণা অনেকটা গোট্টু বাদ্যমের অনুসরণ।

রবাব—উত্তর ভারতের সেকালের কলাবন্তদের জনপ্রিয় যন্ত্র রবাব। রবাবকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করেছিলেন তানসেন। রুদ্রবীণা প্রাচীন ভারতের রবাব জাতীয় কোন বীণা কিনা সঠিক বলা চলে না, আকৃতিতে সামঞ্জস্য আছে। রবাবের পরবর্তী বিকাশ সুরশৃঙ্গার ও সরোদ। আজও কাশ্মীরের লোকসংগীত ছকরী, রউফ প্রভৃতির সঙ্গে বাজে রবাব। অর্থাৎ রবাব প্রাচীন যুগে জনপ্রিয় যন্ত্ররূপে পাঞ্জাবে ও আফগানিস্থানে প্রচলিত ছিল। কাঠের তৈরী কুদনো যন্ত্রটিতে কিছু কিছু পর্দাও বেঁধে দেওয়া হত। যন্ত্রটি ব্যাঞ্জোর মত বাজানো হত। তানসেন রবাবকে রাগসংগীতের উপযোগী করে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, বীণের সংগে সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছিল। তানসেনের বংশের রবাবীয়াগণ পরবর্তীকালে সুরশৃঙ্গার এবং সরোদ উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেন।

সুরশৃঙ্গার–বিলাস খাঁর পরে ৭ম পুরুষে ছজু খাঁ ছিলেন বিশিষ্ট রবাবী। তাঁর পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ায় তাঁরা বীণ ও রবাবে পারদর্শী ছিলেন। বীণকার 'নির্মলশাহ্' এঁদের শিক্ষাদাতা। বারাণসীতে নির্মলশাহের সংগে এই তিন ভ্রাতা এক সঙ্গে সংগীত চর্চা করতেন। কাশী-নরেশের সভায় নির্মলশাহের বীণ এবং জাফর খাঁ-র রবাব বাজনার ব্যবস্থা ছিল কোন এক বর্ষাকালীন সভায়। নির্মলশাহের বীণ বাজনার পর জাফর খাঁ রবাব বাদনে ব্যর্থ হলেন। রবাবের চামড়ার ছাউনি মিইয়ে গিয়েছিল। এক মাস সময় নিলেন জাফর খাঁ। রবাবে কাঠের তবলী যোগ করে এবং ওপরে ধাতব পাত লাগিয়ে নতুন যন্ত্র তৈরি করে কাশী নরেশের সভায় বাজনা শুনিয়ে নির্মলশাহ্‌কে মুগ্ধ করেন। এ যন্ত্রটিই সুরশৃঙ্গার নামে প্রচলিত। সেই থেকে রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাজনা সমভাবে প্রচলিত হয়।

সরোদ—কাবুলে রবাবের ছোট সংস্করণ শারুদ নামে পরিচিত।

অনেকে বলেন সরোদ শারুদ ও রবাব থেকেই পরিমার্জিত যন্ত্র। পূর্বেই বলেছি নামের ইতিহাস বা সংগতি খুঁজে সংগীতের ক্ষেত্রে কোন যুক্তিসংগত তথ্য উপস্থাপিত করা যায় না। কাঠের কুঁদনো তিন ফুট বা সাড়ে তিনফুট লম্বা এই যন্ত্রটি পূর্বের আদি আকৃতি থেকে পরিবর্তিত হয়ে অনেকটা নতুনরূপে নানা ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়েছে। অর্ধ ডিম্বাকৃতি মোটা দিকটা চামড়ার ছাউনিতে ঢাকা। আধকাটা লম্বা সরু লাউ-এর মতো দাণ্ডির দিকটা ধাতব পাতে সুরশৃঙ্গারের অনুকরণে মোড়া। জাওয়া দিয়ে তারে আঘাত এবং আঙুলে ঘসিৎ রীতিতে বাজানো হয়। সরোদের আদি বাদক গোলাম আলি ও পুত্র হুসেন খাঁ ও মোবাদ আলি খাঁ গোয়ালিয়রে ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে আমীর খাঁ, করমতুল্লাহ্ খান এবং আসাদুল্লাহ্ খান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসাদুল্লাহ্ খান বাংলাদেশে এই যন্ত্রটি প্রচারিত করবার পর এখানেই সরোদ প্রথম যুগে তৈরি হত। এ শতকের প্রথমে সরোদের দুই দিকপাল ছিলেন ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ এবং অন্যদিকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। বর্তমানে সরোদ বিশিষ্ট প্রচলিত যন্ত্র, উত্তব ভারতীয় বাগসংগীতেব একটি প্রধান অবলম্বন।

সরোদের ব্যাপক প্রচার পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে হয়েছিল ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর দ্বারা, যখন তিনি উদয়শঙ্করেব সঙ্গে ঐ দেশ পরিভ্রমণ করে। কিন্তু পাশ্চাত্যে বর্তমান জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলি আকবরের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীণ, সবোদ, সুরশৃঙ্গার, সেতার ইত্যাদি প্রধান উত্তর ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রেব সঙ্গে জ্ঞাতব্য কয়েকজন বিশিষ্ট সংগীতসাধকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পূর্বেই তানসেনের পুত্রবংশের ছজু খাঁর পর ৮ম পর্যায়ে জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁর কথা উল্লেখ কবা হয়েছে। জাফর খাঁ সুরশৃঙ্গার-স্রষ্টা তা বলা হয়েছে। এর মধ্যে জাফর খাঁ ও প্যাব খাঁ পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন। বাসৎ খাঁ ছিলেন তাঁর পিতৃব্য জ্ঞান খাঁব দত্তকপুত্র। তিনি যোগসাধনা ও সংগীত দুই-ই শিখেছিলেন। এই তিনজন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের তিনটি বিশিষ্ট চরিত্র। তিন ভাই এক সঙ্গে বীণকাব নির্মলশাহের (সদারঙ্গের পর ৩য় পুরুষ) সঙ্গে বাস করেন এবং শিক্ষালাভ করেন। নির্মল শাহের শিক্ষা এই তিন ভ্রাতাকে শীর্ষে স্থাপন করেছিল। জাফর খাঁর কথা উল্লিখিত হয়েছে। এঁরা তিন ভাই রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই সঙ্গে

সমসাময়িকদের মধ্যে ওমরাও খাঁ (সদারঙ্গের পর ৪র্থ পুরুষ) ছিলেন বীণে: পারদর্শী। জাফর খাঁ রবাবের নৈষ্ঠিক সাধক ছিলেন। রেওয়ার অধিপতি বিশ্বনাথ সিংহকে তিনিই শিখিয়েছিলেন।

প্যার খাঁ—প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ সুমধুর সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। প্যার খা অধিকাংশ সময়ে সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। তিনি বেতিয়ার রাজা নন্দকিশোরের সভায় যেতেন। নন্দকিশোর কথক ব্রাহ্মণদের ধ্রুপদ শিক্ষা দিতেন। এই প্রসঙ্গে শিবনারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাজ নন্দকিশোর প্যার খাঁর শিষ্য। প্যার খাঁ শুধু গায়কই ছিলেন না, আশ্চর্য উদ্ভাবকও ছিলেন। লোকগীতির সুর থেকে তিলক-কামোদ রাগটি তিনি তৈরি করেন। এছাড়া, নানারূপ উল্লেখের মধ্য দিয়ে জানা যায় তিনি বেশ কয়েকজন শিষ্যকে সেতারও শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্যার খাঁ রবাব, সুরশৃঙ্গারের সঙ্গে ধ্রুপদ-হোরী শিক্ষাদান এবং সেতার শিক্ষাদান করে বিচিত্র শিষ্যগোষ্ঠী রেখে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্যার খা বিবাহ করেন নি, নিজ ভাগিনেয় বাহাদুর সেনকে সবশ্রেষ্ঠ শিষ্যে পরিণত করেছিলেন। বাহাদুর সেনের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল, কিন্তু রবাব, বীণা ও সুরশৃঙ্গারে তিনি ক্রিয়াসিদ্ধ বাদকরূপে অপূর্ব রঞ্জনী প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারতেন আর সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টিতে অতুলনীয় ছিলেন। বাহাদুর সেন রামপুর নবাবের গুরুরূপে রামপুরেই বাস করেন।

বাসৎ খাঁ—বাসৎ খাঁ বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং সেরা বাদক ছিলেন। সেনী-ঘরানার শিক্ষায় যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠসংগীত সংমিশ্রিত ছিল। জন্মেছিলেন ১৭৮৭ নাগাৎ। জ্ঞান খাঁর ছাত্ররূপে সংগীতশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, পার্শীভাষা এবং যোগ শিক্ষা পেয়েছিলেন। রবাবীরূপে বাসৎ খাঁ সেরা হয়েছিলেন, কিন্তু যৌবনেই তাঁর দক্ষিণহস্ত অকর্মণ্য হয়ে যায়। এরপর আমৃত্যু তিনি কণ্ঠসংগীতের ভাণ্ডারী। লক্ষ্মৌ থেকে মেটিয়াবুরুজে ওয়াজেদ আলি শা'র দরবারে আসেন। ওয়াজেদ আলি বাসৎ খাঁর গুণমুগ্ধ হন। এখানে থাকাকালে বহু শিষ্য তৈরি হয়। রাজা হরকুমার ঠাকুর রবাবে ও সেতারে, কাশিম আলিখাঁ (ভ্রাতুষ্পুত্র) রবাবে, নিয়ামতুল্লাহ্ খাঁ সরোদে (নিয়ামতুল্লাহ্‌র পুত্র কলকাতার কেরামতুল্লাহ্ ও কৌকভ খাঁ)। বাসৎ খাঁ কিছুকাল রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের শিক্ষা দেন। শেষ জীবন কাটে গয়ায় টিকারী রাজার আশ্রয়ে। সকল স্থানেই শিক্ষা দিয়েছিলেন মুক্ত ভাবে। একশত বছর বেঁচে ছিলেন।

বাসৎ খাঁর পুত্র আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিঞা) সংগীত প্রচারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত দুইই তিনি পৈতৃক সম্পদরূপে লাভ করেন। রবাব ও সুরশৃঙ্গার তাঁর যন্ত্র ছিল। কিন্তু সুকণ্ঠ ছিলেন, তাই গীতই বেশি শিক্ষা পেয়েছিলেন। নেপালে ছিলেন দীর্ঘকাল। মুক্ত হস্তে বিদ্যাদান করতেন ও শিষ্য-পরিবৃত থাকতেন। বিশিষ্ট কয়েকজন সঙ্গী—তাজ খাঁ ধ্রুপদী, রামসেবকজী খেয়ালী ও সেতারী, নিয়ামতুল্লাহ্ খাঁ সরোদী ও মোরাদ আলি খাঁ সরোদী। শেষ জীবনে বারাণসীতে চলে আসেন এবং এখানে বেশ কিছুকাল জীবিত থেকে অনেককে শিক্ষা দিয়েছিলেন ও সাহায্য করেন। প্রধান শিষ্য জলন্ধরের মীর সাহেব-সুরশৃঙ্গারের বিশিষ্ট শিল্পী। এঁরই শিষ্য নান্নে খাঁ এবং পাটনার নবাব সেতারী প্যারে নবাব খাঁ। আলি মহম্মদ খাঁর (বড়কু মিঞার) একজন প্রধান শিষ্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁর কাছ থেকে শৌরীন্দ্রমোহন সেতার এবং ধ্রুপদ ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। বড়কু মিঞার কাছ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলেন বিডন স্ট্রীটের ঘোষ বাড়ির তারাপ্রসাদ ঘোষও।

বাসৎ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলি খাঁ বিশিষ্ট রবাবী ছিলেন। কণ্ঠ-সংগীতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কাশীতেই গুণীদের মধ্যে থাকতেন। গিধৌর, রামপুর প্রভৃতি স্থানেও তাঁর অবস্থান ছিল। রামপুরের নবাব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট শিষ্য ছম্মন সাহেব। উজীর খাঁ সম্পর্কে দৌহিত্র। শেষ জীবনের বেশ কিছুকাল লক্ষ্ণৌতে কাটে। মহম্মদ আলি খাঁর কাছে থেকে শতাধিক ধ্রুপদ নিয়ে ঠাকুর নবাব আলির গ্রন্থ "মআরিফুন্নগমাৎ" লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে ভাতখণ্ডের লক্ষণ-সংগীত বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও মহম্মদ আলি খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ওয়াজীর (উজীর) খাঁ—তানসেনের কন্যাবংশীয় পিতা আমীর খাঁ এবং পুত্রবংশীয় মাতা জাফর খাঁর নাতনীর পুত্র। মহম্মদ আলি খাঁ এবং উজীর খাঁ প্রায় সমসাময়িক বলা চলে, সম্পর্কে মাতামহ-দৌহিত্র। উজীর খাঁর জন্ম আনুমানিক ১৮৬০, তখন পিতা আমীর খাঁ বাহাদুর সেনের সমসাময়িক রূপে রামপুর দরবারে ছিলেন। পিতার নিকট ধ্রুপদ ও বীণা শিক্ষা করেন এবং বাহাদুর সেনের কাছে ধ্রুপদ ও রবাব শিক্ষা করেন। যৌবনে সুরশৃঙ্গার, রবাব ও ধ্রুপদে তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। সুরের প্রকাশে কণ্ঠে ও যন্ত্রে তিনি অদ্বিতীয়। এরপর তিনি বিলসিতে ভ্রাতা হায়দর আলির অভিভাবকত্বে

ছিলেন। রামপুর ও বিলসিতে থাকা কালে সংগীতশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি, আরবী, ফার্সী ও কিছু ইংরেজি শিক্ষা করেন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল। বারাণসীতে মাতামহ সাদেক আলি ও নিসার আলির কাছেও সংগীত সম্পদ আহরণ করেন। রবাবী বংশীয় সমস্ত প্রকার সংগীত সম্পদই তাঁর আয়ত্ত হয়। কলকাতায় বেশ কিছুকাল ছিলেন (৭।৮ বছর), মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে যেতেন। আলি মহম্মদ খাঁর (বড়কু মিঞা) কাছেও মাঝে মাঝে যেতেন ও সংগ্রহ করতেন। কলকাতায় তাঁর অনেক শিষ্য ও ভক্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি রামপুরের নবাবের গুরু রূপে রামপুরে বাস করেন। তিনি বহু বিশিষ্ট শিষ্যদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন—সেতার, সুরবাহার, সরোদ, কণ্ঠসংগীত, বীণ ইত্যাদি। ১৯২৭-এ তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে সরোদে ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, বীণায় পুত্র প্যারে মিঞা ও দবীর খাঁ, কণ্ঠে সগীর খাঁ, তাছাড়া সেতারে ও সুরবাহারে নাসির আলি প্রভৃতি।

সারেঙ্গী তন্ত্রীযুক্ত যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত 'সারেঙ্গী' রবাবীদের মধ্যে ও বিশিষ্ট গায়কদের সমাজে পরোক্ষে প্রচলিত ছিল বলে বিশ্বাস করি। কারণ বর্তমানের পরিচিত অধিকাংশ বিশিষ্ট ঘরাণার গায়ক ভাল সারেঙ্গী বাজাতে জানতেন এমন উদাহরণ নানা স্থানেই মিলে। রবাবীয়ারা উদ্ভাবনী শক্তিতে প্রতিভাবানও ছিলেন, গানের চর্চার সংগে ছড়িতে তারযন্ত্র বাজানোর পন্থা তাঁদের জানা ছিল। সারেঙ্গী সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিতে আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—লোকসংগীতে নানারূপ ছড়িযন্ত্রের ব্যবহার। সে অনুসারে প্রতি অঞ্চলেই কোন না কোনও লৌকিক ছড়ি-যন্ত্র আছে। আমরা জানি প্রাচীন কালে সকল প্রকার তত যন্ত্রই বীণা নামে অভিহিত হত; প্রাচীন রাবণাস্ত্রম্ ও ধনুর্যন্ত্র নিয়ে বহু ব্যাখ্যা নানাস্থানেই হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে সারেঙ্গী নিয়ে তেমন তথ্য মিলে না। সংগীত-ব্যবসায়ী সাধারণ নৃত্যশীলা রমণী গায়িকার সঙ্গে ছড়িযন্ত্র বাদন প্রাচীন ব্যবসা বলেই ধরা যায়। ছোট বড় বহু রকমের সারেঙ্গীও চারদিকে ছড়ানো আছে। তাই, মনে হয়, সাধারণ ব্যবহৃত যন্ত্রকে পরিশোধিত করে সারেঙ্গীতে পরিণত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংগীতকুশলীদের উদ্ভাবন-পন্থা প্রযুক্ত হয়েছে। সারেঙ্গী বাদনে বিগত যুগের পরিচিতদের মধ্যে

বাদল খাঁ, মেহেন্দীহোসেন খাঁ এবং বুন্দু খাঁর কথা বিশেষ ভাবেই প্রচারিত। এরা প্রত্যেকে বিশিষ্ট ঘরাণা গানেরও অধিকারী। যন্ত্রটির বাজাবার কায়দায় জটিলতা যা আছে তাতে এটি পুরুষদের পক্ষেই বাজানো সম্ভব। আঙুলের নখে তন্ত্রী ঘসে বাজানোর কায়দা, যন্ত্রটির ওজন ইত্যাদি মেয়েদের ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করা হয়। অথচ উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে মীড় ও তানের সহযোগিতায় এ যন্ত্রটি বিশিষ্ট, এক্ষেত্রে কর্ণাটক সংগীতে ব্যবহৃত হয় বেহালা। কেহ কেহ বলেন সারেঙ্গীব জটিলতার জন্যেই এসরাজের সৃষ্টি হয়েছে।

এসরাজ—উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার বিশেষ প্রিয় ছড়ির যন্ত্র ছিল 'এসরাজ'। বিশেষ করে সে যুগেব বিষ্ণুপুরের সংগীত-শিল্পিগণ এ যন্ত্রটিকে জনপ্রিয় কবে তোলেন। কাব্যসংগীতের সংগেও বাজাবার প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় এসরাজ। বিভিন্ন কলাবন্তগণ এই ছড়ি-যন্ত্রটিকে একক সংগীতের উপযুক্ত করে তোলেন বাজনাব বিশিষ্ট ঢং সৃষ্টি দ্বারা। উত্তর ভারতে এই সময়ে বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থানে নানা বীতি প্রবর্তিত হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীব গ্রন্থ 'আশুবঞ্জনী তত্ত্ব' এই যন্ত্র সম্বন্ধে উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট গ্রন্থ। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এসকার তরঙ্গ' আব একটি বিশিষ্ট সংযোজন। 'এসব'ং' শব্দটিই নাকি যন্ত্রটির আদি নাম।

এসবাজের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচাবিত। কেউ বলেন ঔরঙ্গজেবেব উদ্ভাবন—প্রথম বয়সের কীর্তি। অথচ, ফকিরুল্লাহ্ তাঁব সম্রাটের কীর্তি সম্বন্ধে নির্বাক। যন্ত্রটিকে উনবিংশ শতকেব পূবেব উদ্ভাবন রূপে প্রমাণ কববাব কোন পথ নেহ। কথিত আছে নবীবক্স সারেঙ্গীয়া যন্ত্রটি সৃষ্টি কবেন। অন্যদিকে কিংবদন্তী—পাঞ্জাবেব ঈশ্ববীপ্রসাদের শিষ্যবর্গ এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। অন্যমতে ভারতেব বাইরে থেকে এ যন্ত্র আমদানী করা হয়েছে। কিংবদন্তীগুলোব পেছনে কোন যুক্তিসংগত তথ্য নেই। মোটামুটি দৃশ্যত এটাই স্পষ্ট যে সেতার ও সারেঙ্গীর মিশ্রণেই এই যন্ত্রটি উৎপন্ন হয়েছে। তুম্বার প্রকৃতি ধীবে ধীরে বিকশিত। তুম্বা বা হাঁড়িব আকৃতি ভেদে উত্তব ভারতে যন্ত্রটি দিলরুবা নামে পরিচিত।

এসবাজবাদকদের মধ্যে গয়ার হনুমানদাসজী, কানাইলাল ঢেঁড়ী এবং চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবে সুপ্রসিদ্ধ। কলকাতায় উজীর খাঁ এসরাজে কিছু তালিম দিয়েছিলেন। শীতল মুখোপাধ্যায় গয়া ও রামপুরের সংমিশ্রিত ঢংএ

বাজাতেন। ইমদাদ খান সেতারের সংগে এসরাজ-বাদনেরও বিশিষ্ট ঢং-এর প্রবর্তন করেন। মৈমনসিংহের গৌরীপুরে রায়চৌধুরী পরিবারে গোড়ায় এসরাজ-বাদনের কেন্দ্র ছিল। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সংগীতের গোড়া-পত্তন এসরাজে। এসরাজবাদকরূপে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী গৌরীপুরের সংগে যুক্ত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠিত এসরাজ বাদনের কায়দায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের সহায়তায় রবীন্দ্রসংগীতে সংগীত-সহযোগিতায় এসরাজ প্রধান যন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়।

ঘন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র effect বা পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টির প্রধান সহায়ক। বিশেষ ধরণের সংগীতে নির্দিষ্ট যন্ত্রই এভাবে ব্যবহৃত হয়। একক যন্ত্ররূপে এর ব্যবহার নেই। **জলতরঙ্গ, কাষ্ঠ-তরঙ্গ** ইত্যাদি যন্ত্র অবশ্য সংমিশ্রিত ধরণের স্বর-যন্ত্ররূপে বর্ণনা করা চলে।

বাঁশী—সুষীর বা যা হাওয়ায় বা ফুৎকারে বাজে এমন যন্ত্রের মধ্যে বাঁশীকে তাত্ত্বিকেরা নানাভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন (পৃঃ ১৮০)। ভেঁপু, মুরলী, শিঙ্গা, শঙ্খ, প্রভৃতি বাদ দিলে বিশিষ্ট শ্রেণীর বেণু কিংবা বাঁশী সাধারণ লোক-সংগীতে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হত, কিন্তু উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন শাস্ত্রে বাঁশী বাদনের নানা আঙ্গিক ব্যাখ্যা করা হলেও, বাঁশী সাম্প্রতিক কালেই রাগসংগীতে প্রচলিত হয়েছে। বর্তমান যুগে এই প্রচলনের মূলে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী পান্নালাল ঘোষ।

শানাই—শানাই বা শাহ্+নাই (পারসিক বড়ো+বাঁশী) পারস্য দেশ থেকেই মুসলমান যুগে আমদানী করা হয়। আকবরের যুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগে শূর্ণা এবং শাহনাই বাদকের নানা উল্লেখ আছে। বাদশাহদের নহবতখানার জন্যেই শাহনাই বাদনের নানা প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালেও বিশিষ্ট বাদকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। রাগসংগীতের অভিব্যক্তির যন্ত্ররূপেই শানাই জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু বহু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে শানাই বাদনের প্রথা তেমন ভাবে প্রচারিত হয়নি।

এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উনবিংশ শতকের বাংলায় একটি বিশিষ্ট যন্ত্রবাদনের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। যন্ত্রটি **ন্যাস-তরঙ্গ**। ধাতুর তৈরি দুটো সমপ্রকৃতির (বাঁশীর অনুরূপ) ছিদ্রহীন যন্ত্রের সরু মুখ ঝিল্লিযুক্ত; গলার দুপাশে লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার দ্বারা ভেতরের

সংগীতকে (ধ্বনি-তরঙ্গকে) স্পর্শযোগে প্রকাশ করা হয়। দৃশ্যত ব্যাপারটি অদ্ভুত মনে হয়, কারণ এখানে দম প্রয়োগ বা ফুৎকারের প্রশ্ন নেই। কণ্ঠসংগীত ভেতরে সুন্দর ও প্রবল ভাবে শ্বাসের মধ্যে অনুরণিত হলেই স্পর্শযোগে ঝিল্লির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি হয়েছিল প্রিন্স অব ওয়েলসের সম্বর্ধনা সভায় উনবিংশ শতকে—এই ন্যাসতরঙ্গ বাদনের জন্যে। মুখ বন্ধ করে শুধুমাত্র শ্বাসযন্ত্রের মধ্যকার সংগীত-ক্রিয়ার অভূতপূর্ব প্রকাশ দেখে বহু দেশের উপস্থিত শ্রোতাগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কৃতী শিষ্য ছিলেন তিনি; দণ্ড-মাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তনের সমর্থকও ছিলেন তিনি। ক্ষেত্রমোহনের রচিত অরকেষ্ট্রা বাদনে তিনি বিশেষ সহযোগিতা করেন। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারে সুদক্ষ ছিলেন, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিভিন্ন আসরে দ্বৈত-সেতার বাদনে অবতীর্ণ হন। পাশ্চাত্য সংগীত-রসিকদের কাছে ভারতীয় সংগীত পরিবেশনে তিনি শৌরীন্দ্রমোহনের সমকক্ষ ছিলেন। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে তিনিও কৃতিত্ব অর্জন করেন। সে যুগে ভারতীয় সংগীত প্রচারে কালীপ্রসন্নের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাখওয়াজ ও তবলা—তালবাদ্য সংগীতের বিশিষ্ট বিভাগ। লয় ও তালের সংযোগেই সংগীতের পরিপূর্ণতা। তাল পদ্ধতির বহু বিস্তার ও বহু প্রকৃতি প্রাচীন কাল থেকে বিশেষ ভাবে আলোচিত। রাগ-সংগীতে ব্যবহৃত বর্তমানের পাখবাজ, মৃদঙ্গম, ঘটম, তবলা-বাঁয়া, খোল এবং ঢোলক ইত্যাদিই উল্লেখযোগ্য। কীর্তন প্রসঙ্গে খোলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর ভারতে তানসেনের যুগ থেকে মোগল যুগের সংগীত তাত্ত্বিকেরা সেরা পাখব্লাজ বাদক সম্বন্ধে নানা উল্লেখ করেছেন। তানসেনের সঙ্গে পাখবাজ বাজাতেন সুরদাস। অন্যান্য পরবর্তী বাদকদের উল্লিখিত নাম ফিরোজ খাঁ ঢাড়ী, আমানুল্লাহ্ ইত্যাদি। কিন্তু তবলাবাদক সম্বন্ধে উনবিংশ শতকের পূর্বের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। 'তবল' আরবী শব্দ, আচ্ছাদন অর্থে ব্যবহৃত। সেতার এবং তানপুরার হাঁড়ির ওপর কাঠের আচ্ছাদনকেও কথায় কথায় তবলী বলা হয়। অর্থাৎ, তবলা শব্দ নিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানে সুফল ফলে না। তবলা ঘরাণা সম্বন্ধে বলা যায় যে পাঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, ফরক্কাবাদ ও গয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানান বাজ

বা বাজনায় কায়দা উত্তর ভারতের চারদিকেই প্রচারিত।

তালযন্ত্রে যে ধ্বনি-সমষ্টির দ্বারা 'তাল' বাজানো হয় তাকে "বাণী" বা "ঠেকা" বলে। গান বা গতের সঙ্গে মোটামুটি একই নামের তালে একই প্রকৃতির "ঠেকা" বাজে। "সম" হচ্ছে ঠেকার নির্দেশিকা বা বিশেষ মিলন মুহূর্ত। তালের ভাগে এই সমের বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। ভারতীয় সংগীতে শুধু তবলা নয় সমস্ত প্রকার তাল যন্ত্রেই "সম" বিশিষ্ট লক্ষ্য। তালের ভাগ এবং অঙ্গগুলো তবলায় নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, প্রীতি-উৎপাদক অথবা জটিল এবং বিস্ময়কর সময় বিভাগের অলঙ্কারে ভূষিত হয়। লয়ের ও মাত্রার বিভাগে ও লুকোচুরিতে নানা বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। বাদনরীতির খণ্ড খণ্ড রূপ ও বিভাগগুলো নানা নামে অভিহিত—কায়দা, টুকরা, পেশকার, পরণ, গৎ, মোহড়া, তেহাই, রেলা ইত্যাদি।

বর্তমানে তবলাবাদন বিকাশের বিশেষ একটি ক্ষেত্র কলকাতা। এখানে তবলাবাদন প্রচারে নাথু খাঁ, আবিদ হোসেন, মসিদ খাঁ প্রভৃতির নাম শিষ্যবৃন্দের মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে আছে। তবলার সেরা বাদক অতিবৃদ্ধ আহমেদজান থিরাকাওয়া এখনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

আমরা জানি শাস্ত্রীয় সংগীতে 'সম' বা বিশিষ্ট 'আঘাত/জোর' কেন্দ্র করেই সকল রকমের তালবাদন বিকশিত হয়েছে। আধুনিক গানের তালে এই বাঁধাবাঁধি নেই। কখনো লোকগীতির মতো তাল isometric বা মাত্রায় মাত্রায় আঘাত-সূচক হতে পারে, রবীন্দ্র-সংগীতের মতো ছন্দোজ্ঞাপক হতে পারে এবং সাধারণ ভাবেও তাল অনিয়মিত ভাবে বাজানো চলতে পারে।

বর্তমান কাব্যসংগীত ও আধুনিক গানে তালযন্ত্রের ব্যবহার চিরাচরিত রাগসংগীত থেকে স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত। রাগসংগীতের তালের বিচিত্র কারিগরি, লয়ের ও তালের জটিলতা ও সৌন্দর্য লঘু-সংগীতে কদাচিৎ প্রয়োগ করা হয়। একদিকে সংগীত-সম্মেলনগুলোতে তালযন্ত্রের একক বাদনের জনপ্রিয়তা যেমন লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে আধুনিক রীতিতে তালযন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক যন্ত্র মাত্র। আধুনিক সংগীতে তালবাদ্যে সহযোগিতার বৈশিষ্ট্যই প্রধান। কিন্তু রাগসংগীতে তালবাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত।

পরিশিষ্ট

সংগীতে রস

সংগীতজ্ঞের কাজ এবং লক্ষ্য রস-সৃষ্টি বা সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং শ্রোতার লক্ষ্য রসগ্রহণ। পাশ্চাত্যে এই শাস্ত্র 'ইসথেটিক্স' বা নন্দনতত্ত্ব (সৌন্দর্যতত্ত্ব), ভারতীয় সংগীতের এই দিকটিই রসশাস্ত্র। রস আর আর্ট একই অর্থবোধক। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য সংগীতকলা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র। বিভিন্ন দেশের সংগীত প্রকৃতি শ্রোতার মনে যে আনন্দ, সুখ ও নানা ভাবের সৃষ্টি করে তার রসগ্রহণ নির্ভর করে সেই বিশেষ দেশেরই সংগীতের অভিজ্ঞতার ওপর। কারণ এক দেশের সংগীত অন্য দেশের শ্রোতার কানে সংগীত না-ও মনে হতে পারে। অথচ, এক দেশের চিত্রকলা বা কবিতা অন্যদেশের লোকের কাছে সহজেই সুগম হতে পারে। সংগীত তা হয় না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে অভিনয়, নৃত্য ও সংগীত প্রভৃতির আলোচনা একসঙ্গে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ভবতেরও পূর্বে ব্রহ্মা ভরতের সময় থেকেই নাট্য ও সংগীত সৃষ্টির মূলে বিভিন্ন কলা একই অনুসন্ধানেব বিষয়—রস, অভিনয়, ধর্মী (অভ্যাস), বৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাদ্যযন্ত্রাদি, গীত, রঙ্গ প্রভৃতি তেরোটি উপাদান। ভরতের মতে রস আটটি। কাব্যমালা সংস্করণে নবরসের উল্লেখ আছে। ভরতের পরবর্তী কালেই শান্ত রসকে যোগ করে নবরসের ব্যাখ্যা হয়েছে। টীকাকার অভিনবগুপ্তের সমর্থন অনুসারে ভরতের উল্লেখে প্রথমে আটটি রসই গ্রহণ করা যায়:

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ রসা স্মৃতাঃ॥

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত প্রভৃতি আটটি রস স্থায়ী ভাবের ওপর নির্ভরশীল।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ংতথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা॥

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এই আটটি মূল শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসের স্থায়ী ভাব বা সঞ্চারীভাব। স্থায়ী ভাব ছাড়া আর

আছে ব্যভিচারী ভাব এবং অন্যদিকে আছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার। ব্যভিচারী ভাবগুলো সংখ্যায় ৩৩টি: নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার প্রভৃতি। সাত্ত্বিক ভাব আটটি: স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু বা কম্পন, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয়।

রস ও ভাব এই দুই অন্তঃকরণের বৃত্তি। স্বর ও রাগ অন্তঃকরণের ইচ্ছা বা বৃত্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভরতের মতানুসারে রস ছাড়া সংগীতকলার কোন সার্থকতা নেই। সে অনুসারে সংগীতের অভিব্যক্তি বিভাব অনুভাব এবং অভিচারী ভাব-এর মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা দরকার। রসের মূলে আছে আস্বাদন ক্রিয়া। স্থায়ী ভাব এই ক্রিয়ার সহায়ক। ভারতীয় সংগীতের স্বর ও রাগ ধ্বনির মধ্য দিয়ে আবেগানুভূতির সৃষ্টি করে। এমন কি স্বরেরও রস আছে। ভরতমুনি বলেছেন, মধ্যম ও পঞ্চমের রস হাস্য এবং শৃঙ্গার; ষড়জের ঋষভের রস—বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস; গান্ধার ও নিষাদের রস করুণ এবং ধৈবতের রস বীভৎস। অর্থাৎ স্বরগুলোর অভিব্যক্তিতেও রসের সন্ধান মিলে। রসের সংগে অলংকারের কথা আসে। অলঙ্কারগুলো কাকুর সংগে ব্যবহৃত। কাকু অর্থে ধ্বনি-বৈচিত্র্য। শার্ঙ্গদেবের মতে কাকু অর্থে কোমলতা, সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন আবেগ। বিভিন্ন রকমের কাকু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তরের ভাবানুভূতির সন্ধান দেয়। মোটামুটি স্বর, অলঙ্কার, গমক, স্থায় বা স্বরের অঙ্গগুলো সব সুসংগত সম্মিলনে রসসৃষ্টিতে সংগীতকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে পৌঁছে দেয়। এজন্যে রসের বহু বিশ্লেষণ এবং বহু ব্যাখ্যা আছে। রসতত্ত্ব বহু বিস্তৃত। একদিকে সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন অলঙ্কার শাস্ত্র তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে রস শাস্ত্রের প্রকাশ আর একটি স্বতন্ত্র দিক।

আজকাল সংগীত-কলা বিচারের পদ্ধতি নানা ভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এই সংগে সংগীতের রূপ ও অন্যান্য গুণের বহু রকমের ব্যাখ্যাও হয়ে থাকে। শিল্পীর কলানৈপুণ্যের অধিকার ও কলাসৃষ্টির দিক এবং শ্রোতার মনের ওপর প্রভাব, সংগীতের বিশিষ্ট সত্তা ও তা অনুভব করবার পদ্ধতি নিয়ে আজকের অনুসন্ধান প্রাচীন রসশাস্ত্র থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। শাস্ত্রীয় সংগীত আজ আর শুধু নির্বিশেষের উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় নয়, অথবা ছকে বাঁধা বিষয়ও নয়, বিশেষ বিশেষ

ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রকাশ। আজকাল রসতত্ত্ব ও পশ্চিমী ইস্‌থেটিকস্‌—এই দুয়ের সম্মিলিত তত্ত্বের দ্বারা সংগীত কলার মূল্যায়ন চলে জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে লক্ষ্য রেখে।

॥ কয়েকটি শব্দ ও সংজ্ঞা ॥

রাগ—যে স্বর পাঁচ, ছয় বা সাত অথবা আবো বেশি সংখ্যক স্বর-সমষ্টি আরোহী-অবরোহী পদ্ধতিক্রমে বাদী, সমবাদী, প্রধান অংশ, অলঙ্কার ও রীতি অবলম্বন ক'রে লক্ষণ অনুসারে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে রঞ্জকত্ব গুণ ও বস সৃষ্টি করে তাকে **রাগ** বলা হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাগ বর্ণনায় বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত (ন্যূনপক্ষে দশটি) বঞ্জকত্ব প্রকাশক স্বরই রাগ। শ্রেণী বিভাগে জাতিরাগ, গ্রামরাগ প্রাচীন মার্গ সংগীতের অন্তর্গত। পরবর্তী রাগেব নানাশ্রেণী—দেশী, ভাষা, বিভাষা ইত্যাদি (১ম-৩য় পরিচ্ছেদ—ব্রহ্মামত, শিবমত, হনুমন্ত মত) (নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধ-ছায়ালগ-সঙ্কীর্ণ জাতীয় রাগ সম্বন্ধে টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন, শুদ্ধ বা শুদ্ধরাগ শাস্ত্র বর্ণিত বিধি নিষেধ অতিক্রম না করে স্বভাবত শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করে। স্বকীয় রূপ প্রকাশের মতো গুণ না থাকাব জন্যে অন্য রাগের সাহায্যে যে রাগ অভিব্যক্ত হয় তাকে ছায়ালগ বলা যায়। আব শুদ্ধ এবং ছায়ালগ সংমিশ্রণে যে রাগ প্রকাশ পায় তাই সঙ্কীর্ণ "তত্র শুদ্ধ-বাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্তনিয়মানতিক্রমেন স্বতো রক্তি হেতুত্বম্‌। ছায়ালগ-রাগত্বং নামান্যচ্ছায়ালগত্বেন রক্তিহেতুত্বম্‌। সংকীর্ণ-রাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছায়া-লগমিশ্রত্বেন রক্তিহেতুত্বম্‌।' (পৃঃ ৩৬, ৩৭)

জনক, আশ্রয়, জন্য রাগ (পৃঃ ৪৫, ৫৬)—যে রাগের নামে মেল বা ঠাটের নামকরণ করা হয় (শুদ্ধ রাগ), যা থেকে অন্য রাগ উদ্ভূত তাই জনক। আশ্রয় শব্দটি পববর্তীকালের জনক রাগের সমার্থক। একই নামে একই ঠাটে রাগ আশ্রিত অর্থে ব্যবহৃত। জন্য অর্থে বিশিষ্ট জনকের জাতক বা উদ্ভূত রাগ। [মেল বিশ্লেষণ সম্পর্কে জনক-জন্য বিশেষ ব্যবহৃত।]

রাগ লক্ষণ :

গ্রহ—প্রারম্ভিক স্বর ; **অংশ :** স্বর সমন্বয়ের বেশি ব্যবহৃত খণ্ড ; **ন্যাস :** যে স্বরে পরিসমাপ্তি ; **অপন্যাস :** শেষাংশ বা প্রথমাংশের শেষ, **বিন্যাস :**

অলঙ্কৃত প্রারম্ভের শেষাংশ ; **অল্পত্ব** : সামান্য ব্যবহৃত স্বর ; **বহুত্ব** : বহু ব্যবহৃত স্বর ; **মন্দ্র** : উদারার অংশ ; **তার** : চড়া স্বর বা তৃতীয় গ্রামের স্বর ; **ঔড়বত্ব** : পঞ্চ স্বরের রাগ (ওড়ব জাতীয় রাগে পঞ্চম ও মধ্যমের অন্তত একটি স্বর থাকবে এবং উত্তরাঙ্গ ও পূর্বাঙ্গের অন্তত একটি স্বর)।

বর্তমান বর্ণনায় বেশি ব্যবহৃত : **আরোহী-অবরোহী** : উত্থানে ও পতনে অনুলোম-বিলোমে স্বরের গতির বিশিষ্ট নিয়ম ; **বাদী** : প্রধান স্বর ; **সংবাদী** : সাহায্যকারী প্রধান স্বর ; **অনুবাদী** : বাদী-সংবাদী-বিবাদী ব্যতীত অন্য স্বর ; **বিবাদী** : অব্যবহার্য স্বর ; **বক্রস্বর** : সহজ আরোহী-অবরোহী পর্যায়ে প্রযুক্ত নয় যে স্বর—বাঁকা ভাবে প্রয়োগ করা স্বর ; **পকড়** : স্বর বিন্যাসের প্রধান অঙ্গ বা অংশ ; **পূর্বাঙ্গপ্রধান—স** থেকে **ম** পর্যন্ত স্বরের প্রাধান্য যে রাগে ; **উত্তরাঙ্গপ্রধান—প** থেকে **র্স** পর্যন্ত স্বরের প্রাধান্য যে রাগে।

সন্ধিপ্রকাশ রাগ : দিন ও রাত্রির সন্ধিভাব প্রকাশক রাগ। এটি বিশিষ্ট ভাতখণ্ডে মত। ভৈঁরো, পূর্বী, মারবা ঠাটের রাগ যাতে **ঋ**, **গ**, **ন** স্বর ব্যবহৃত হয়।

অলঙ্কার ও অন্যান্য :

বর্ণ : বিশিষ্ট রঞ্জকত্ব গুণ, আরোহী-অবরোহী প্রকৃতি, রাগ বিকাশের অঙ্গ, বিশিষ্ট তান-অলঙ্কার ইত্যাদি। বর্ণ শব্দের অর্থান্তর হয়েছে, ভরতের মতে ৪টি বর্ণ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত। অর্থ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নয়। প্রাচীন মতানুসারে স্বরের রচনাকে **বর্ণ অলঙ্কার** বলা হয়। বর্ণ অলঙ্কার প্রায় ৬৩টি। যথা—প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত…নিষ্কর্ষ, বিস্তীর্ণা বিন্দু, রেণী, মন্দ্রাদি, মন্দ্রমধ্য, মন্দ্রান্ত, প্রস্তার, প্রসাদ…উদ্বাহিত, ঊর্মি….ললিত স্বর, হুঙ্কার…. হ্লাদমান, অবলোকিত…ইত্যাদি। বর্তমানে ব্যবহৃত শব্দমালা **তান** : স্বরের ওপর গতিসূচক ধীর অথবা দ্রুত সঞ্চরণ ; **সপাট তান** : সহজ উত্থান পতনে শুদ্ধ প্রকৃতির তান ; **মিশ্রতান** : **কূটতান**, **জমজমা তান** (পৃঃ ১৫), **বক্রতান**, **ছুটতান**, **বোলতান**, **গমকতান**। বক্র শব্দটি তান রাগ ইত্যাদিতে নানা-ভাবে ব্যবহৃত।

গমক : শব্দটি প্রাচীন, ব্যবহারে প্রায় সর্বরূপ ব্যবহার্য অলঙ্কার ও তান বোঝায়। এই অর্থেই মোটামুটি কর্ণাটক সংগীতে প্রচলিত। হিন্দুস্থানী সংগীতে গমক বলতে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে দম-প্রযুক্ত উৎক্ষেপণ, কম্পন,

আন্দোলন বোঝায়। ধ্রুপদেই গমকের ব্যবহার। খেয়ালে গমকের ব্যবহার সামান্য—তানের ও সারগমের সঙ্গেও বিশেষ কায়দায় গমক প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ইংরেজিতে grace অর্থেও গমককে বিশ্লেষণ করা হয়। শাস্ত্রীয় মতে তিরিপ (হিল্লোলিত গমক), স্ফুরিত (গিটকারী), কম্পিত (খটকা), লীন (কন্), বলী (মীড়), কুরুল (ঘসিত) ইত্যাদি। গমক-গুলোকে মধ্যযুগে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন: চ্যবিত, কম্পিত, প্রত্যাহত, দ্বিরাহত, স্ফুরিত, অনাহত, শান্ত, তিরিপ, ঘর্ষণ, অবঘর্ষণ, বিকর্ষণ, স্বস্থান, অগ্রাবস্থান, কর্কবী, পুনঃ স্বস্থান, স্ফুট, নৈম্ন, সুঢালু, গুম্ফিত, মুদ্রা। আমরা জানি খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদে বিশিষ্ট অলঙ্কার রূপে গমক ব্যবহার করা হয়। সেনী ঘরণায় সর্বদা ব্যবহৃত গমকগুলোর নাম: লুম্পিত, খাদৎ, গণপৎ, আহত, অন্দাহত, আন্দোলিত, প্রহৃত, ক্রবাহত, দূবাহত, অথবৎ, তিরপ, খরেশন, ওখবেশন, নিসুথন, ওখবসুথান, কর্তবী, সুৎ, নিমনি, ধান, সুহান, মদবা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সকল গমক-অলঙ্কাব প্রত্যক্ষ উদাহরণ ছাড়া বোঝা যায় না।

মূর্ছনা: অর্থ পবিবর্তিত হয়েছে। (পৃঃ ৪, ২৪, ৬, ৪৪, ৭৬-৭৭, ৮৭)।

কতকগুলো ব্যবহৃত শব্দ—**বন্দেশ, বন্দিশ:** গান বা গতের বিশেষ লক্ষণযুক্ত বচনা। স্বর রচনাব বন্দেশ ও প্রচলিত আছে। যথা, বাহাদুরসেন রচিত তাবানা ও সাবগম, সদারঙ্গ-বচিত খেয়াল, মসিদখাঁ-রচিত গতেব ঢং।

বাজ: যন্ত্র-সংগীতেব সংগে সংশ্লিষ্ট শব্দ। খেয়ালীবাজ, ঠুমরীবাজ, পূর্বীবাজ।

বাট: তালেব ভাগ বা মাত্রার ভাগ। মাত্রাব ভাগগুলোতে সুরেব চবণ বা কথাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি রূপে ছন্দোবদ্ধ করে দেওয়া।

স্থায়ী: প্রথমাংশ (গানের বা রাগের পরিবেশনে), কর্ণাটক সংগীতের **পল্লবীর** অনুরূপ। দ্বিতীয় অংশ (গানের দ্বিতীয় তুক) **অন্তরা,** কর্ণাটক সংগীতে **অনুপল্লবী।** তৃতীয় অংশ—**সঞ্চারী** কর্ণাটক সংগীতে **চরণম্।** রাগালাপের অংশগুলোকেও **স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ** রূপে ধ্রুপদ গানেব কায়দায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে। (পৃঃ ৫১, ৭০, ১৩৯)

যন্ত্র-সংগীতে আলাপের বিভিন্ন স্তর: **আওচার** (নিয়মবিহীন চারণা), **বন্ধান, কয়েদ, বিস্তার** ইত্যাদি। নিয়ম মাফিক ১৩টি **অঙ্গ:** (১) বিলম্বিত (২) মধ্য (৩) দ্রুত (৪) ঝালা (৫) ঠোক (৬) লড়ি (৭) লড়গুথাও (৮) লড়লাপট

(৯) পরণ (১০) সাথ (১১) ধুয়া (১২) মাঠা (১৩) পরমাঠা। বর্তমান যন্ত্র-সংগীতে যে রূপ প্রচলিত তাকে বলে আলাপ (আওচার), জোড় (গমকী দ্বিস্বরের নানা সমন্বয়), ঝালা।

কণ্: স্পর্শ-স্বর, স্বরে সামান্য ছোঁয়া অন্য স্বর। **পুকার**: এক স্বর থেকে মীড় বা আঁশ বা রেশ সহযোগে বা ব্যঞ্জনা-দ্বারা দূরবর্তী আর একটি স্বরে সুর স্থাপিত করবার কায়দা।

যন্ত্রের অলঙ্কারে **জমজমা**, **কৃন্তন**, **মুড়কী**, **ঝটকা**, **খটকা** প্রায় একই ধরণের একস্বর কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্বরের নানারূপ স্পর্শন-অলঙ্কার। কণ্ঠেও মুড়কী, ঝটকা, খটকার বহুরূপ ব্যবহার আছে। **বোল** শব্দটির বহু ব্যবহার প্রচলিত, বিভিন্ন অর্থবোধক। **বাণী**: বিশিষ্ট ধরণের রচনা, কথার সংগে তানের সংমিশ্রণ, পাখবাজ-তবলা ইত্যাদির বাদন-ধ্বনি রূপ, গানের শব্দ-সমষ্টি, চরণ, তুক ইত্যাদি এবং ধ্রুপদের ভঙ্গি অর্থে (পৃঃ ৭২)। **তুক** শব্দটি ইংরেজি stanza অর্থে সরল ভাবে ব্যবহৃত। **তুক্** শব্দটি ঢপ-কীর্তনে পাঁচালী ধরণের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ব্যবহৃত।

রাগের সময় ও কালবিভাগ

রাত বারোটা থেকে দিন বারোটা পর্যন্ত সময়কে **উত্তরার্ধ** এবং দিন বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সময়কে **পূর্বার্ধ** ধরে নিয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রাগগুলোর মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত ভাবে কাল বিভাগ করেছেন: উত্তরাঙ্গ-বাদী সমন্বিত রাগের কাল উত্তরার্ধে অর্থাৎ রাত বারোটা থেকে দিন বারোটা পর্যন্ত এবং পূর্বাঙ্গ-বাদী সমন্বিত রাগের কাল পূর্বার্ধে অর্থাৎ বেলা বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। এই সূত্রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রাগের ব্যবহারের সংস্কার লক্ষ্য করে সারং রাগের সময় মধ্য দিনেই নির্দেশ করেছেন। এই নিয়ম শৃঙ্খলায় বিলাবল, কাফী, টোড়ী প্রভৃতি জাতীয় রাগগুলোকে মধ্যদিনে ব্যবহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

রাগের সময় নির্দেশে বহু ব্যতিক্রম আছে। বাস্তব দৃষ্টিতে এই ধরণের বিভাগে কতকটা সহজ রীতি প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু রাগ ব্যবহার, শ্রুতি, কোমল স্বরের ব্যবহার, বক্র স্বরের ব্যবহার এবং প্রচলিত পদ্ধতি ও নিয়ম প্রভৃতিতে কিছু তারতম্য সকলেই স্বীকার করেন। সে অনুসারে ভাতখণ্ডে

মতের তীব্র সমালোচনাও হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে রাগের কাল ব্যবস্থার নিয়ম দৃঢ়ভাবে মেনে চলা হয় না। ভাতখণ্ডের দৃষ্টি বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে থিওরির সামঞ্জস্য সাধন।

কর্ণাটক সংগীতে কাল ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলা হয় না। রাগ সংমিশ্রণে বাস্তব ক্ষেত্রে কাল নির্দেশ প্রযুক্ত হতে পারে না। যদিও তত্ত্বের দিক থেকে এই মতের বিপক্ষে বহু বৈচিত্র সন্ধানের সুযোগ আছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সহজ মতটি প্রাচীন জটিলতাকে সুশৃঙ্খল করবার চেষ্টা মাত্র। অর্থাৎ, ভাতখণ্ডের থিওরি মেনেই যে রাগ গান করা হবে এমন কথা বলার চেয়ে বলা উচিত যে এই রীতির প্রচলন অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাস্তবতাকে বীক্ষণ করেই ভাতখণ্ডের থিওরি দাঁড়িয়েছে।

ধ্রুপদ : প্রাচীন ধ্রুব প্রবন্ধ থেকে উদ্ভূত, মধ্যযুগে পরিমার্জিত, চার তুকে (স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ) রচিত যে গান পাখবাজের সংগে নির্দিষ্ট শ্রেণীর অলঙ্কৃত-তালে (চৌতাল-সুলতাল-তীব্রা ইত্যাদি) এবং বিশিষ্ট রাগ বিকাশের নিয়মে আলাপ থেকে সুরু করে মীড় গমক ইত্যাদি গম্ভীর ও গভীর ভাবদ্যোতক অলঙ্কার প্রয়োগে হাল্কা-তান-অলঙ্কার বর্জিত রীতিতে গাওয়া হয় সে রচনাকে ধ্রুপদ বলা যায়।

ধামার, ধমার : যে গানের কথায় বিষয়বস্তু হোরী এবং গাওয়া হয় ধ্রুপদী রীতিতে, সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত ধামার তালে তাকে বলা হয় ধমার গান।

খেয়াল : যে গান স্থায়ী-অন্তরা এই দুই তুকে বিশেষ ভাষায় ও ভাবে রচিত হয় যেন রাগের অলঙ্কৃত ও অনলঙ্কৃত রূপ স্বর-বিস্তার, তান প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় এবং যে গান তবলার সহযোগিতায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তালে (লঘুতালে নয়) সুরকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয় তাকে খেয়াল বলা যায়।

টপ্পা : যে গানে বিশিষ্ট কায়দায় বেণী-সংবদ্ধ তরঙ্গের মতো তান স্তবকে স্তবকে গানকে পরিপূর্ণ ক'রে বিলম্বিত-মধ্যলয়ের ত্রিতালে ও অন্যরূপ তালে সমের ঝোঁক বিশেষ ভাবেই রক্ষা করে চলা যায় সে গানকে টপ্পা বলে। গানের বিষয়বস্তু প্রধানত প্রেম-সমন্বিত বা নায়ক-নায়িকা ভাবমূলক। প্রধান ভাষা – লৌকিক পাঞ্জাবী।

ঠুমরি : রাধাকৃষ্ণ প্রেম থেকে উদ্ভূত হয়ে মানবিক প্রেমেও বিস্তৃত যে গানের গায়ন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে প্রেম-প্রকাশের জন্যে বিশিষ্ট কথা

বা ক্রিয়াপদ অবলম্বন করা হয় এবং রাগ-গান সমত গভীর ও হাল্কা খণ্ড-খণ্ড বোল সৃষ্টি ক'রে যে গান গাওয়া হয় ও শেষে পরিণতিতে (প্রেমের মিলন দর্শানোর জন্যে) যে গানের শেষাংশে ছন্দোবদ্ধ উল্লাসের লাস্যভঙ্গি তালের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয় তাকে ঠুমরি বলা হয়। হিন্দুস্থানী লৌকিক গান থেকে উদ্ভূত যে গান মোটামুটি নৃত্য সম্বলিত ছিল, পরে তাকে ঠুমরি ভঙ্গিতে পরিমার্জিত করে দাদরা কার্ফা প্রভৃতি তালে গাওয়া হত তাকে দাদরা বলে।

গজল: আরবী শব্দ। পারস্য দেশের বিশিষ্ট কবি হাফিজ, রুমী এমন কি ওমর খৈয়ামের রচনাও গজলরূপে গীত হয়। রচনার প্রথম তুকই বিশিষ্ট প্রেমের ভাবদ্যোতক। ফারসী ভাষার অপূর্ব কথাসম্পদে বিধৃত এই রচনার বিষয়বস্তু ভালবাসা অথবা সুফীমতের আধ্যাত্মিক-প্রেম কিনা—এই নিয়ে মতভেদ আছে। ভারতীয় সংগীতে পারসিক প্রভাবের সংগে উর্দু ভাষায় গজল সঞ্চারিত হয়। উর্দু ভাষার ছন্দোবদ্ধ সাংগীতিক ভংগিতে ও রাগের সমন্বয় হয়। সংমিশ্রণে গজল বিশিষ্টরূপ লাভ করে। উর্দু গানে সুর ও কথার বিচিত্র সমন্বয় হয়। সকলের মধ্যে মীর্জাগালিব এর বিশিষ্ট রচয়িতা। এ যুগে বেগম আখতারকে শিল্পীরূপে গজল সামাজ্ঞী বলা হয়। গানের প্রথমাংশে হাল্কা ছন্দ ও তাল দৃঢ় সংবদ্ধ থাকে। এরপর তালহীন মুক্ত রচনার অংশ—সের। শেষাংশে অলঙ্কৃত তালযুক্ত অংশ—বিশিষ্ট সুর। এ গান ঠুমরি ও দাদরাকে প্রভাবিত করেছে।

মেরু, খণ্ডমেরু, মাতৃকা—এই তিনটি পদের অবলম্বনে একটি রাগ-প্রকৃতি নির্ধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন ডঃ অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর Ragas and Raginis গ্রন্থে। এরপর ইংরেজিতে লিখিত লোকসংগীত আলোচনার দুটো গ্রন্থে খণ্ডমেরু-তত্ত্ব লোকসংগীত ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা জানি রাগসংগীতের তত্ত্বদ্বারা লোকসংগীত বিচার চলে না। লৌকিক সুর ও তাল স্বতঃস্ফূর্ত ছকে বাঁধা, রাগ সেরূপ নয়। রাগ বহু বিচিত্র process বা রীতির মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। লৌকিক সুরে এই লক্ষণ নেই। সেজন্যে লৌকিক সুর চিনে নেবার জন্যে আমরা দু একটি রাগের নাম করি, কিন্তু রাগের সংগে সম্পর্ক খুঁজতে চেষ্টা করা হয় না।

রাগ গঠনের প্রকৃতি বা process (রীতি) পরীক্ষা করবার জন্যে ডঃ অমিয়নাথ সান্যাল সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। প্রথমে ধরা যাক কোন রাগ গান বা গতের স্বরলিপিতে প্রতিফলিত স্বরের সংখ্যা; অর্থাৎ, এক একটি গানের তুকে স্বরগুলো কতবার ব্যবহার করা হয়েছে। যথা, স=৮ বার, র=২ বার, গা=১০, ম=১২, প=৮ ইত্যাদি। তারপর লক্ষ্য করা যেতে পারে দুই স্বরের বা তিন স্বরের অঙ্গ—কিভাবে কয়টি বার ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর লক্ষ্য করা যেতে পারে সমগ্র স্বরের বৃহত্তর কাঠামো।

এইরূপ পদ্ধতির জন্যে প্রথমে রাগের দ্বাদশ স্বরের পরিমিতিকে বলা হয় **মেরু**। যথা **স** থেকে **ন** পর্যন্ত অথবা **র** থেকে **র্‍** পর্যন্ত এক একটি মেরু। প্রতি রাগের গঠন দ্বাদশ স্বরের অন্তর্গত মেরুর ওপর নির্ভরশীল। এরপর রাগের কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। রাগের কাঠামোকে বলা যায় **মাতৃকা**। যথা—**স গ প ন, ঋ গ দ ন, র ম ধ র্স** ইত্যাদি। এরপর মাতৃকাকে ভেঙে দুই স্বরে বা তিন স্বরে বিশেষ অংশে বা খণ্ডে রাগের স্বর সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। যথা **স গ প, গ প ন** ইত্যাদি। এরপর দুই স্বর, তিন স্বর ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যথা **গ ধ, ধ্র ম, গ ন ধ, প র, র ম** ইত্যাদি। এভাবে কোনো কোনো রাগের স্বরগুলো সংখ্যানুপাতে বিশ্লেষণ করলে প্রচলিত মত থেকে পার্থক্য দেখা যেতে পারে। কোনো রাগের বাদী **গ** স্বর, কিন্তু সংখ্যা বিশ্লেষণে প্রধান হতে পারে অন্য স্বর। এরপর যাকে পকড় বলা হয় হয়ত সংখ্যা গণনায় খণ্ড অংশে তারতম্য হতে পারে, স্বতন্ত্র স্বর সমন্বয় প্রধান হতে পারে। ডঃ অমিয়নাথ সান্যাল এই পদ্ধতিটি পেয়েছিলেন গুরু শ্যামলাল ক্ষেত্রীর নিকট থেকে। মেরু শব্দটি সংগীত শাস্ত্রে বহু ব্যবহৃত। বলা বাহুল্য খণ্ডমেরু-পদ্ধতি রাগের রীতি (process) নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত। শার্ঙ্গদেব খণ্ডমেরু কথাটি তানের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে প্রয়োগ করেছেন। ডঃ সান্যালের পদ্ধতিটি এখনো তেমন ভাবে গ্রহণ করা হয় নি।

স্বরলিপি: ভারতীয় সংগীতের পরিপূর্ণ স্বরলিপি পদ্ধতির ইতিহাস ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনুধাবন করা যায়। বৈদিক স্বরলিপি

ছিল সংখ্যাভিত্তিক। ১, ২, ৩ সংখ্যাগুলি বর্ণের ওপর ব্যবহার করে গুরুলঘু বোঝান হত। গান্ধর্ব-সংগীতের যুগে মতঙ্গের ব্যবহৃত স র গ ম এবং সা রা গা মা প্রভৃতি বর্ণদ্বারা স্বরলিপি নির্দিষ্টরূপে ব্যক্ত হত। সপ্তম শতকে মহেন্দ্রবর্মন-কৃত কুডুমিয়া মালাই প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপিতে স্বরলিপির যে সন্ধান পাওয়া যায় তাতে সপ্তম শতককে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর বলা যায় (পৃঃ ৬০)। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতকে স্বরলিপির যে চিহ্নাদি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে স্বরের তলায় ব্যবহৃত বিন্দুতে মাত্রা, রেফ্‌-এর ব্যবহার এবং S এবং O-র ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। S চিহ্নটি অনেকটাই পাওয়া যায় ভাতখণ্ডের স্বরলিপিতে এবং O চিহ্নটি বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের স্বরলিপিতে।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ঊনবিংশ শতকে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবক (পৃঃ ১২৭)। ক্ষেত্রমোহনের শিষ্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১২৯) বিরুদ্ধপন্থী ছিলেন। একই সময়ে কৃষ্ণধন স্টাফ নোটেশান প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। এমনকি পাশ্চাত্য সোলফা (ডো-রে-মি-ফা-সো-লা-তে বা সে দেশের উচ্চারিত সারগম) পদ্ধতির প্রচলনের সমর্থক ছিলেন তিনি। এরপর স্বরলিপি উদ্ভাবনের সাড়া পড়ে যায় চারদিকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮০ নাগাৎ) কষিমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তন করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অবলম্বনে। ১৮৮৫ নাগাৎ বালক পত্রিকায় প্রতিভা দেবী রেখামাত্রিক স্বরলিপি ব্যবহার করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম স্বরলিপি ছিল সংখ্যামাত্রিক। ১৮৯১ সাল নাগাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে স্বর ব্যবহার করেন। স্বরগুলো চিহ্নিত হল: স ল র ঋ গ ম হ্ম প দ ধ ঞ ন স, র্স তার স্বর; পরে আকার মাত্রিক স্বরলিপি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-তে। বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের স্বরলিপি পদ্ধতি বিশেষ রূপ লাভ করে ১৯০৯-এ হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি গ্রন্থে, যদিও তিনি এই রীতি ১৯০৫ নাগাৎ চালু করেন। বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের স্বরলিপি ৯১০-এ প্রকাশিত হলেও ১৯৩১-এ অনেকটা পরিবর্তিত রূপে প্রচারিত। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে কর্ণাটক সংগীতে এবং উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঘরাণেদারদের মধ্যে নিজস্ব উদ্ভাবিত স্বরলিপিও নানাভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

কণ্ঠ: বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার "বাংলা সংগীতের রূপ" দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা

॥ সমাপ্ত ॥